মৃগাঙ্ক চক্রবর্তী

ইমুবিয়া



৯৫০ খ্রিস্টাব্দ, পূর্ণগিরি— গুপ্তচর মারফত পাওয়া খবর সত্যি হলে, আজকে রাত শেষ হওয়ার আগে ভদ্রেশ্বরকে আটকাতে না পারলে রাতারাতি ছারখার হয়ে যাবে সমস্ত কিছু।

২০১৭ সাল, শিলিগুড়ি— পিয়াসী বক্সির বাড়ির গেটের সামনে থেকে পাওয়া গেছে ছেঁড়া কাগজে সংস্কৃতে লেখা একটা লাইন— "যৈরেব পতনং দ্রবৈঃ সিদ্ধিস্তৈরৈব চোদিতা..."। এই ঘটনার কিছুদিন বাদেই উদ্ধার হয়েছে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির লাশ— যা একটা ভয়ংকরদর্শন মূর্তি বুকের কাছে দু-হাতে জড়িয়ে রেখেছে।

২০১৯ সাল, শিলিগুড়ি— নীল গত কিছুদিন থেকেই রাতে ঘুমোলে স্বপ্ন দেখছে, ওকে কিছু অদ্ভুত দেখতে প্রাণী বলি দিচ্ছে। সাইক্রিয়াইটিস্ট কিগান চক্রবর্তী, যতই নীলের চিকিৎসার দিকে এগোচ্ছে, ততই যেন নিজের অজান্তেই আরো গভীর কোনো রহস্যের জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে।

তিনটে আলাদা সময়কাল।

একটা অদৃশ্য যোগসূত্র।

ইক্ষুবিষা আসছে।

ইক্ষুবিষা

মৃগাঙ্ক চক্রবর্তী



বইবন্ধু

Ikkhubisha

Horror Novel by Mriganka Chakraborty
Published by Boibondhu Publications Private Limited
26/2 Surya Sen Street, Kolkata 700009

ISBN : 978-81-967559-1-1

প্রথম বইবন্ধু সংস্করণ : নভেম্বর ২০২৩

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

প্রকাশক
বইবন্ধু পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
আলাপন ৮৬১৭৩৮১০৯৫
www.boibondhupub.com

মুদ্রক : গৌরাঙ্গ বাইন্ডার্স,
৩৮ এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য : ৩৯৯/-

উৎসর্গ

“ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ো না...” আমি ওকে বললাম।
ওর আইলাইনারে নিখুঁত আঁকা ডাগর চোখ দু’টোর দিকে তাকিয়েই মূহুর্তে নজর সরিয়ে নিলাম।

ও বলল, “কেন? কেন তাকাবো না বলতে পারো?”

“তোমার এই চোখ বড্ড ছোঁয়াচে। এই চোখ যেন বহুকাল আগে হারিয়ে যাওয়া শেষ বিকেলের মনকেমনের চেনা গন্ধ ফেরি করে বেরায়। যেখানে রোদের আলতো ছায়া পড়ে সিঁদুরে আমগাছের ফাঁক দিয়ে টলটলে দিঘির ওপর। কোনো ম্যাজিশিয়ান যেন পড়ন্ত বেলায় গা এলিয়ে আরামকেদারায় বসে, ম্যাজিক জমিয়ে রাখে ডাকবাক্সে। ঠিক তখনি কেউ চেনা স্বরে ডেকে যায়। বলে, “থেকে যাও...”। আমি থেকে যেতে পারি না।
“থেকে গেলেই তো পারো...” ও বলল।
“নাহ... সবসময় থাকতে নেই। কখনও কখনও অনিচ্ছা নিয়েও চলে যেতে হয়।”

আমি কথা শেষ করে রাস্তা ধরলাম। হঠাৎ শিরশিরে একটা হাওয়ায় কেঁপে উঠলো সমস্ত শরীরটা। মূহুর্তে বুকের ভেতরটা দপদপ করে উঠলো, যেন সলতে পোড়া মোমবাতির নাভিশ্বাস। যেখানে আলো অন্ধকার একাকার হয়ে যায় মিলেমিশে। আমি পেছনে ফিরে তাকালাম। ওর চোখের দিকে আবারও চোখ পড়লো।
তারপর... আমি আর কখনো যেতে পারিনি। থেকেই গেলাম।
জীবনে যে মানুষগুলো চলে যাবে বলেও থেকে গেছে, এই বই তাদের দিয়ে গেলাম।

গুহা

পূর্ণগিরি,

৯৫০ খ্রিস্টাব্দ...

আজকের রাতটা অন্যান্য দিনের থেকেও বেশি নিকশ কালো লাগছে দেখতে। যদিও আধখানা চাঁদটার আলো গাছগাছালি ভেদ করে সিঁথির মতো সরু রাস্তাটার ওপর এসে পড়েছে। আর সেই মৃদু আলোয় মানুষটাকে জলজ্যান্ত অশরীরীর মতো দেখতে লাগছে। সনকা; ছিপছিপে মাঝারি গড়ন, গায়ের চাদরটা মাথা অবধি ঘোমটা দেওয়া; চেহারা দেখে বয়সের আন্দাজ করাযায় না। হাতে একটা মশাল জ্বলছে। সেই মশালের আলোতেই দেখে দেখে রাস্তা পেরোতে হচ্ছে। অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়েছে ওকে। গলা ফেটে যাচ্ছে তেষ্টায়; পায়ের গতি ঝিম মেরে যাচ্ছে মাঝেমধ্যেই। তবু থামার উপায় নেই। ওদের বসতি থেকে হেঁটে প্রায় ঘণ্টা খানেক। চড়াই-উতরাই কাঁচা মাটির রাস্তা, মাঝেমধ্যে উঁচু ঢিবি আর ঝোপঝাড়। সেগুলো পেরিয়ে আরো কিছুটা এগোলেই জঙ্গলের রাস্তা। সর্পিল কাঁচা পথ; দু-পাশের ঘন ঝোপঝাড় আর গাছপালা থেকে শুকনো ডাল এসে নুইয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর। শুকনো পাতার সঙ্গে গা ঘষা লাগতেই খসখস শব্দ হয়। অথচ কাজটা সারতে হবে যতটা সম্ভব নিস্তব্ধে। অপর পক্ষ বিন্দুমাত্র টের পেলেই বিপদ। এসব রাস্তা রাতে চলাচলের জন্য মোটেই সুবিধার নয়। এরকম ঘন বনের মধ্যে হিংস্র জন্তুজানোয়ার থাকাটাই বরং স্বাভাবিক ব্যাপার। সেরকমই কোনও হিংস্র জানোয়ার যদি হঠাৎ রাস্তা আগলে এসে দাঁড়ায় তাহলে তো আর রক্ষা নাই। অথচ দিনের আলো ফোটা অবধি অপেক্ষা করা চলবে না।

অপেক্ষা করতে গেলে অনেকটা দেরি হয়ে যাবে; আর সেই দেরির মাশুল কয়েক-শো মানুষের মৃত্যু। কথাটা মনে পড়তেই সনকার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কতগুলো ছবি। সারিসারি তাজা তাজা লাশ। দৃশ্যটা ভাবতে ভাবতে তিরতির করে ওঠে সনকার চোখের চারপাশটা। পরমুহূর্তেই সজাগ হয়ে ওঠে ও। না না দেরি করলে চলবে না বিন্দুমাত্র। যেটুকু করার... হাতে আজকের রাতটুকুই... তারমধ্যেই পুরো কাজটা শেষ করতেই হবে। রাত শেষ হতে হতে আরো প্রায় তিন-চার ঘণ্টা মতো। তার আগেই পৌঁছাতে হবে গন্তব্যে। হিসাবের একচুল এদিক-ওদিক হলেই সমস্তটা হাতের বাইরে বেরিয়ে যাবে সবার। তছনছ হয়ে যাবে সমস্ত নগর... জনপদ... আর মানুষগুলো। এসব চিন্তা মাথায় চাড়া দেওয়া মাত্রই, শিরদাঁড়া বেয়ে একটা চিনচিনে ঠান্ডা অনুভূতি খেলে গেল ওর। দেরি হয়ে যাচ্ছে কি? সন্দেহটা প্রকট হতেই, পায়ের গতি বাড়ায় সনকা। আরো কিছুটা বনের পথ ধরে এগোতেই মশালের মৃদু আলোয় নজরে পড়ল গুহামুখটা। জঙ্গলের মধ্যেই একটা এবড়োখেবড়ো টিলার ঢাল উঠে গেছে। সেটার গায়েই মিশমিশে অন্ধকার গুহামুখ। টিলার গায়ে ঢাল বরাবর লেপটে থাকা প্যাঁচানো লতাগুল্ম, আর পাশের একটা বটের শিকড়ে বেশ কিছুটা ঢাকা পড়ে গেছে গুহার মুখটা। মশালের আলো টিলার গায়ে এসে পড়তেই নজরে এল; না-হলে হয়তো এই অন্ধকারে ওটা নজরেই পড়ত না সনকার। গুহামুখটা খুঁজে পেতেই সজাগ হয়ে ওঠে ও। সনকা জানে, বাদবাকি কাজটা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে করতে হবে ওকে। গুহার সামনে এগিয়ে গেল ও সন্তর্পণে। গুহার ভেতর থেকে কোনও আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। বরং গুহা জুড়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার আর একটা মরা নিস্তব্ধতা। গুহার মুখটার সামনে এসে সনকা গুহার ভেতরটা দেখার চেষ্টা করে। নাহ্, কারও কোনও অস্তিত্ব নেই... কোনও আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কি দেরি হয়ে গেল? সমস্তটা হাতের বাইরে চলে গেল? নাকি গুপ্তচর মারফত ভুল খবর পেয়েছে ও? কিন্তু সেটার সম্ভাবনা কম। বহুদিনের বিশ্বস্ত গুপ্তচর ওরা। বেইমানি ওদের রক্তে নেই। কিন্তু আজকের রাতের এই আয়োজন অন্য কোথাও হলে, রাতটা শেষ হওয়ার আগেই সেই জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু তারও আগে উচিত এই গুহাটা একবার হলেও পরীক্ষা করে দেখা। আর তার জন্য গুহার ভেতরে ঢুকতে হবে। আর দ্বিতীয়বার ভাবল

না সনকা। গুহার বাইরে, মাটিতে মশালটা গেঁথে রেখে, গায়ের চাদরটা ভালোমতো গায়ে জড়িয়ে নিল ও। তারপর নুইয়ে পড়া লতাগুল্ম আর ঝুলে পড়া সরু শিকড়গুলো সরিয়ে প্রবেশ করল গুহার ভেতর। ভেতরে কালো অন্ধকার। সমস্ত রাতের কালো মেঘ যেন ভিড় করেছে এই গুহার ভেতর। সনকা মনে মনে ভাবছিল আলোর ভীষণ প্রয়োজন ছিল এখানে। কিন্তু অপরপক্ষ আলোর রশ্মি দেখে বিন্দুমাত্র কিছু আঁচ করতে পারলে সাবধান হয়ে যাবে। অতএব যা কিছু প্রয়োজনীয় কাজ, এই অন্ধকারেই করতে হবে। গুহার ভেতরটা খুব একটা প্রশস্ত নয় দু-পাশ থেকে। বরং বেশ কিছুটা চাপা। পায়ের নীচে এবড়োখেবড়ো পাথুরে মাটি, ধারালো নুড়িপাথর আর মাঝেমধ্যে শক্ত কীসব পায়ে এসে ঠেকছে। সেসবের ওপর দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে সনকা। গুহার ভেতর কিছুটা এগোতেই একটা সূক্ষ্ম আলোর শিখা নজরে পড়ল ওর। কোনও একটা উৎস থেকে একটা মৃদু আলো বিচ্ছুরিত হয়ে ছায়ার মতো আলতো করে লেগে আছে গুহার গায়ে। আলোর চিহ্ন দেখতে পেয়ে চোখ চকচক করে ওঠে সনকার। হাতের বাইরে যায়নি এখনও সবটা। এখনও সুযোগ আছে। শেষ চেষ্টা করতে হবে। একটা ক্ষীণ আশার আলো সনকার ভেতর থেকে আস্তে আস্তে প্রকট হয়ে ওঠে। আর একমুহূর্তও দেরি না-করে আলোর উৎস বরাবর এগিয়ে যায় সনকা। আর-কিছুটা এগোতেই ও দেখলগুহার সরু পথটা শেষ হয়ে, একটা চৌকো বড়ো মতোন ঘরে মিশেছে। চাপা পথটার মুখটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বেদিটা চোখে পড়ে ওর। লাল শালুতে ঢাকা বেদি। তার সামনে একজন গুহা পথের দিকে পিঠ করে বসে আছে; দীর্ঘদেহী, ফর্সা সুঠাম গড়নের, পেশিবহুল একজন বয়স্ক ব্যক্তি। পরনে ধুতি, উন্মুক্ত শরীরে কোনও আচ্ছাদন নেই। সামনে একটা থাংকা টাঙানো আছে। সেখানে একটা রঙিন বীভৎস প্রতিচ্ছবি আঁকা। থাংকার সামনে দুটো মৃত মানুষের মাথা রাখা; দেখেই বোঝা যাচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই বলি দেওয়া হয়েছে। পাশেই রাখা আছে রক্তাক্ত খড়্গটা। একটা ধাতুর পাত্রে তাজা রক্ত আর তার পাশের একটা পাথরের ধূপদানিতে ধূপ জ্বলছে; ধূপের ধোঁয়া গুহার ভেতরের বদ্ধ চৌকোনা ঘরটা ভরে গেছে। বেদির থেকে কিছুটা দূরে মশাল জ্বলছে। আর সমস্ত ঘর জুড়ে একটা সোদা আঁশটে পোড়া মতোন গন্ধ। এই ঘরটার দেওয়াল জুড়ে রক্তের দাগ; যেন কেউ হাত দিয়ে কাঁচা রক্ত লেপে দিয়েছে সমস্ত দেওয়ালগুলোর গায়ে। গা

গুলিয়ে ওঠে সনকার। পেটে কেমন একটা মোচড় দিয়ে ওঠে ওর। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নেয় সনকা। নিজেকে নিজেই বোঝায়— ভেঙে পড়োলে চলবে না। শক্ত থাকতে হবে।

সনকা থাংকার প্রতিচ্ছবিটার দিক থেকে দৃষ্টি আড়াল করে, গম্ভীর গলায় বলে ওঠে, "গুরু ভদ্রেশ্বর... আপনি ধরা পড়ে গেছেন!"

সামনের মানুষটা সনকার উপস্থিতি টের পায়নি। কিন্তু আওয়াজ শুনে চমকে পেছন ফিরে তাকাল। ওই ব্যক্তির ক্রুদ্ধ অথচ ভীত চোখ দুটো সনকাকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিল। তারপর নিমেষে চোখের মধ্যেকার সেই অস্বস্তি মুছে ফেলল ওই ব্যক্তি; একটা বাঁকা হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় ভদ্রেশ্বর সনকাকে বলল, "তুমি কি সত্যি সত্যিই ভাবছ— আমাকে তুমি আটকাতে পারবে?"

প্রশ্নটার মধ্যে যে একটা তীব্র ব্যাঙ্গ লুকানো আছে, সনকা সেটা সহজেই ধরতে পারল। তীক্ষ্ণ গলায় উত্তর দিল, "মহারাজ জানতে পারলে কিন্তু..."

বৃদ্ধের চোখ চকচক করে উঠল মুহূর্তের জন্য। সনকার কথা শেষ আগেই বৃদ্ধ বলল, "আজকের রাতটুকুর অপেক্ষা, আর কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। এই কালচক্রের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান আমার হাতের মুঠোয়। সেখানে তুমি বা মহারাজ নিমিত্ত মাত্র। এই নগরী... জনপদ... বিশ্বব্রহ্মাণ্ড... সবই প্রকৃতির নিয়মে আবদ্ধ। কিন্তু আমি... ভদ্রেশ্বর... এই সমস্ত নিয়ম-রীতির প্রকোপ আমাকে আবদ্ধ করতে পারেনি সনকা। কারণ সৃষ্টির সমান ও বিপরীত শক্তিকে নিজের নিয়মে বেঁধে ফেলার শক্তি স্বয়ং প্রকৃতিরও নেই।"

ভদ্রেশ্বর এসব কী বলছে? তাহলে কি সত্যি সত্যিই অনেক দেরি হয়ে গেল। ভেতর ভেতর কিছুটা ঘাবড়ে যায় সনকা। কিন্তু বাইরে থেকে সেই আঁচ বিন্দুমাত্র পাওয়া যায় না। ভদ্রেশ্বরকে ও সেটা বুঝতে দেয় না। সনকা আগের মতোই রুক্ষ গলায় উত্তর দিল, "ভুল করছেন গুরু ভদ্রেশ্বর। আপনি এই জনপদের অনেক ক্ষতি করেছেন। এবার পিছিয়ে আসুন। নিজে থেকে ধরা দিন। আত্মসমর্পণ করুন মহারাজের কাছে।"

সনকার কথাটার কোনও উত্তর না-দিয়ে হেসে উঠল গুরু ভদ্রেশ্বর। কী বীভৎস সেই হাসি! কী যেন একটা তীব্র শ্লেষ যেন জমে আছে ওই হাসিটার মধ্যে।

সনকা বুঝতে পারল সময় নেই হাতে। এভাবে বাক্য বিনিময়ে সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর দাঁড়িয়ে না-থেকে ও বেদিটার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু সনকাকে বেদিটার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে, ভদ্রেশ্বর হিংস্র জানোয়ারের মতো হামলে পড়ল সনকার ওপর। পেছন থেকে সনকাকে শক্ত করে জাপটে ধরে, ঘুরিয়ে পেছন দিকে ঠেকে সরিয়ে দেয় ভদ্রেশ্বর। টাল সামলাতে না-পেরে সনকা মাটিতে পড়ে যায়। বৃদ্ধের রক্ত-লাল চোখ দুটো থেকে একটা অসম্ভব ক্ষিপ্রতা যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। গর্জে উঠল ভদ্রেশ্বর, "এখানেই থেমে যাও সনকা! এগিয়ো না! ফল ভালো হবে না কিন্তু! আমি আবারও বলছি, তোমরা সৃষ্টির সাধারণ নিয়মে আবদ্ধ। প্রকৃতির বাইরের আরেকটা বিশাল প্রকৃতির ব্যাপারে তোমার ধারণা নেই। অতএব নিজেকে সংযত করত। পিছিয়ে যাও। ফিরে যাও নগরে। আমাকে আমার কাজ করতে দাও।"

নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সনকা। গায়ের থেকে ধুলো-মাটি ঝেড়ে নিয়ে, আবার এগিয়ে যায় সামনের দিকে। ভদ্রেশ্বর আবার শাসিয়ে ওঠে, "আবারও বলছি আমি... তুমি বাইরের জগতের নিয়ম জানো না সনকা। সেই জগতের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে যাওয়ার ভুল করো না তুমি। চলে যাও এখান থেকে।"

সনকা সেই কথায় কান দেয় না। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েই ও আবার ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে গেল বেদিটার দিকে। এক মুহূর্তও দেরি না-করে ভদ্রেশ্বর আবার হামলে পড়ল সনকার ওপর। ওর হাত দুটো শক্ত করে ধরে মুচরে দেওয়ার চেষ্টা করল ভদ্রেশ্বর। বৃদ্ধের গায়ের জোর যথেষ্ট বেশি সনকার থেকে। তবু হার মেনে নিলে চলবে না। সনকা সমস্ত গায়ের শক্তি দিয়ে ভদ্রেশ্বরকে সজোরে একটা ধাক্কা মারল পেছন দিকে। গুহার দেওয়ালে ভদ্রেশ্বরের মাথাটা গিয়ে লাগে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভদ্রেশ্বর ধাক্কা খেয়েও নিজেকে সামলে নেয়। আবার ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে যায় ও সনকার দিকে। বেদিটার এককোণে আরো দুটো জিনিস রাখা ছিল। সনকা নীচু হয়ে সেই জিনিস দুটো সাবধানে তুলে আনল। আর তখনই ভদ্রেশ্বর পেছন থেকে আক্রমণ করল সনকাকে। আর, আপ্রাণ চেষ্টা করলে লাগল সনকার বাহুবেষ্টনীর মধ্যে থেকে জিনিস দুটোকে ছিনিয়ে নিতে। সনকা আরো শক্ত করে জাপটে ধরেছে জিনিস দুটো। শুরু হল দু-জনের ধস্তাধস্তি। কিছুতেই

এই দীর্ঘদেহী বৃদ্ধের সঙ্গে পেরে উঠছে না।ভদ্রেশ্বর চাপা গলায় হিসহিসিয়ে সনকাকে বলে, "ভুল করছ বলে দিলাম। এর মাশুল গুণতে হবে..."

হাঁপাতে হাঁপাতে সনকা উত্তর দেয়, "মাশুল দিতে হয় দেব। কিন্তু আপনাকে আর এগোতে দেব না!"

সামনের একটা দেওয়ালে সনকাকে চেপে ধরে, ভদ্রেশ্বর শক্ত করে ওর গলাটা টিপে ধরে। শ্বাস আটকে যায় সনকার। ও অনুভব করে, ওর হাত-পা ক্রমশ যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে কেমন যেন ঘোলাটে-আবছা হয়ে যাচ্ছে ওর। শ্বাস নিতে না-পারায়, সনকার বুকটা কেমন যেন ফুলে ফুলে উঠছে। বুকের পাঁজরের খাচায় একটা অসম্ভব চাপ অনুভব করছে ও। তাহলে কি এই ছিলো ভাগ্যে? শেষে ভদ্রেশ্বরের হাতে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যুই কি সনকার ভবিতব্য?— এরকম প্রশ্নগুলো জট পাকাতে থাকে ক্রমশ সনকার মাথায়। মুহূর্তের জন্য একবার সনকা ভাবে, বুঝি আর ভদ্রেশ্বরের হাত থেকে আর বাঁচাতে পারবে না নগরীকে। এই বুঝি শেষ... সব শেষ... সমস্তটাই হাতের বাইরে... কিন্তু পরমুহূর্তেই টনক নড়ে ওর। এভাবে হাল ছাড়লে তো চলবে না। আজকের রাতটার ওপর অনেকগুলো মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। নির্ভর করছে ওদের বেঁচে থাকা না-থাকা। সনকার চোখের সামনে আরো একবার ঝলসে ওঠে নগরের মানুষজনের অসহায় কান্না... মাটির ওপর পড়ে থাকা সারি সারি লাশ... আর থিকথিকে রক্ত। কী একটা চারা দিয়ে ওঠে সনকার ভেতর।

কানের খুব কাছে ও শুনতে পাচ্ছে ভদ্রেশ্বরের নৃশংস হাসির আওয়াজ। কী বিশ্রী... পাশবিক হাসিটা! অদম্য একটা জেদ চেপে যায় সনকার মধ্যে। আর তখনই হঠাৎ নড়ে ওঠে ও। গুহার যে দেওয়ালে ওকে চেপে ধরেছে ভদ্রেশ্বর, সেই দেওয়ালটার গায়ে পা দিয়ে একটা অবলম্বন তৈরি করে সনকা। আর তারপরই, পায়ের ওপর ভর করে, সজোরে পেছন দিকে ধাক্কা মারে ও ভদ্রেশ্বরকে। তাল সামলাতে না-পেরে পা হড়কে যায় ভদ্রেশ্বরের। মাটির ওপর পড়ে যায় ও। সেই ফাঁকে নিজেকে ধাতস্থ করে নেয় সনকা। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েই, ও ভদ্রেশ্বরের ওপর হামলে পড়ে, দু-হাতে শক্ত করে গলা টিপে ধরে ওর। যন্ত্রণায়, শ্বাসরোধে কাতরে ওঠে দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ। হাত দিয়ে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে সনকার শক্ত মুঠো। সনকার মধ্যে যেন খুন চেপে যায়। ও আরো জোরে চেপে ধরে ভদ্রেশ্বরের গলা।

ভদ্রেশ্বর গুহার মাটির ওপর এলোপাথাড়ি হাত-পা ছুড়তে থাকে। কিন্তু সনকাকে ছাড়াতে পারে না নিজের সর্বশক্তি দিয়েও। সনকা অনুভব করে ক্রমশ যেন ঠান্ডা অয়ে আসছে ভদ্রেশ্বরের শরীর। ধীরে ধীরে ছটফটানিটাও যেন কমে আসছে। চোখের মণিটাও সরে গিয়ে, চোখটা ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে ওর। সনকার মনে হয়, গুহার ভেতরের বাতাসটা যেন ক্রমশ ভারী হচ্ছে। গনগনে গরম হাওয়া গুহার গায়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ফিরে ফিরে আসছে গুহার ভেতর। আর ওর নাকে ভেসে আসে একটা উৎকট গন্ধ। গন্ধটা ঠিক কেমন সেটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। যেন এই পৃথিবীর মানুষের পক্ষে এই গন্ধ ব্যাখ্যা করার শক্তি নেই। আর ঠিক তখনই সনকার নজর পড়ে থাংকায় আঁকা বীভৎস প্রতিচ্ছবিটার দিকে। মুহূর্তের জন্য যেন ওর মনে হয় থাংকার প্রতিচ্ছবিটার চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করে উঠল এক মুহূর্তের জন্য। ভুল দেখল কী? ঠিক বুঝতে পারল না সনকা। কী একটা বিভ্রান্তি তৈরি হল ওর মনে। গুহার ভেতরের বাতাসটাও এখন বেশ গরম। তাঁরওপর সেই উৎকট গন্ধটা। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে সনকার। কী এসব? মুহূর্তের মধ্যে গুহার ভেতরের বাতাসের প্রকৃতি বদলে যাওয়া... আর এই গন্ধটা! ব্যাখ্যা খুঁজেপায় না সনকা। মুহূর্তে কেমন একটা ঝিমিয়ে গেল ও। মনে হল কেউ যেন ক্রমশ সনকার কাছ থেকে ওর শরীরটা দখল করে নিতে চাইছে। সম্মোহিতের মতো আস্তে আস্তে ভদ্রেশ্বরের গলার ওপর থেকে আলগা হয়ে গেল সনকার হাত দুটো। ভদ্রেশ্বরের নড়াচড়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছিল। কিন্তু সনকা ঝিমিয়ে পড়তেই কেমন যেন ঝলসে ওঠে ভদ্রেশ্বর। চোখ দুটো চকচক করে ওঠে ওর। সনকার ঝিমিয়ে পড়ার সুযোগটা নিয়েই ভদ্রেশ্বর সনকাকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে, সনকার বুকের ওপর উঠে বসে, ওর গলাটা টিপে ধরে। আর সেই মুহূর্তেই সনকার সম্মোহন কেটে যায়। মাটির ওপর হাত-পা আছড়াতে থাকে ও। ভদ্রেশ্বরের মুখে আবার সেই বিকৃত হাসি; ঠোঁটের কোণ দিয়ে চুইয়ে পড়ছে লোল। সনকা অবাক হয়ে দেখে ভদ্রেশ্বরের লালার রং গাঢ় লাল। ঠিক যেন রক্তের মতো। উদ্ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে সনকা। কিছু একটা অবলম্বণ খুঁজে আনার চেষ্টা করে ও। আর তখনই সনকার নজরে পড়ে সামনে বেদিটার আরেক কোণে রাখা রক্তাক্ত খড়্গাটা, যেটা দিয়ে কিছুক্ষণ আগেই হয়তো বলি দেওয়া হয়েছে সামনের মানুষ দুটোকে। ওটার গায়ে

এখনও কাঁচা রক্ত লাগা। সনকা কোনোমতে মাটিতে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে এগিয়ে যায় বেদিটার দিকে। দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর। শরীরের জোর ক্রমশ কমে যাচ্ছে। কাঁপা কাঁপা হাতে খড়্গাটাকে নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করে ও। আরো কিছুটা যেতে হবে। আবার ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে এগিয়ে যায় আরো কিছুটা। আবার হাত বাড়ায়। ওর আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে। ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে হাত-পায়ের পেশিগুলো। সেই কাঁপা হাতেই অনেক কষ্টে তুলে নেয় খড়্গাটাকে । আর একমুহূর্তও দেরিনা-করে সমস্ত গায়ের জোরে সজোরে কোপ বসায় ভদ্রেশ্বরের ঘাড় লক্ষ্য করে। নিমেষে ভদ্রেশ্বরের মুষ্ঠি আলগা হয়ে গেল; রক্ত ছিটকে এসে পড়োল সনকার গায়ে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে ভদ্রেশ্বর। আর সেই সুযোগটা নিয়েই সনকা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এসে, ভদ্রেশ্বরের কাঁধ লক্ষ্য করে সজোরে আরেকটা কোপ বসায়। রক্তে ভেসে যায় গুহার মাটি। একটা চাপা শব্দ করে তৎক্ষণাৎ মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে বৃদ্ধ ভদ্রেশ্বর। আর কোনও নড়াচড়া নেই... চোখের পলক পড়ছে না... শরীর শান্ত হয়ে গেছে ভদ্রেশ্বরের।

সনকা খড়্গাটা মাটিতে ফেলে, উঠে দাঁড়ায়। তারপর একবার ভদ্রেশ্বরের দিকে ঝুঁকে পড়ে নিশ্চিত করে নেয় সত্যি সত্যিই মরেছে কি-না। নাহ্, শ্বাস পড়ছে না। শরীরে প্রাণ নেই। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সনকা। সামনের মেঝে থেকে তুলে নেয় ওই জিনিস দুটো। ওগুলোকে কোমর বাঁধা একটা কাপড়ের থলেতে ভরিয়ে নেয় সনকা। ও রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। ঘন ঘন ভারী শ্বাস পড়ছে ওর। ওখান বেরোতে যাবে সনকা, ঠিক তখনই লক্ষকরল টাঙানো থাংকা থেকে সেই বীভৎস প্রতিচ্ছবিটা যেন ক্রমশ বাইরে বেরিয়ে আসছে। ওটার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে এই আলো-আঁধারি আবছায়ায়। কী একটা সম্মোহনি শক্তি আছে ওই চাহনিতে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লসনকা। মনে হচ্ছে কেউ যেন ওকে টেনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আবার সেই উৎকট গন্ধটা ওর নাকে এসে লাগে। আর-একটা আওয়াজ... অনেকে মিলে যেন সমস্বরে একটা কিছু উচ্চারণ করছে। কয়েকটা শব্দ পর পর... বার বার... একসঙ্গে...। কী হচ্ছে এসব? ঘাবড়ে যায় অনকা। শবটা ক্রমশ যেন বাড়ছে। বাড়ছে উৎকট গন্ধটাও।আর প্রতিচ্ছবিটা... ওটা থাংকা থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছে সনকার দিকে। চারপাশের পরিবেশ সনকাকে কেমন একটা নিস্তেজ করে দিতে চাইছে। মুহূর্তের জন্য সনকার মনে হল,

ওর চলাফেরা চিন্তাভাবনা কোনোকিছুই আর ওর ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে না। কিন্তু পরমুহূর্তেই গা-ঝারা ও ঝেড়ে ফেলতে চায় সেই সম্মোহন। আর সময় নেই হাতে। ওই জিনিস দুটো সমতে থলেটা বুকে চেপে ধরে গুহামুখ বরাবর প্রাণপণে ছুটতে লাগল সনকা। পেছন থেকে একটা চাপা চিৎকার শোনা যাচ্ছে। আর সমস্বরে ভেসে আসা সেই আওয়াজ... কতগুলো পর পর উচ্চারণ করা শব্দ। থাংকার ওই বীভৎস প্রতিচ্ছবিটা সনকার দিকে ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে আসছে। সনকার পায়ের বেগের থেকেও ওটার গতি অনেক গুণ বেশি। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো ও সনকাকে নাগালে পেয়ে যাবে। তবুও থামলে চলবে না। মৃত্যুর আগে অবধি শেষ চেষ্টাটুকু করতে হবে সনকাকে। বাইরের পথ লক্ষ্য করে প্রাণপণে ছুটে চলে ও। পেছন থেকে একটা ঝড় যেন ওকে তাড়া করছে। বিশ্রী গন্ধটার পাশাপাশি একটা ঝোড়ো দমকা হাওয়া যেন সনকার গায়ে এসে লাগছে। সনকার বুকে কেমন একটা চাপ চাপ লাগছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। হাতে-পায়ে জোর কমে আসছে। কিছুটা এগোতেই কিছু একটার সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পা হড়কে মুখ থুবড়ে পরে সনকা। ওর চোখের সামনে গুহার ভেতরের অন্ধকারটা এখন আরো ভয়ংকর লাগছে। পাশাপাশি ওকে ঘিরে ধরেছে সে ঝোড়ো হাওয়াটা। সনকার মনে হচ্ছে গুহার অন্ধকারটা যেন ওকে গিলে খাবে। ভয়ে কুঁকড়ে ওঠে সনকা। চিনচিনে একটা ভয় ক্রমশ দলা পাকিয়ে প্রকট হয় ওর ভেতর। আর অমনি পেছন ফিরে সনকা দেখে সেই বীভৎস প্রতিচ্ছবিটাকে। আগুনের মতো জ্বলজ্বলে চোখ, একটা বিশাল হাঁ-মুখ, লকলকে লাল জিভ। সনকার অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছে সেটা। চোখ বুঝে বিড়বিড় করে কী একটা মন্ত্র উচ্চারণ করে সনকা। আর সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে একটা হালকা ধাক্কা মতো অনুভব করলও। চারপাশ থেকে অনেক কান্নার আওয়াজ যেন ভেসে আসছে সনকার কানে। আর সমস্বরে উচ্চারণ করা সেই শব্দ সমষ্টি। সেই শব্দে গমগম করছে চারপাশ। এ যেন ধ্বংসের শব্দ; সব তছনছ হয়ে যাওয়ার শব্দ। আর ঠিক তখনই অন্ধকার ভেদ করে গুহা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল দগদগে আগুন। সেই আগুনের গনগণে ধক এসে লাগে সনকার চোখে মুখে। ঝড়ো হাওয়া অতিক্রম করে সেই আগুন-ঝড় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে গুহাপথ বরাবর। সনকা অনুভব করে, আগুনটা ক্রমশ যেন ওকে ঘিরে ধরছে। আর চারপাশ থেকে অনেকগুলো হাত যেন সর্বশক্তি দিয়ে

টেনে টেনে ছেঁড়ার চেষ্টা করছে সনকার শরীরটা। আগুনের একটা বিশাল হাঁ-মুখের ভেতর তলিয়ে যায় সনকার শরীরটা। একটা শেষ চিৎকার সনকার গলা দিয়ে বেরিয়েও কোথাও যেন হারিয়ে যায়। হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ হয়। দপ করে যেন আরো কিছুটা আগুন জ্বলে ওঠে। আর ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে পড়ে গুহার চারপাশে। তারপর সব শেষ।

ঝড় থেমে গেছে। সেই বীভৎস মুখটা আর নেই। গুহার দুই প্রান্তে দুটো মৃত শরীর পড়ে রয়েছে। গুহার ভেতরে রক্তাক্ত অবস্থায় বৃদ্ধ ভদ্রেশ্বরের লাশ। আর গুহার বাইরের দিকে সনকার ছিন্নভিন্ন শরীরটা।

নিখোঁজ

শিলিগুড়ি,

২০১৭ সাল,

১

"যৈরেব পতনং দ্রবৈঃ সিদ্ধিস্তৈরৈব চোদিতা..."

একটা লম্বালম্বি করে ছেঁড়া কাগজে গোদা বাংলায় গোটা গোটা অক্ষরে পেন দিয়ে লেখা একটা সংস্কৃত লাইন।

কাগজটা হাতে নিয়ে, লেখাটা বারকয়েক পড়ে সাব ইনস্পেক্টর উর্বাক্ষু পাশে কনস্টেবল তমোঘ্নর দিকে তাকাল। চাপা স্বরে তমোঘ্নকে জিজ্ঞেস ও করল, "সংস্কৃত জানা আছে তোমার?"

ঘাড় নাড়ায় তমোঘ্ন, "সেই ক্লাস সেভেন না এইটে পড়েছিলাম নর নরৌ নরা... ব্যাস, আর কিছু মনে নেই"

"বাহ...ভালো! আচ্ছা আমাদের ডিপার্টমেন্টে কেউ...?"

আবার না-সূচক ঘাড় নাড়ায় তমোঘ্ন। ভেতর ভেতর রীতিমতো বিরক্ত হচ্ছিল উর্বাক্ষু। কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করল না। আসলে উর্বাক্ষু জানে, পুলিশের চাকরি করতে গেলে আর যাই লাগুক... কিন্তু সংস্কৃত চর্চার দরকার পড়ে না। কাগজটা আগের মতো ভাঁজ করে তমোঘ্নর হাতে দিয়ে উর্বাক্ষু চারু বক্সিকে বলে, "আচ্ছা ঘটনাটা আরেকবার আমাকে ডিটেলসে বলুন। কিচ্ছু বাদ দেবেন না।"

"আচ্ছা...", চারু বক্সি শুরু করলেন বলা, "ঝিরি শিলিগুড়ি কলেজে

পড়ে। ফাইনাল ইয়ার, ইংলিশে অনার্স।"

"ঝিরি কে?" উর্বাক্ষু জিজ্ঞেস করে।

"আমার মেয়ে। পিয়াসীরই ডাকনাম ঝিরি।"

"ও আচ্ছা। ঠিক আছে বলুন..."

"হ্যাঁ...", চেয়ারে নড়েচড়ে বসে নিজেকে আরেকটু গুছিয়ে নেন চারু বক্সি; তারপর বলতে শুরু করেন, "গতকাল ঝিরি সন্ধে নাগাদ বেরোল। ওদের কলেজের এক বন্ধু অঙ্কন; ওর বার্থডে ছিল কাল। ঝিরিরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ওই কেক আর গিফট টিফট কিনে অঙ্কনের বাসায় গেছিল। বাসায় গিয়ে ওকে সারপ্রাইজ দেবে এরকমই একটা প্ল্যান করেছিল নাকি ওরা বন্ধুরা মিলে।"

"বাড়ি থেকে একাই বেরিয়েছিল? না-কি কেউ ওকে নিতে এসেছিল?"

"না না, একাই। বাঘাযতীন পার্কের সামনে ওরা কয়জন বন্ধু মিলে মিট করবে। সেখান থেকে কেক গিফটস কিনে অঙ্কনের বাড়িতে যাবে; মানে বাড়ি থেকে এটা বলেই বেরিয়েছিল।"

"সন্ধ্যা মানে কয়টা?"

"সাড়ে পাঁচটা মতো হবে..."

"ও আচ্ছা... তারপর বলুন।"

"হ্যাঁ... তো রাত নয়টা বেজে গেল, মেয়ে ফিরল না। আমি একা মানুষ এ বাড়িতে।"

"আপনার স্ত্রী? মারা গেছেন না-কি ডিভোর্স?"

"না না, মারা যায়নি। ডিভোর্স। আমাদের বিয়ের আগে ওর একজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। ছেলেটা কিছু করত-টরত না বলে বিয়েটা আর হয়নি। তবে অনেক দিনের প্রেম ছিল; বেশ কয়েক বছরের... তো যাই হোক ওর সঙ্গে সেই ছেলেটার সম্পর্কটা ভেঙে যায় তখন। আমার স্ত্রীর নাম শুভশ্রী। আমাদের অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ হয়; মানে ওই সম্বন্ধ করে, দেখাশোনা করে বিয়ে। সামাজিক বিয়ে করে যে সংসার পাতা হয়, সেখানে দায়িত্ব কর্তব্য থাকলেও প্রেম ভালোবাসা বিশেষ থাকেনা। তো সেটা আলাদা টপিক। এবার বিয়ের পাঁচ-ছয় বছর পর জানতে পারলাম শুভশ্রীর সঙ্গে ওর সেই প্রাক্তন আবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। সে না-কি তখন একটা

কোম্পানিতে চাকরিও জুটিয়েছে। আমি প্রথম প্রথম ব্যাপারটা বিশেষ আমল দেইনি। কিন্তু শুভশ্রীর আচার ব্যবহারে তারপরের কিছুদিনের মধ্যে যে চেঞ্জটা দেখেছিলাম, সেটায় আমার মনের ভেতর সন্দেহটা হয়েছিল প্রথম। মানে যখন তখন বেরিয়ে যেত বাসা থেকে কাউকে কিছু না বলে। আগে যেই মেয়ে সংসার ছাড়া আর কিছু বুঝত না, হঠাৎ করে দেখি তার উড়ো উড়ো মন। লেট করে বাড়িতে ফিরত; কোথায় যাচ্ছে বা কোথা থেকে আসছে কিছুই বলতে চাইত না জিজ্ঞেস করলে... এসবই। বেশি জিজ্ঞেস করলে ঝামেলা করত। রিভার্স সাইকোলজি ব্যাপারটা শুভশ্রী ভালো বুঝত; আর আমার ওপর সেটাই অ্যাপ্লাই করতো ও। আমি অফিস থেকে ফোন করলে প্রায়ই ফোন বিজি পেতাম ওর। একদিন মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যায়। ঘড়িতে আড়াইটা মতো বাজে। দেখি শুভশ্রী আমার পাশে নেই। একটু চিন্তা হল। রাতবেরাতে কিছু হল না-কি আবার। আমি উঠে গিয়ে ওকে খুঁজতে গিয়ে দেখি আমাদের পেছনের দিকের ব্যালকনির এক কোণে ওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, দরজার দিকে পিঠ করে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে, কার সঙ্গে যেন ফোনে আস্তে আস্তে ফিসফিস করে কথা বলছে। আমি আড়ি পেতে কিছু কথা শুনতে পাই ওদের। আর সেদিনই আমার সন্দেহটা পাকাপোক্ত হয়। সেদিন... ওই রাতের বেলাতেই... আমি শুভশ্রীকে ডায়রেক্ট চার্জ করি। একথা সেকথায় চরম অশান্তি হয়। আর শেষ অবধি ও সবটা স্বীকার করে। হ্যাঁ ওর আর ওর প্রাক্তন প্রেমিকের মধ্যে নতুন করে না-কি একটা সম্পর্ক বিল্ডআপ হয়েছিল আবার এত বছর পর। তখন ঝিরি ছোটো। সবে সাড়ে চার-পাঁচ বছর বয়স। শুভশ্রী আমাকে ডিভোর্স দিয়ে ওর ওই প্রাক্তনের সঙ্গে নতুন সংসাড় পাতে।”

“ঝিরি কী ওনার কাছে থাকত না-কি আপনার কাছে?”

“ঝিরির জন্যই মূলত ইনডায়রেক্টলি আমাদের মধ্যে যোগাযোগটা ছিল। মানে, ঝিরি আমার কাছেই থাকত। কিন্তু মাসে দুবার ও ওর মায়ের কাছে যেত। ওখানে দু-তিনদিন থাকত; আবার আমি গিয়ে নিয়ে আসতাম ওকে। আমি ভেতরে ঢুকতাম না; এমনকি শুভশ্রী বা ওর নতুন হাজবেন্ডের সঙ্গে কথাও বলতাম না; ইনফ্যাক্ট এখনও বলিনা। কিন্তু আমি নিজে শুভশ্রীর সঙ্গে ঝিরির কোনও সম্পর্ক খারাপ হোক সেটা চাইনি; তাই আমি ঝিরির ক্ষেত্রে এই যাতায়াতটা অ্যালাও করতাম। হাজার হোক, শুভশ্রী ওর মা।”

"শুভশ্রী, মানে আপনার প্রাক্তন স্ত্রী ঝিরির কাস্টোডি চাননি?"

"প্রথমে চেয়েছিল। পরে নিজে থেকেই দায় এড়িয়ে যায়।"

"আচ্ছা, বুঝলাম। আচ্ছা তারপর কী হল বলুন..."

"তারপর ওই যা বললাম, ঝিরির রাত নয়টা বেজে গেছে ফেরেনি। আমি ভাবলাম আরেকটু দেখি। বার্থ-ডে পার্টিতে গেছে, একটু আনন্দ ফুর্তি করছে বন্ধুরা মিলে; আমি ফোন টোনও করিনি কাউকে। কিন্তু রাত বারোটা যখনবাজল, মেয়ে তখনও ফেরেনি, তখন আমি ঝিরিকে কল করি। ঝিরির মোবাইল অফ বলছিল। তখন আমি ওর এক বান্ধবী শর্বরীকে কল করি। ওর থেকেই শুনলাম ঝিরি না-কি রাত সাড়ে আটটার মধ্যেই অঙ্কনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। আমার তো মাথাই কাজ করছিল না। শেষে থানায় কমপ্লেইন করি।"

"এই কাগজের টুকরোটা কোথায় পেলেন?"

"ওই তখনই। থানার যাব বলে বেরোতে গেছি। দেখি গেটের মধ্যে গোঁজা এই কাগজটা"

"হাতের লেখাটা কি চেনা?"

"না, চেনা কারো না"

"ঝিরি কি সংস্কৃত জানত?"

"না না, ও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছে। জারমাল অ্যাকাডেমি। সংস্কৃত জানে না। আর এটা ওর হাতের লেখাও না। বললাম তো, চেনা কারও লেখা এটা না"

"আপনি বুঝলেন কী করে, যে এই কাগজে লেখা সংস্কৃত লাইনটার সঙ্গে ঝিরির নিখোঁজ হওয়ার কোন যোগ আছে?"

"দুইয়ে দুইয়ে চার করলাম... কারণ ঝিরি যখন বের হয়, তখন আমি গেট অবধি গেছিলাম ওকে এগিয়ে দিতে। তখন গেটে এমন কোনও কাগজ ছিল না গোঁজা। থাকলে নজরে পড়ত।"

"আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?"

"না, ওর ফ্রেন্ড সার্কেলের সবাই কম বেশি ভালো। ভদ্রঘরের ছেলে মেয়ে। আর তাছাড়া..."

চারু বক্সির কথা শেষ না-হতেই উর্বাক্ষু ওনাকে জিজ্ঞেস করে, "আপনার প্রাক্তন স্ত্রীকে আপনার সন্দেহ হয়না?"

চারু বক্সির মুখটা থমথমে হয়ে গেলো মুহূর্তে। মাথা নীচু করে, গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন, "না... ওর ঝিরিকে কিডন্যাপ করার কোনও কারণ নেই। আমি তো ওর সঙ্গে ঝিরির মেলামেশায় কখনও বাঁধা দেইনি। আর তাছাড়া সেটা করতে পারলে অনেক আগেই করতে পারত। এতবছর পর শুভশ্রীর পক্ষে ঝিরির কোনও ক্ষতি করার কারণ নেই।"

"বুঝলাম। আচ্ছা দেখুন মিস্টার বক্সি, আমাদের তদন্তের খাতিরে সবাইকেই কম-বেশিজেরা করতে হবে। তাই আপাতত আপনি আমাকে কয়েকটা ইনফরমেশন একটু নোটডাউন করে দিন। এক, আপনার প্রাক্তন স্ত্রীর বর্তমান ঠিকানা...ও, বাই দ্য ওয়ে, ওনার স্বামীর নাম কী?"

"অনুপম হাজরা।"

"বেশ... আর দুই, শর্বরী আর অঙ্কনের ঠিকানা, ফোন নম্বর।"

"আচ্ছা দিচ্ছি..." এই বলে চারু বক্সি চেয়ার ছেড়ে উঠে নোটবুক আনতে যাচ্ছিলেন; পেছন থেকে উর্বাক্ষু ওনাকে ডাকলেন, "আচ্ছা, কাল অঙ্কনদের বাসায় যাওয়ার টাইমে ঝিরি, মানে, পিয়াসীর গায়ে কীরকম ড্রেস ছিল?"

চারু বক্সি কটমট চোখে উর্বাক্ষুর দিকে তাকালেন। তারপর কিছু একটা চিন্তা করে উত্তর দিলেন, "ডেনিম জিন্স আর লাল রঙের একটা কুর্তি।"

"আচ্ছা। ও হ্যাঁ, আপনার মেয়ের একটা রিসেন্ট ছবি দেবেন আমাকে?"

"বেশ আমি দিচ্ছি। দু-মাস আগে বার্থডে ছিল ঝিরির, ওইদিন তোলা একটা ফটো।"

"হ্যাঁ তাই দিন..."

চারু বক্সি ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসলেন বসার ঘরে। হাতে একটা ছেঁড়া ডায়রির কাগজ। সেখানে শর্বরী অঙ্কন আর ওনার প্রাক্তন স্ত্রী শুভশ্রীর ঠিকানা আর ফোন নম্বর। এছাড়া এনেছেন ঝিরির একটা ফটো। ঝিরির ছবিটা ওনার হাত থেকে নিয়ে উর্বাক্ষু ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিল ছবিটায়। মেয়েটা দেখতে বেশ সুন্দর। কাঁধ অবধি নেমে

আসা লেয়ার কাট চুল, টানা টানা চোখ; রিমলেস ফ্রেমের চশমা চোখে। ছবিতে সালোয়ার কামিজ পড়া।

উর্বাক্ষু ছবিটা দেখতে দেখতে চারু বক্সিকে জিজ্ঞেস করল, "একপাশে তো আপনি। ওপাশে মহিলা কে?"

"শুভশ্রী..."

চমকে উঠল উর্বাক্ষু, "কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন শুভশ্রীর সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই..."

"হ্যাঁ নেই... কিন্তু ওইদিন মেয়ে জেদ করল তাই... আমার সায় ছিলো না।"

"বুঝলাম। মুখের আদল দেখে গেস করেছিলাম অবশ্য, উনিই শুভশ্রী। যাই হোক। আজকে উঠি। কিছু এগোলে, বা ইনফরমেশন পেলে জানাব আপনাকে।"

উর্বাক্ষু আর তমোঘ্ন বেরিয়ে আসল চারু বক্সির বাসা থেকে। জিপে করে থানার দিকে যেতে যেতে তমোঘ্ন উর্বাক্ষুকে জিজ্ঞেস করে, "এবার কী করব স্যার?'

জানলার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয় উর্বাক্ষু, "আগে একজন সংস্কৃত জানা লোককে দিয়ে এই কাগজের লেখাটার মানে উদ্ধার করো। আমাদের এরপর শর্বরী অঙ্কন আর চারু বক্সির প্রাক্তন স্ত্রী শুভশ্রীকে জেরা করতে হবে।

২

কলিং বেলটা বাজাতেই একটা একুশ-বাইশবছরের ছেলে দরজা খুলল। সুঠাম চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। একটা স্যান্ডো গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট পরা।

"অঙ্কন বসাকের বাড়ি এটা"উর্বাক্ষু জিজ্ঞেস করল ছেলেটাকে।

ছেলেটা পুলিশের ড্রেসে উর্বাক্ষুকে দেখে ঘাবড়ে গেছিল।ভ্যাবাচ্যাকার মতো ও আপাদমস্তক উর্বাক্ষুকে দেখছে। কী উত্তর দেবে ও বুঝতে পারছে না। উর্বাক্ষু ছেলেটাকে আবার প্রশ্নটা করে। এবার বেশ ঘাবড়ে গিয়েই

আলতো করে মাথা নাড়ায় ছেলেটা।

"অঙ্কন বাসায় আছে?"

এবারও প্রশ্ন শোনার পর ছেলেটা চুপ। চোখে-মুখে ওর একটা চাপা ভয় ফুটে উঠেছে। উর্বাক্ষু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটু গলার স্বর নরম করে জিজ্ঞেস করে, "এভাবে চুপ করে আছ কেন? এতভয়ই-বা পাচ্ছ কেন? আমি সাব ইন্সপেক্টর উর্বাক্ষু রায়। পিয়াসী বক্সির ব্যাপারে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল। অঙ্কন বাসায় থাকলে প্লিজ ওকে একটু ডেকে দাও। ভয়ের কিছু নেই।"

ছেলেটা উর্বাক্ষুর কথায় আশ্বস্ত হলো কি-না বোঝা গেল না। তবে এবার ওর মুখে কথা ফুটল। আমতা আমতা স্বরে বলল, "আমিই অঙ্কন বসাক। তবে বিশ্বাস করুন স্যার। আমি সত্যি বলছি। আমি কিছুই জানি না। আমি কিচ্ছু করিনি।"

"বেশ বিশ্বাস করলাম। এবার ঘরে বসে একটু কথা বলতে পারি তোমার সঙ্গে? কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিলো জাস্ট।"

অঙ্কন কাঁপা হাতে দরজাটা খুলে দিয়ে, সরে দাঁড়াল। উর্বাক্ষু ভেতরে ঢুকল। আর সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্কন দরজাটা বন্ধ করে দিল। উর্বাক্ষু বেশ বুঝতে পারছিল এই থানা পুলিশের ব্যাপারটা জানাজানি হোক সেটা অঙ্কন চাচ্ছে না।

উর্বাক্ষু ঘরে ঢুকে একটা সোফায় বসতে বসতে অঙ্কনকে জিজ্ঞেস করল, "বাসায় তুমি একা?"

ঘাড় নাড়িয়ে হ্যাঁ বলে অঙ্কন।

"আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারবে?"

"ফ্রিজের না-কি নরমাল জল?"

"নরমাল আনো..."

অঙ্কন ভেতরে জল আনতে যেতেই, উর্বাক্ষু বিদ্যুৎ বেগে সোফা থেকে উঠে, সমস্ত ঘরটা একবার খুব দ্রুত সার্চ করে নিল। বেশ ছিমছাম পরিপাটি ঘর। ড্রয়িং রুমের একপাশে দুটো সোফা সিঙ্গেল আর একটা লম্বা সোফা। মাঝে একটা কাচের গোল মতো টেবিল। টেবিলের মাঝখানে একটা অ্যাশট্রে রাখা। সেটায় এই মুহূর্তে বেশ কিছু আধখাওয়া সিগারেট গোজা আছে।

এককোণে একটা এলইডি টিভিসেট। আর আরেকপাশের দেওয়াল জুড়ে একটা প্লাইউডের শেল্ফ। শেল্ফে বেশ কিছু বই আর শো-পিস সাজানো। বইগুলোর মধ্যে হুমায়ূন আহমেদের দুটো বই, একটা দিব্যেন্দু পালিতের গল্প সমগ্র প্রথম খণ্ড, বিভূতিভূষণের রচনাবলীর তিনটা খণ্ড আর শরদিন্দু অমনিবাসের কয়েকটা খণ্ড। বইগুলো বোধহয় নেহাত লোক দেখানোর জন্যই রাখা হয়েছে। বিশেষ কারও বই পড়ার অভ্যাস নেই। বইগুলোর ওপর ঝুল পড়ে গেছে।

উর্বাক্ষু বইগুলো মন দিয়ে দেখছিল। এমন সময় জলের গ্লাস নিয়ে অঙ্কন ঘরে ঢুকল। উর্বাক্ষুকে শেল্ফের সামনে নাড়াঘাঁটা করতে দেখে ও কেমন একটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে জলের গ্লাসটা উর্বাক্ষুর দিকে এগিয়ে দিয়ে চাপা স্বরে বলে, "নিন..." উর্বাক্ষু বুঝতে পারছিল অঙ্কন যে-কোনো কারণেই হোক ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। ওকে সহজ না-করতে পারলে, একটা উত্তরও ঠিকঠাক পাওয়া যাবে না। উর্বাক্ষু হাসি মুখে জলের গ্লাসটা নিয়ে, এক ঢোকে সমস্ত জল শেষ করে, কাচের টেবিলে গ্লাসটা রাখতে রাখতে অঙ্কনকে বলল" "এবার কয়েকটা উত্তর তোমার কাছ থেকে চাই অঙ্কন। দেখো পিয়াসী তোমাদের ফ্রেন্ড। কাল থেকে ও মিসিং। লাস্ট ও তোমাদের বাসায় এসেছিল। তারপর আর রাতে বাড়ি ফেরেনি। ওর মোবাইলও বন্ধ। তাই তুমি কোঅপারেট না-করলে কিন্তু, এক আমি ঠিক করে তদন্ত করতে পারব না। আর দুই, তুমি দোষী না-হলেও, সন্দেহটা কিন্তু তোমাদের দিকে আগে পড়বে। আই থিংক তুমিও নিশ্চয়ই চাও পিয়াসীর খোঁজ পাওয়া যাক আর দোষীরা শাস্তি পাক।" এবার একটু শান্ত হল অঙ্কন। ধপ করে উর্বাক্ষুর সামনে সোফায় বসে পড়ল ও। শান্ত অথচ চাপা গলায় বলল, "হ্যাঁ বলুন, কী জিজ্ঞেস করার আছে আপনার।"

উর্বাক্ষু গলা খাকড়িয়ে, নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা শুরু করল, "কাল পিয়াসী ক-টা নাগাদ তোমাদের বাসায় আসে?"

"পিয়াসী তো একা আসেনি। শর্বরী, পিয়াসী, ডিজে, আরণ্যক আর রিয়া একসঙ্গে এসেছিল। ওরা ওই সাড়ে ছয়টা নাগাদ এসেছিল কাল।"

"তারপর বার্থ-ডে পার্টি ঠিক কতক্ষণ অবধি চলে তোমাদের এখানে?"

"পার্টি তো সাড়ে নয়টা অবধি চলেছিল। কিন্তু পিয়াসী অতক্ষণ ছিল না। ও সোয়া আটটা নাগাদ বেরিয়ে যায়..."

"ও আগে চলে গেছিল কেন?"

"মস্রওর******** শরীর না-কি খারাপ লাগছিল। তাই..."

"শরীর খারাপ? কী খারাপ লাগছিল কিছু বলেছে?"

"না সেটা কিছু বলেনি।"

"কাল তোমরা ড্রিংক করেছিলে? মানে বিয়ার বা ভদকা এই জাতীয় কিছু?"

"না-না, বাসায় ওসব কিছু করা যায় না-কি?"

"তার মানে বাসায় না হলে ড্রিংক করতে?"

"হ্যাঁ... না-করার তো কারণ নেই কোনও। তবে রেগুলার করি না। মাসে এক আধবার।"

"আচ্ছা। পিয়াসীও ড্রিংক করত?"

"হ্যাঁ, আমাদের গ্রুপের সবাই করে কম-বেশি।"

"আচ্ছা কাল পিয়াসী এখানে আসাড় পর কোনও অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করেছিলে ওর মধ্যে?"

"অস্বাভাবিক কিছু বলতে?"

"মানে ওর কথাবার্তায় কিংবা চালচলনে অস্বাভাবিক কিছু?"

"না তেমন কিছু না..."

"আচ্ছা পিয়াসী মেয়েটা এমনিতে কেমন?"

"কেমন বলতে?"

"অ্যাজ এ হিউম্যান বিং... কেমন?"

"স্যার পিয়াসী মেয়েটা খুব জেনুইন মেয়ে। তবে ওর বাপটা হারামি মাল আছে। আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই, পিয়াসীর মা বাবার মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেছে; পিয়াসী তখন ছোটো। পিয়াসীর মুখেই শুনেছিলাম ওর বাবা না-কি ওকে ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দিত না। ইভেন, ওর মা না-কি মেয়েকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল। পিয়াসীর বাবাই দেয়নি সেটা। পিয়াসী ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে এখনও ওর বাবা ঝামেলা

করে, এক দু-বার তো গায়েও হাত তুলেছিল।"

"আচ্ছা..."

"এসব নিশ্চয়ই ওর বাপ আপনাকে বলবে না। দেখুন ওই মালটাই কিছু করেছে না-কি মেয়ের সঙ্গে। বুড়োর যা রস, বিচিত্র কিছুই না।"

অঙ্কনের শেষ কথাটায় সুকৌশলে একটা লেজুড় জুড়ে দেয়। উর্বাক্ষু সেটা ধরতে পারল। কিন্তু অঙ্কনের পিয়াসীর বাবার ওপর এত রাগ কেন? সেটা ধরতে পারছিল না উর্বাক্ষু। অঙ্কন কি কিছু লুকাচ্ছে? পিয়াসীর বাবার সঙ্গে অঙ্কনের কোনও কেস হিস্ট্রি আছে? উর্বাক্ষু বুঝল, খুঁজে দেখতে হবে।

কথা ঘুরিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে উর্বাক্ষু, "আচ্ছা কাল তোমার বার্থডেতে ছবি তোলা হয়েছিল?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"ছবিতে পিয়াসী আছে?"

"হ্যাঁ কয়েকটা ছবিতে আছে। ও চলে যাওয়ার পর যেগুলো ছবি তোলা হয়, ওগুলোতে নেই।"

"আমাকে দেখাও ছবিগুলো।"

অঙ্কন তখনই মোবাইল বের করে, গ্যালারি ওপেন করে ছবিগুলো দেখাল উর্বাক্ষুকে। উর্বাক্ষু ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। পিয়াসীকে উর্বাক্ষু আগেই দেখেছিল চারু বক্সির বাসায়। তাই ওকে চিনতে অসুবিধা হল না উর্বাক্ষুর। বাকিদের চিনিয়ে দিলো অঙ্কন নিজেই। ছেলেটা এখন একটু সহজ হয়েছে আগের থেকে। ছবিগুলোর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। বরং পিয়াসীকে ছবিতে বেশ স্বচ্ছন্দ এবং হাসিখুশিই লাগছে।

"এই ছবিগুলো আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করে দাও তো।" উর্বাক্ষু অঙ্কনকে বলল। অঙ্কন সব কয়টা ছবি উর্বাক্ষুকে পাঠিয়ে দিল হোয়াটসঅ্যাপে।

"আজকে তাহলে উঠি হ্যাঁ? দরকার পড়লে যোগাযোগ করব আবার।"

উর্বাক্ষু একাই ড্রাইভ করে এসেছিল অঙ্কনদের বাসায়।

বেরোনোর সময় অঙ্কন নিজেই উর্বাক্ষুকে গেট অবধি এগিয়ে দিল।

(৩)

উর্বাক্ষু চুপচাপ একটা সোফায় বসে আছে। সামনে একজন ভদ্রমহিলা। বয়স পয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশের মধ্যে। তবে দেখে সেটা বোঝার উপায় নেই। পরনে একটা ঢোলা পায়জামা আর টপ। সিঁথিতে সিঁদুরের লেশমাত্র নেই। চোখের কোণে কিংবা মুখে বয়সের ছাপ নেই। বরং একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণ যে-কোনো কঠোর পুরুষের মনও নিমেষে গলিয়ে দিতে পারে। উর্বাক্ষু সামনে টেবিলে রাখা কফির কাপ থেকে ধোঁয়া বেরোতে বেরোতে এদিকেতে এখন প্রায় ঠান্ডা হওয়ার জোগাড়।

ভদ্রমহিলা কাপের ইশারা করে উর্বাক্ষুকে বললেন, "আপনার কফি... ঠান্ডা হয়ে গেল।"

ভদ্রমহিলার দিক থেকে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করছিল না উর্বাক্ষুর। তবু ওনার কথায় সম্বিত ফিরল একরকম। আমতা আমতা স্বরে বলল, "হ্যাঁ... খাচ্ছি। আমার একটু ঠান্ডা করে খাওয়াই অভ্যাস।"

মিথ্যে কথা বলল ও। কেন বলল এই সামান্য ব্যাপারে মিথ্যে কথা, উর্বাক্ষু নিজেও সেটা জানে না। চটপট কফির কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক ওতে। কফিটা সত্যি সত্যিই ঠান্ডা হয়ে গেছে।

কফি শেষ করে উর্বাক্ষুই এবার প্রথম কথা শুরু করল, "শুভশ্রী... হাজরা লেখেন না কি বক্সি?"

শুভশ্রী উর্বাক্ষুর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছেন। মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, "ভট্টাচার্য লিখি... আমার নিজের টাইটেল। নিজের একটা টাইটেল থাকতে ধার করা টাইটেল নিজের নামের পরে জুড়তে যাবকেন?"

হেসে ফেলল উর্বাক্ষু। মনে মনে ভাবল ভদ্রমহিলা শুধু আকর্ষক এবং স্টাইলিশই নন... বরং বেশ স্বাধীনচেতা।স্বাধীনচেতা মানুষগুলোর মধ্যে আলাদা একটা অ্যাপিল থাকে; মানুষকে মুগ্ধ করার একটা অ্যাপিল। উর্বাক্ষু আবার জিজ্ঞেস করে, "পিয়াসীর সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা হয়?"

"ওর সঙ্গে আমার দেখা হতো না সেভাবে। লাস্ট ক-মাস আগে ওর বার্থডের দিন দেখা হয়েছিল। মেয়ের আবদার ছিল আমাকে আর ওর বাবাকে একসঙ্গে পাশে চাই। চারু এসে খবর দিল। আমি প্রথমে বেশ

আনকমফোর্ট ফিল করছিলাম। কিন্তু শেষে কেন জানি রাজি হয়ে গেলাম। আমার হাজবেন্ড অনুপম কিছু বলেনি এ ব্যাপারে। ও এসবে মাথা ঘামায় না। লিবারেল হাজবেন্ড। দ্বিতীয় পক্ষের সম্পর্কগুলো এরকমই গা-ছাড়া হয়। একটা সময় পর সম্পর্কের রোমাঞ্চটা গা থেকে ঝরে যায়। অনুপমকেও চারু ইনভাইট করেছিল। ও যায়নি। আমি একা গেছিলাম। এছাড়া পিয়াসী, মানে ঝিরির সঙ্গে সেভাবে দেখা হয় না আমার। চারুই দেখা করতে দিত না। একটা সময় এটা নিয়ে খুব ফাইট করেছিলাম। কিন্তু এখন আর যায় আসে না কিছু। টানও কেটে গেছে। এই দেখুন, ঝিরি মিসিং, বাট স্টিল আই ডোন্ট গিভ আ ড্যাম।" উর্বাক্ষু লক্ষ করল কথাটা বলতে বলতে শুভশ্রীর চোখের কোণে চিকচিক করছে জল। যতটা মেন্টালি স্ট্রং একটা মানুষ বাইরের লোকেদের সামনে নিজেকে দেখানোর চেষ্টা করে, ততটা মেন্টালি স্ট্রং আসলে সে হয় না।

উর্বাক্ষু পালটা প্রশ্ন করে, "আপনি বললেন ক-মাস আগে চারুবাবু আপনার এই বাসায় এসেছিলেন ঝিরির জন্মদিনে আপনাকে আর অনুপম বাবুকে ইনভাইট করতে। আপনার সঙ্গে চারুবাবুর যোগাযোগ বা যাতায়াত আছে এখনও?"

"এই প্রশ্নটা আপনি চারু বাবুকেই করবেন না হয়।"

"উনি বলেছেন আপনার বা আপনাদের সঙ্গে ওনার একেবারেই কোনও যোগাযোগ নেই। জাস্ট ঝিরিকে মাসে দু-বার এখানে দু-তিন দিনের জন্য এখানে রেখে যেতে আসেন। বাইরে থেকেই চলে যান। তো সেই স্টেটমেন্টের সঙ্গে আপনার স্টেটমেন্ট মিলছে না।"

"আসলে মহান সাজতে চাওয়াটা আমাদের ঐতিহাসিক দোষ। আমার যা-বলার বললাম। বিশ্বাস করাটা আপনার ওপর। বিশ্বাস জিনিসটা কোনও ট্যাবলেট না যে খাইয়ে দিলেই টোটকা সফল।"

শুভশ্রীর কথাটার মধ্যে তীব্র একটা ব্যঙ্গ আছে, সেটা উর্বাক্ষু ভালোই ধরতে পারল। প্রত্যুত্তরে ও শুধু মৃদু হাসল।

শুভশ্রীর স্টেটমেন্ট রেকর্ড করে বাইরে আসতে আসতে উর্বাক্ষুর একটা ব্যাপারে খটকা লাগছিল; চারু বক্সি নিজেই তদন্ত করতে উর্বাক্ষুর থানায় কমপ্লেইন করেছিলেন। আবার নিজে এতোগুলো মিথ্যা কথাই-বা বললেন কেন? অঙ্কন আর শুভশ্রীর স্টেটমেন্ট বেশ খানিকটা মিলে যাচ্ছে। আর সেই

দুটো ধরে এগোলে এটা দাঁড়ায় যে, পিয়াসীকে চারু বক্সি ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দিতেন না। ঝামেলা করতেন। এখানেই চারু বক্সি মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ভদ্রলোকের মিথ্যা বলার কারণটাই-বা কী? ভদ্রলোক বললেন শুভশ্রীর সঙ্গে ওনার নিজের কোনও যোগাযোগ বা যাতায়াত নেই। অথচ শুভশ্রীর কথা অনুযায়ী সেটাও মিথ্যা। যাতায়াত যোগাযোগ দুটোই ছিল। তাহলে?

কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা এখানেই ব্যাপারগুলো ঘোঁট পাকিয়ে যাচ্ছে। চারু বক্সি নিজেই পিয়াসীর ক্ষতি করলে, আগ বাড়িয়ে থানায় এসে কমপ্লেইন করবেনইব-কেন? আর শুভশ্রী কিংবা অঙ্কন দু-জন দু-জনকে চেনে না; সেক্ষেত্রে দু-জনের স্টেটমেন্ট ম্যাচ হওয়াটা প্রি-প্ল্যানড কিছু না।

থানায় ঢুকতেই তমোঘ্নের সঙ্গে উর্বাক্ষুর দেখা। উর্বাক্ষু অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করল ওকে, "সংস্কৃত লাইনটার মানে উদ্ধার করা গেছে?"

তমোঘ্ন কাচুমাচু মুখ করে বলল,"না স্যার... আমি ওই নেতাজী বয়েজের ওখানে একটা কালী মন্দিরে নিয়ে গেছিলাম। ওখানকার পুরোহিতটা নতুন। ও জানে না এসব। আরেকটা লোকনাথ মন্দির পড়ে ফেরার পথে। ওখানেও দেখালাম। কিন্তু ওখানকার পুরোহিতও কিছু বলতে পারল না।"

"খোঁজ করো এখানে শিলিগুড়ি কলেজে সংস্কৃত কে পড়ান। তার সঙ্গে একটা অ্যাপোয়েন্টমেন্ট ফিক্সড করো।"

"ওকে স্যার।"

কথাটা শেষ করে বেরিয়ে গেল তমোঘ্ন। থানায় ঢুকে নিজের চেয়ারে বসল উর্বাক্ষু।

মাথা থেকে শুভশ্রীর চিন্তা কিছুতেই বেরোচ্ছে না ওর। ভদ্রমহিলার শুধু অ্যাটায়ারে না, কথাবার্তাতেও একটা আলাদা আকর্ষণ আছে।

৪

"স্যার, মে আই কাম ইন..."

উর্বাক্ষু দেখে, দরজার সামনে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বয়সই আন্দাজ ওই কুড়ি-একুশ মতো হবে। কাঁধ অবধি চুল; জিন্স আর শার্ট গায়ে; শার্টের ফাঁক দিয়ে গলার ঠিক নীচে একটা ট্যাটু উঁকি দিচ্ছে। সাজপোশাক

ভালো। ড্রেসিং সেন্স, অ্যাটায়ার দেখেই বোঝা যায় পয়সাদার ফ্যামিলি থেকে বিলং করে।

একজন কনস্টেবল উর্বাক্ষুর কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, "স্যার, রিয়া... থেকে ফোন করা হয়েছিল। দেখা করতে বলা হয়েছিল থানায় ওকে।"

উর্বাক্ষু হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, "হ্যাঁ আসো..."

মেয়েটা উর্বাক্ষুর সামনে এসে দাঁড়াল বটে, কিন্তু চেয়ার টেনে বসল না। কী একটা ব্যাপারে ইতস্তত করছে মনে হয়।

উর্বাক্ষু মেয়েটার অস্বস্তি আঁচ করতে পেরেই সহজ গলায় সামনে রাখা চেয়ার দেখিয়ে বলল ওকে, "আরে বসো... দাঁড়িয়ে কেন?"

মেয়েটা বসল। চেয়ারে বসে রিয়া এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। থানায় হয়তো ওর প্রথমবার আসা। ঘর জুড়ে চেয়ার আর টেবিল পাতা। সেখানে কনস্টেবলরা কমপ্লেইন লজ করছে। একটা টেবিলে পার্টির সঙ্গে একজন কনস্টেবলের তর্কাতর্কি চলছে কোনও একটা ব্যাপারে। আরেকটা টেবিলের সামনে চেয়ার পাতা; ওতে একটা রোগাটে মতোন ছেলে বসে আছে। কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠে গিয়ে উলটো দিকের চেয়ারে বসে থাকা কনস্টেবলটা ছেলেটাকে ঠাটিয়ে চড় কষাল। আরেক কোণে একটা লম্বা মতো বেঞ্চি। সেখানে দু-জন লোক বসে ঝিমাচ্ছে। মাল খেয়ে ড্রাইভ করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। লাইসেন্স দেখাতে পারেনি। থানায় ধরে আনা হয়েছে। হয়তো কিছু ফাইন করে ছেড়ে দেওয়া হবে। না-হলে একদিনের হাজতবাস।

রিয়া মেয়েটা এই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না। উর্বাক্ষু ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে শান্ত গলায় রিয়াকে বলল, "ওদিকে দেখার দরকার নেই। এখানে এটাই কালচার। আপনি নতুন। এসব দেখলে আরো নার্ভাস হয়ে পড়বেন। তারচেয়ে বরং আপনার স্টেটমেন্টটা রেকর্ড করি। আপনি চলে যান।"

উর্বাক্ষুর কথা শুনে রিয়া ওর দিকে একটা ভয় মেশানো চোখে তাকাল। প্রত্যুত্তরে উর্বাক্ষু একটা ভরসার হাসি হাসল ওর দিকে তাকিয়ে। কতটা কাজ হল এতে জানে না ও, কিন্তু এরপরই রিয়া একটু নড়েচড়ে বসে উর্বাক্ষুকে বলল, "বলুন কী জানতে চান?"

"সেদিন আপনারা পাঁচ বন্ধু একসঙ্গে অঙ্কনের বাড়িতে গেলেন। কিন্তু পিয়াসী ওরকম সাত তাড়াতাড়ি পার্টি থেকে চলে গেল কেন?"

রিয়ার উত্তর দিতে একটু সময় লাগল। নিজেকে প্রথমে একটু গুছিয়ে নিয়ে ও বলা শুরু করল, "আসলে স্যার প্রবলেম হয়েছিল..."

"কীরকম প্রবলেম?"

"অঙ্কন কিছু বলেনি আপনাকে"

"না..."

"অ্যাকচুয়ালি, সেদিন অঙ্কনদের বাসায় আমরা ট্রুথ এন্ড ডেয়ার খেলছিলাম। এই খেলাটা আপনি জানেন?"

"হ্যাঁ, জানি; একটা বোতল মাঝে রেখে সেটার চারপাশে গোল করে সবাই বসে। বোতলটা ঘোরানো হয়। যার দিকে বোতলের মুখটা পড়ে, তাকে অপশন দেওয়া হয় ট্রুথ না-কি ডেয়ার নেবে সে। ট্রুথ নিলে, যে প্রশ্ন করা হবে, সেটার অনেস্ট উত্তর দিতে হবে। আর ডেয়ার সিলেক্ট করলে, যা করতে বলা হবে, সেটা করতে হবে।"

"হ্যাঁ... তো খেলা শুরু হল। বোতল ঘোরানো হল। অঙ্কনের দিকে বোতলের মুখটা পড়ে। অঙ্কন ডেয়ার অপশনটা সিলেক্ট করে। ওকে টাস্ক দেওয়া হয় পিয়াসীকে কিস করতে হবে। পিয়াসী একটু হেজিটেট ফিল করছিল প্রথম প্রথম। আমাদের চাপে রাজি হয়ে যায়। ইট ওয়াজ় জাস্ট আ ফান গেম। তো পিয়াসী অঙ্কনকে কিস করে। এন্ড ওই মুহূর্তের একটা ছবি ডিজে মোবাইলে তুলে ফেলে। আর এখানেই প্রবলেম তৈরি হয়।"

"ডিজে? এটা কেমন নাম?"

"না না স্যার; ওর নাম দেবজ্যোতি। আমরা ডিজে ডাকি।"

"আচ্ছা। তারপর?"

"তারপর পিয়াসী ডিজের ওই ফটো তোলার ব্যাপারটা নিয়ে ঝামেলা শুরু করে ডিজের সঙ্গে। ডিজে জাস্ট ফর ফান ওটা তুলেছিল। পিয়াসী এতটা রিয়াক্ট করবে আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। আমরা আগেও একসঙ্গে বুজ পার্টি করেছি। মাল খেয়ে টং হয়ে কত মাতলামি করেছি— নাচ গান, গালিগালাজ... সেসব ভিডিও আছে আমাদের না কারও মোবাইলে। কারও এটাতে কেউ মাইন্ড করে না। পিয়াসীও কোনোদিন করেনি। কিন্তু ওইদিন

ডিজের ছবি তোলা নিয়ে পিয়াসী ঝামেলা শুরু করে। ডিজে ছবিটা ডিলিটও করে দিয়েছিল। তা-ও ও মানতে চাইছিল না। আমরা ব্যাপারটা সহজ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু... পিয়াসী আর ওখানে একমুহূর্ত থাকেনি। ও বেরিয়ে যায়। আমরা ওই মুহূর্তে এতটা পাজেলড হয়ে গেছিলাম যে কী করব বুঝতে পারছিলাম না। পিয়াসীকেও আটকানো হয়নি। পরদিন শুনি পিয়াসী বাড়ি ফেরেনি।"

"ডিজের বাড়ি কোথায়? ফুল নাম আর ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যাও। অ্যাই অশোক, একটু মেয়েটার কাছ থেকে একটা অ্যাড্রেস নোট ডাউন করে নাও তো।"

উর্বাক্ষু অশোককে ইশারা করে রিয়াকে দেখিয়ে দেয়। রিয়া ডিজের অ্যাড্রেস আর মোবাইল নম্বরটা অশোকের কাছে লিখে দিয়ে, থানা থেকে বেরিয়ে যায়।

রিয়া বেরিয়ে যেতেই উর্বাক্ষু অশোককে বলে, "ডিজেকে আমার আজই থানায় চাই। আর আজকের মধ্যে ওর কনট্যাক্ট, কল রেকর্ড আর কাকে কী ম্যাসেজ করেছে, সেগুলো আমার চাই। ওর বাসায় এখনই যাও। ওর মোবাইলটা নিয়ে থানায় জমা করবে। আর ওকে নিয়ে আসবে থানায়। কুইক কুইক। এখনই বেরিয়ে পড়ো। প্রবলেমটা হচ্ছে চারু বক্সি, অঙ্কন সবাই কিছু না কিছু লুকিয়েছে আমাদের থেকে। এই কেস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সলভ করতে হবে। দেরি হলে প্রবলেম।"

উর্বাক্ষুর কথা মতো অশোক আর তমোঘ্ন ডিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

৫

ডিজেকে থানায় আনা হয়েছে। লম্বা পেটানো চেহারা। আন্ডারকাট হেয়ার স্টাইল করা। চোখের চাহনিতে একটা চাপা রাগ। ডিজে একটা চেয়ারে বসে আছে। আগের রাতটা ওকে সাসপেক্ট হিসেবে লকআপে কাটাতে হয়েছে। ডিজের গত এক মাসের কলরেকর্ড, ম্যাসেজের স্ক্রিনশট সব কালেক্ট করা হয়েছে।

উর্বাক্ষু ডিজের সামনে বসা। ঘড়িতে এখন প্রায় এগারোটা ছুঁই ছুঁই।

বাইরে রোদ কড়া হচ্ছে। আজকে গরম পড়বে, সেটা রোদের তেজ দেখেই আন্দাজ করা যাচ্ছে। গতকাল আর আজকে সকালটা এই পুরোটা সময় উর্বাক্ষু ডিজের কলরেকর্ড আর ম্যাসেজ স্টাডি করেছে।

ডিজের পিয়াসীকে পাঠানো যাবতীয় ম্যাসেজের স্ক্রিনশট প্রিন্ট করে উর্বাক্ষুকে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে গত একমাসে ডিজেকে যতবার পিয়াসীকে কল করেছে সেই কলরেকর্ড।

ডিজে একদৃষ্টিতে উর্বাক্ষুকে আপাদমস্তক দেখছে। ওর চোখে মুখে একটা চাপা উত্তেজনা আর অশান্তি স্পষ্ট। উর্বাক্ষুর সঙ্গে ওখানে আরো দু-জন কনস্টেবল আছে।

শান্ত গলায় উর্বাক্ষু ডিজেকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি সরাসরি সত্যিটা বলবে? না-কি..."

"সত্যির কী আছে? আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন। পিয়াসী সেদিন রাগারাগি করে বেরিয়ে গেছিল অঙ্কনদের বাসা থেকে। আমি কিন্তু পেছন পেছন যাইনি ওর। আমি কী করে সাসপেক্ট হলাম?"

"না আমার এখানে খুব সহজ একটা প্রশ্ন আছে ডিজে। তোমরা আগেও অনেক বুজ পার্টি করেছো একসঙ্গে; এর আগেও তোমাদের বন্ধুদের অনেক আপত্তিকর মুহূর্তের ছবি তোলা বা ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছে। কোনোবার পিয়াসী মাইন্ড করেনি। কিন্তু ঠিক ওইদিন অঙ্কনের বাসায় তোমার একটা ছবি তোলা নিয়ে এতসিন ক্রিয়েট করল কেন?"

"সেটা আমি কী করে বলব? আমি ছবিটাও ডিলিট করে দেই। আপনারা তো মোবাইল ঘেটেছেন। দেখেছেন ওরকম কোনও ছবি?"

"না সেটা দেখিনি। আচ্ছা যদি বলি, পিয়াসীর ব্যাপারে তুমি এমন কিছু জানতে, আর সেই ব্যাপারটা নিয়ে তুমি পিয়াসীকে রিসেন্টলি ব্ল্যাকমেইল করছিলে... তাই সেদিন পিয়াসী তোমার সামান্য একটা ফটো তোলায় এতটা রিয়াক্ট করেছে..."

মুহূর্তে ডিজের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। রাগত স্বরে শাসিয়ে শাসিয়ে ও উর্বাক্ষুকে জিজ্ঞেস করল, কী ভুলভাল চুলের চপ গল্প বানাচ্ছেন?"

উর্বাক্ষু উত্তেজিত হল না। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বলল, "চুলের চপ? আই মাস্ট সে ডিজে, হয় তুমি এতদিন ভুল দোকান থেকে

চপ খেয়ে এসেছ; আর না-হলে ভুল জিনিসকে এতদিন চপ বলে জেনে এসেছ।"

একটু থতমত খেয়ে গেল ডিজে। উর্বাক্ষু তৈরিই ছিল। এবার পরপর প্লট সাজিয়ে নিয়ে ও বলা শুরু করল, "গত সেকেন্ড মার্চ কিছু একটা হয়েছিল পিয়াসীর সঙ্গে; আই মিন অন্তত পিয়াসী ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত ছিল। সেটার একটা ভিডিও ফুটেজ কিংবা প্রমাণ তোমার কাছে কোনোভাবে ছিল। এন্ড তুমি তারপর থেকে একাধিকবার ওকে ব্ল্যাকমেইল করে গেছ। সেটার প্রমাণ পিয়াসীর সঙ্গে তোমার কল রেকর্ড আর পিয়াসীকে পাঠানো তোমার ম্যাসেজ..."

কথাটুকু শেষ করে উর্বাক্ষু একটা স্ক্রিনশটের প্রিন্টআউট কপি বের করে পড়া শুরু করল, "এই দেখো। এটা পাঁচই এপ্রিল তোমাদের কনভারশেসন। তুমি লিখেছ রাত বারোটা তিন মিনিটে পিয়াসীকে, থিংক বিফোর ইউ ডু এনিথিং। আই হ্যাভ প্রুফ। লাইফ হেল করে ছাড়ব তোর। তারচেয়ে যেটা বলছি, মিউচুয়াল করে নে..."

এই ম্যাসেজের রিপ্লাইয়ে পিয়াসী বারোটা আট মিনিটে রিপ্লাই করেছে, "তোকে বললাম তো, আই নিড সাম টাইম। এত অধৈর্য্য হয়ে প্রেসার ক্রিয়েট করছিস কেন?" রিপ্লাইয়ে তুমি একটা থাম্বস আপ ইমোজি পাঠিয়েছ ওকে। এরকম ব্ল্যাকমেইল তুমি ওকে গত মাসের শেষ সপ্তাহ অবধি করে গেছ। লাস্ট ম্যাসেজ পাঠানো হয়েছে ঊনত্রিশে জুলাইয়ে; পিয়াসী পাঠিয়েছে তোমাকে, "ওকে আমি রাজি..." আর তুমি রিপ্লাই করেছো, "গুড ফর ইউ..." তারপর আর কোনও কলরেকর্ড বা ম্যাসেজ হয়নি। বাট আমি জানি এরপর কিছু একটা হয়েছে তোমাদের মধ্যে। যেটা শুধু তুমি আর ও জানো। আর এটাও কনফার্ম তুমি ওকে ব্ল্যাকমেইল করে করে ফোর্স করে সেই কাজটা করতে বাধ্য করেছ। হয়তো সেই কারণেই পিয়াসী ওইদিন তোমার ছবি তোলার পর সিন ক্রিয়েট করে বেরিয়ে যায় আর আবার সেকেন্ড টাইম ব্ল্যাকমেইল হওয়ার ভয়ে সুইসাইড অ্যাটেম্পট করে। হতেও পারে। পিয়াসীর বডি পাওয়া গেলে, আর পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কজ অফ ডেথ সুইসাইড এলে, সাসপেক্ট হিসেবে তুমি ফাঁসবে। কারণ কিছুদিন আগেই তুমি ওকে দিয়ে ফোর্স করে কিছু একটা কাজ করিয়েছ। কিন্তু সেই কাজটা কী?"

ডিজের চোখে মুখে এখন আর রাগ নেই; বরং একটা চাপা ভয় ছেয়ে

আছে। কেমন একটা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও উর্বাক্ষুকে দেখছে। উর্বাক্ষুর চোখের দৃষ্টি শান্ত। কিছুক্ষণ এভাবে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মুহূর্তে ভেঙে পড়ল ছেলেটা। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল এক ঘরভরতি লোকজনের মাঝখানে। উর্বাক্ষু দেখল ছেলেটার সমস্ত শরীরটা ফুলে ফুলে উঠে আবার চুপসে যাচ্ছে।

৬

সামনে রাখা স্টিলের গ্লাসভর্তি জল ঢকঢক করে এক নিশ্বাসে গিলে, নিজেকে একটু থিতু করে নিয়ে, বলা শুরু করল ডিজে, "স্যার, পিয়াসীর মাইন্ডসেট বরাবর একটু অন্যরকম ছিল। মাঝে মাঝেই একটু অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড হয়ে পড়ত; মাঝে মাঝেই... ও ভীষণই আনস্টেবল মেন্টালিটির। তারওপর নিশ্চয়ই জানেন ছোটোবেলায় ও নিজের বাবা-মায়ের ডিভোর্স দেখেছে। সম্পর্ক ব্যাপারটা ও ঠিক করে কোনোদিন বুঝতেও পারেনি; ইনফ্যাক্ট নিজের মধ্যেও বিল্ডআপ করতে পারেনি সম্পর্কের কনসেপ্টটা। ওকে বরাবরই দেখেছি, ফেসবুকে সহজেই কারও ওপর ক্রাশ খেয়ে রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে বসত। তারপর তার সঙ্গে ডেটিং, হুকআপ, ইন্টিমেসি, দু-দিন পর ব্রেকআপ। অনেকবার সম্পর্কেও জড়ায়নি। জাস্ট টাইমপাসের জন্য অন্য ছেলেদের সঙ্গে মাখামাখি করেছে। আমাদের প্রত্যেকেরই কম-বেশি নেশার হ্যাবিট আছে। কিন্তু সেটা অকেশনালি। কিন্তু পিয়াসী ছিল অ্যাডিক্টেড। লিফসের মধ্যে গাঁজা ভরে... বা আমরা যখন একসঙ্গে ড্রিংকস করতাম দেখতাম, ও লিটারেলি বোতল ধরে গলায় ঢালত। অঙ্কনের পিয়াসীর ওপর বরাবরই একটু চাপ ছিল। মানে অঙ্কন ওকে লাইক করত। পিয়াসী রিলেশন নিয়ে বরাবরই ক্যাজুয়াল ছিল। এসব দেখে ও মজা পেত বেসিক্যালি। তো স্যার, এটা আমি অঙ্কনের মুখে শুনেছি, আই ডোন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট ইট..."

"কী শুনেছ?"

"পিয়াসী একদিন কী একটা কাজে অঙ্কনের বাসায় গেছিল। অঙ্কনদের বাসা ফাঁকা ছিল। তো কী হয়েছে জানি না। বাট অঙ্কন যেটুকু বলেছে, অঙ্কন পিয়াসীকে না-কি বলে, ওর বাবা মালয়েশিয়া থেকে ভালো ব্র্যান্ডেড মদ

এনেছে; তো সেটা পিয়াসী টেস্ট করবে না-কি। অ্যান্ড স্যার আমি পুরোটা শুনিনি। তবে ওরা ড্রিংকস করে। অ্যান্ড আফটার দ্যাট দে হ্যাড সেক্স। পুরোটাই নেশার ঘোরে অবশ্য। কিন্তু এটা অঙ্কনের প্রি-প্ল্যানড ছিল। ও সেটা মোবাইলে ভিডিও করে নেয়। আমাকে অনেক পরে ব্যাপারটা বলে অঙ্কন। আমাকে ভিডিওটাও দেখায়। অঙ্কন ভিডিও করেছে এটা পিয়াসী জানে না। আর যেহেতু পুরো ব্যাপারটাই নেশার ঘোরে হয়েছে, সেটা ও অতটা গায়ে মাখেনি। আসলে পিয়াসী এমন একটা মেয়ে, যে এসব ছেলেসঙ্গ এনজয় করে... আমি সেই ব্যাপারটা নিয়েই পিয়াসীকে পরে ব্ল্যাকমেইল করি আর বলি অঙ্কনকে এক্সপোজ করতে সবার সামনে।"

"পিয়াসী তোমাকে জিজ্ঞেস করল না যে তুমি কী করে জানলে ওদের মধ্যে সেক্স হয়েছে— এই ব্যাপারটা? ওই ঘরে তো অঙ্কন আর পিয়াসী ছাড়া কেউ ছিল না। তাহলে নিশ্চয়ই তোমাকে অঙ্কন বলেছে ঘটনাটা। কিন্তু তা-ও পিয়াসীর অঙ্কনের ওপর সন্দেহ বা খারাপ লাগা তৈরি হয়নি? কিন্তু তোমার ওপর সেই খারাপ লাগাটা তৈরি হল?"

"পিয়াসী বরাবরই ক্যাজুয়াল। আর অঙ্কনের বাবার মালদার পাবলিক। অঙ্কনকে হাতে রাখলে ফায়দা বেশ।"

"বুঝলাম। আচ্ছা তুমি সংস্কৃত জানো? মানে পড়তে বা বলতে বা লিখতে পারো সংস্কৃতে?"

একটু থতমত খেয়ে উত্তর দেয় ডিজে, "সংস্কৃত? না স্যার...আমি জানি না। কেন?"

"না এমনি জিজ্ঞেস করছি। কিন্তু ট্রাস্ট মি, এতসুন্দর গুছিয়ে মিথ্যে বলতে আগে কাউকে শুনিনি। কিন্তু গল্প বলতে গেলে, প্লটহোল রাখলে চলে না।"

"মানে? কী বলছেন এসব? কী মিথ্যা বললাম আমি?"

"অঙ্কন তোমাকে বলল, পিয়াসী আর ও সেদিন নেশা করে ফিজিক্যালি ক্লোজ হয়েছিল। আর সেটা অঙ্কন মোবাইলে ভিডিও করেছিল লুকিয়ে লুকিয়ে। তুমি সেটা পিয়াসীকে জানিয়ে ফোর্স করলে অঙ্কনকে এক্সপোজ করতে। পিয়াসী যখন শুনল তুমি সব জানো, তখনই ওর সন্দেহ হওয়া উচিত অঙ্কনের ওপর; কারণ বাসায় অঙ্কন আর পিয়াসী ছাড়া কেউ ছিল না।

পিয়াসী তারপরও অঙ্কনের বার্থডেতে ওদের বাসায় গেল; ট্রুথ এন্ড ডেয়ার খেলতে গিয়ে ওকে চুমুও খেল। কিন্তু তুমি সেটার ছবি তুললে বলে রাগটা তোমার ওপর করল পিয়াসী। অথচ তোমাদের বন্ধুদের এরকম অনেক ছবি ভিডিও আগেও তোলা হয়েছে। রিয়াই সেটা জানিয়েছে আমাদের। তুমি তো গল্পের গরুকে গাছে না, সোজা মহাকাশে পাঠিয়ে দিয়েছ। আমার মনে হয়, ব্যাপারটা উলটো হয়েছে। মানে অঙ্কনের সঙ্গে পিয়াসীর কিছু হয়নি। ওটা তোমার সঙ্গে হয়েছিল। তুমি পিয়াসীকে লাইক করতে মনে মনে। সেদিন চান্স পেয়ে, ওকে নেশা করিয়ে, সুযোগের সদব্যাবহার করেছিলে জাস্ট। আর সেটাই নিজের মোবাইলে লুকিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে ওকে ব্ল্যাকমেইল করে, নেক্সট টাইম আরেকবার ওকে তোমার সঙ্গে ফিজিক্যাল হওয়ার অফার করেছিলে। আর পিয়াসী শেষে বাধ্য হয়ে রাজিও হয়ে যায়। দেখো, সাজিয়ে সাজিয়ে মিথ্যা তুমি বলতেই পারো। কিন্তু সত্যি কী করে বলাতে হয়, আমরা জানি। সো ওভার স্মার্টনেস দেখানোর চেষ্টা করবে না একদম।"

ডিজের মুখ শুকিয়ে গেছে ভয়ে। চোখে মুখে চাপা আতঙ্ক। নিষ্প্রভ চোখের চাহনিতে ও উর্বাক্ষুকে দেখছে। উর্বাক্ষুর চোখের চাহনি আগের মতোই শান্ত। সমস্ত ঘরে এখন নিস্তব্ধতা খেলা করছে। হঠাৎ আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল উর্বাক্ষুর সামনের বছর একুশের ছেলেটা, "স্যার আমি ভুল করেছি। কিন্তু ট্রাস্ট মি আমি ওসব ভিডিও অনেক আগেই ডিলিট করে দিয়েছিলাম। জাস্ট ওই মোমেন্টে...আমি ভুল করেছি স্যার। বাট অন গড বলছি স্যার, পিয়াসীর মিসিংয়ে আমার কোনও হাত নেই। আমি কিচ্ছু জানি না, কিচ্ছু করিনি স্যার। প্লিজ ট্রাস্ট মি... আমার কেরিয়ার শেষ হয়ে যাবে স্যার। আমি সত্যি সত্যি এসবের সঙ্গে জড়িত না।"

"কেরিয়ার শেষ হয়ে যাবে, সেটা ব্ল্যাকমেইলিংগুলো করার আগে তোমার ভাবা উচিত ছিল। একজনের ব্যক্তিগত মুহূর্তের ভিডিও নিয়ে তুমি তাকে ব্ল্যাকমেইল করছ; এটাও ক্রাইম।"

কথা শেষ করে উর্বাক্ষু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কনস্টেবল শতরূপ উর্বাক্ষুর কানের কাছে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "একে কী করব স্যার?"

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে উর্বাক্ষু শান্ত গলায় বলল, "কী আবার করবে, লকআপে ঢুকিয়ে দাও। কেস সাজাতে হবে বুলিং আর ব্ল্যাকমেইলিং

এর।”

উর্বাক্ষু বেরিয়ে আসতেই তমোঘ্ন খবর দিল, “স্যার চারু বক্সির ওপর গতকাল অ্যাটাক হয়েছে। বাজেভাবে জখম হয়েছে ভদ্রলোক। ফোন করেছিল।”

“ইন্টারেস্টিং, চলো, জিপ বের করতে বলো। এখনই একবার ঘুরে আসি চারু বক্সির ওখান থেকে।”

৭

চারু বক্সীর বাঁ-দিকের চোখটা লাল হয়ে আছে; আর তার চারপাশে গোলমতো কালশিটে। কপালের এককোণে ব্যান্ডেড লাগানো। গলায় একটা নেক বেল্ট পরা। ভদ্রলোক সোফায় বসে আছেন। গতকালের এই অ্যাটাকের পর চারু বক্সী এমনিতেই একটু মুষড়ে পড়েছেন। তার ওপর ক-দিন ধরে ওনার মেয়ের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। উর্বাক্ষু চারু বক্সীর সামনের সোফায় বসে আছে। এছাড়া আর দুটো চেয়ারে বসে আছে দু-জন কনস্টেবল তমোঘ্ন আর উল্লাশ। ভদ্রলোক উর্বাক্ষুকে আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করছেন একটা নিরুৎসাহ চাহনিতে। সেটা উপেক্ষা করে, উর্বাক্ষু শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল চারু বক্সীকে, “এখন কেমন আছেন?”

“যেমন দেখছেন...” একটু বিরক্তি মেশান গলায় উত্তরটা দিলেন ভদ্রলোক।

উর্বাক্ষু সেটা গায়ে না-মেখে দ্বিতীয় প্রশ্নটা করল, “আর কোনও সংস্কৃত লাইন-টাইন লেখা কিছু কাগজ পেয়েছিলেন?”

“না...”

“বেশ... না-পেলেই ভালো...”

এবার মুখ খুললেন চারু বক্সী, “আমার মেয়ে আজকে নিয়ে তিনদিন ধরে মিসিং। আর আপনারা জাস্ট কিচ্ছু করতে পারছেন না...”

“আমরা কিন্তু চেষ্টা করছি...” এবারও শান্ত গলায় উত্তর দেয় উর্বাক্ষু।

“এগুলো চেষ্টা না। দায়সারা কাজকর্ম করে টাইমপাস করা। আপনারা তো ধরেই নিয়েছেন, মিসিং, খোঁজ নেই, তার মানেই মারা গেছে বা কারও

সঙ্গে ভেগেছে। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে দু-দিন তল্লাশি চালাবেন, তারপর ডেড ডিক্লিয়ার করে দেবেন আমার মেয়েকে কিংবা আমার মেয়ের ক্যারেক্টার নিয়ে দু-চারটা লেকচার মেরে কেস ক্লোজ করে দেবেন। আরে, গিয়ে ধরুন না ওই অঙ্কন ডিজে ওই লোফারগুলোকে। ওরাই কিছু করেছে নিশ্চয়ই আমার মেয়ের সঙ্গে। দু-ঘা লাগাবেন, সত্যি বেরিয়ে আসবে...” চারু বক্সীর গলার স্বরে একটা শ্লেষ ফুটে উঠেছে।

“বাব্বা, আগের দিন তো আপনিই নিজের মুখে বললেন আপনার মেয়ের ফ্রেন্ড সার্কেলের সবাই না-কি ভদ্রঘরের। আজকে ওরা লোফার হয়ে গেল? আর চারুবাবু, তদন্ত জিনিসটা বাস্তবে ওরকম অনুমানের ওপর বেস করে হয় না। আপনি হয়তো আজকাল একটু বেশি সিরিয়াল দেখছেন টিভিতে। রিয়ালিটিতে নেমে এসে ভাবুন, ভাবনাটা ক্লিয়ার হবে। আর দ্বিতীয় কথা, আপনি অঙ্কন ডিজেকে দোষারোপ করছেন; আপনাকে জানিয়ে রাখি, ডিজে আলরেডি আমাদের লকআপে আর অঙ্কন কিন্তু আপনার দিকে আঙুল তুলেছে।”

বেশ চমকে উঠলেন কথাটা শুনে চারু বক্সী, “আমার দিকে! মানে?”

“মানেটা হল এই যে, অঙ্কনের বক্তব্য আপনি শুভশ্রী দেবীর সঙ্গে আপনার মেয়েকে দেখা করতে দিতেন না, এমনকি ঝামেলাও করতেন। আর শুধু অঙ্কন না, শুভশ্রী দেবী নিজেও স্বীকার করেছেন পিয়াসীর সঙ্গে ওনার অত বেশি দেখা হতো না। এবার দু-জনের কথা কাকতালীয়ভাবে মিলে যাচ্ছে মানে, আপনি এ ব্যাপারে আমাদের মিথ্যা বলেছেন।”

উর্বাক্ষুর কথাটা শেষ হতেই, চারু বক্সী শুভশ্রীকে উদ্দেশ্য করে, একটা কাঁচা খিস্তি দিয়ে, নিজেকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করে বললেন, “আচ্ছা, এখন আমি মিথ্যা কথা বলছি? আমি মিথ্যা বললে, ঝিরির বার্থডের দিন আমার শুভশ্রীর আর ঝিরির একসঙ্গে ছবিটা কী করে এল? আমি যদি ঝিরির ওপর এতোই টর্চার করতাম ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করা নিয়ে, তাহলে শুভশ্রী এই ছবিতে এক ফ্রেমে হাসি মুখে এল কীভাবে?”

“সেখানেও আপনি একটা মিথ্যা কথা বলেছেন আমাদের। আপনি বলেছেন আপনার সঙ্গে শুভশ্রী বা ওনার হাজবেন্ডের কোনও কথাবার্তা নেই, এমনকি ওদের বাসার ভেতরেও যাননা কখনও; জাস্ট পিয়াসীকে বাইরে

থেকে ড্রপ করে দিয়ে চলে যান। অথচ, আপনার মেয়ের বার্থ-ডেতে ইনভাইট করতে আপনি ওনাদের বাসায় গেছিলেন এবং শুভশ্রী আর ওনার হাজবেন্ড অনুপমকে আপনি ইনভাইটও করেছিলেন। অনুপমবাবু আসেননি, সেটা আলাদা ব্যাপার।"

উর্বাক্ষু কথা শেষ হতেই দেখল চারু বক্সীর চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছে। রাগত চাহনিতে উনি উর্বাক্ষুকে দেখছেন। উর্বাক্ষুর কিন্তু এব্যাপারে কোনও সমস্যা হচ্ছে না। বরং ওর বেশ মজা লাগছে চারু বক্সীকে রাগতে দেখে। এবার নিজেই প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনার ওপর অ্যাটাকের ব্যাপারটা বলুন..."

রাগটা অনেক কষ্টে দমিয়ে, চারু বক্সী নিজেকে একটু থিতু করে নিলেন। তারপর ধরা গলায় বলা শুরু করলেন, "কাল রাতে ডিনার করে রিডিংরুমে ঢুকেছি। আমার কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি ছাড়াও ঘরে কেউ আছে।"

"বাইরের গেট লক থাকে না?"

"মাঝে মাঝে ভুলে যাই আটকাতে।"

"আচ্ছা বলুন..."

"তো আমার সন্দেহ হয় আর আমি সুইচবোর্ডের কাছে গিয়ে যেই লাইট জ্বালাতে যাব, অমনি কেউ একজন পেছন থেকে এসে আমার ঘাড় শক্ত করে ধরে সামনের দেওয়ালে ঠুকে দিল। আমি ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলেছিলাম। মেঝেতে বসে পড়ি। কপাল দিয়ে হালকা ব্লিডিং হচ্ছিল। লোকটা আমার সামনে বসে পড়ে, আমার জামার কলার ধরে, আমার মুখ লক্ষ্য করে ঘুষি চালায়। কিন্তু ঘুষিটা আমার নাকে না-লেগে, চোখে গিয়ে লাগে। আমি যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকি। তখন কোথা থেকে একটা বকলেস জাতীয় কিছু একটা এনে, সেটা আমার গলায় ফাঁস দিয়ে, লোকটা পেছন থেকে সেই বকলেসের স্ট্রিপটা ধরে টেনে ধরে। আমার গলায় ফাঁসটা আরো শক্ত করে আটকে যায়। আমি ওই মুহূর্তে দম নিতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণ হাত-পা এদিকে-ওদিকে হাতড়ে গেলাম। শেষে একটা সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সকালে জ্ঞান ফেরে। আমি মেঝেতে পড়ে ছিলাম। উঠে দাঁড়াতে যেতেই সারা গায়ে হাত পায়ে টনটন করে ব্যথা করে উঠল। শরীরটা টেনে টেনে আসছিল। অবশ অবশ লাগছিল। শেষে ডাক্তার দেখিয়ে

বাসায় ফিরে, থানায় কল করলাম।”

“আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?’

“না...”

একটু থেমে উর্বাক্ষু চারু বক্সীকে বলল, “দেখুন চারু বাবু, ফর গডস সেক, এরপর থেকে কিছু লুকাবেন না। তাহলে আমাদেরই তদন্তে প্রবলেম হবে। এতে আঁখেরে আপনারই লস। আজ উঠি। আপনার বাড়ির সামনে একজন কনস্টেবল আগামী কিছুদিন পাহারা থাকবে রাতে। আমি কথা বলে নেব এ ব্যাপারে।”

নেক-কলার পরা অবস্থাতেই হালকা করে মাথা নাড়ান চারু বক্সী। মৃদু হেসে উর্বাক্ষু সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায়, “আজ উঠি...কিছু হলে জানাব।”

জিপে করে ফিরতে ফিরতে উল্লাশ উর্বাক্ষুকে জিজ্ঞেস করে, “স্যার ব্যাপারটা কিছুই আঁচ করা যাচ্ছে না।”

একটু অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয় উর্বাক্ষু, “কী আঁচ করতে পারছ না?’

উল্লাশ উত্তর দেয়, “এই যে, কেসটা কোনদিকে গড়াচ্ছে... কে কালপ্রিট... এসব...”

তমোঘ্ন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার ও মুখ খুলল, “আসলে সবাই কিছু না কিছু লুকাচ্ছে, না-হলে মিথ্যা বলছে। এভাবে চললে তদন্ত করা যায় না।”

উর্বাক্ষু কথাটা শুনেও না শোনার ভান করে উত্তর দেয়, “দেখো, পিয়াসী সুইসাইড করেনি। করলে এই তিনদিনে কেউ না কেউ বডিটা পড়ে থাকতে দেখত। আর সবার প্রথমে থানায় খবরটা আসত। সেটা আসেনি। অতএব আমার মনে হচ্ছে সুইসাইড করেনি মেয়েটা। কিডনাপই হয়েছে। আচ্ছা তমোঘ্ন, শিলিগুড়ি কলেজের যে ভদ্রলোক সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টে আছেন, ওনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?”

“স্যার আমি গেছিলাম। কিন্তু উনি বলতে পারেনি কিছু।”

“এই বুদ্ধি নিয়ে কলেজে পড়ান কীভাবে এনারা?” ভেতর ভেতর বেশ বিরক্ত হয় উর্বাক্ষু। তারপর কী একটা চিন্তা করে ও বলে, “ওই লাইনটার প্রপার একটা মানে জানা গেলে, কিছুটা কানেকশন বা ক্লু পাওয়া গেলেও যেতে পারত। তবে আমি কিছুটা হলেও আঁচ করেছি কিছু ব্যাপার। কিন্তু

কনক্লুশনে পৌঁছানোর জন্য আমার একটু ফিনিশিং টাচ দরকার। আচ্ছা উল্লাশ, ড্রাইভারকে বলো আমাকে সামনের মোড়ে নামিয়ে দিতে। একটু কাজ আছে।"

"কী কাজ স্যার? আমরা কি আসব আপনার সঙ্গে? বা জিপ নামিয়ে দিক আপনাকে, কোথায় যাবেন বলেন"

"না না তার দরকার নেই। সামনের মোড়ে নামিয়ে দিলেই হবে"

সামনের মোড়ে এসে পুলিশের জিপটা দাঁড়িয়ে যায়। উর্বাক্ষু জিপ থেকে নেমে বাঁ-দিকের একটা রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে, ডানদিকের একটা গলিতে ঢুকে যায়।

৮

উর্বাক্ষুর সামনে তিনটে চেয়ার রাখা। তার মধ্যে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে আছেন শুভশ্রী আর অনুপম হাজরা। শুভশ্রী দেবীর চাহনিতে আজকে আর আগেরদিনের মতো টানটান আকর্ষণটা নেই। বরং ওনার মুখটা আজকে একটু বেশিই ফ্যাকাসে লাগছে। আরেকটা চেয়ার উর্বাক্ষুর বাঁ-দিকে কোনাকুনি করে রাখা; ওতে থমথমে মুখ করে বসে আছেন চারু বক্সী। ওনার গলায় এখনো নেক কলারটা আছে। কপালের এক কোণে ব্যান্ডেজ।

অনুপমবাবু আর শুভশ্রী দেবীর চোখে মুখেও একটা চাপা ঔৎসুক্য।

উর্বাক্ষুই প্রথম মুখ খুলল,"আসলে একটা তদন্ত করতে গেলে, সবাই যদি নিজের নিজের মতো গল্প বানিয়ে মিথ্যা বলে, তাহলে অনেকসময় কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে পড়ে। তখন না কেঁচোর খোঁজ পাওয়া যায়, আর না কেউটেকে নেগলেক্ট করা যায়। আমি প্রথমেই বলেছিলাম তদন্তে মিথ্যা তথ্য দেবেন না। অথচ আপনারা সবাই কম-বেশি মিথ্যা বলেছেন। ফলে তদন্ত কিছুই এগোয়নি।"

চারু বক্সী হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন, "হোয়াট ডু ইউ মিন? তদন্ত এগোয়নি, সেটা আপনাদের ফল্ট। এখানে আমাদের জড়ো করে আপনি এখন নিজের সেই অকর্মন্যতার ফিরিস্তি দিচ্ছেন? ইউ আর নাথিং বাট অ্যা ওয়ার্থলেস, লেজি ম্যান। আর আপনাদের ডিপার্টমেন্ট, জাস্ট ফর লোক দেখানো শো-পিস!"

উর্বাক্ষু চারু বক্সীর কথাতে বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হল না। বরং চেয়ারে আরেকটু গা এলিয়ে দিয়ে শান্ত স্বরে বলল, "হ্যাঁ অবশ্যই। আমরা এতটাই অকর্মণ্য, লেজি, ওয়ার্থলেস যে, ইতিমধ্যেই বের করে ফেলেছি পিয়াসী ওরফে ঝিরি আপনার নিজের মেয়ে না মিস্টার বক্সী।"

চারু বক্সীর রাগত চোখের চাহনি মুহূর্তে বুজে এল। এখন ওনার চোখে-মুখে অবাক বিস্ময়। চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে ভদ্রলোকের। ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অবাক চাহনিতে চারু বক্সী উর্বাক্ষুকে দেখছেন। শুভশ্রী আর অনুপম হাজরারও চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওনারা উর্বাক্ষুর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। কারও মুখেই কোনও কথা নাই। ঘর জুড়ে কিছুক্ষণের জন্য ছেয়ে গেল একটা নিস্তব্ধতা।

সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে উর্বাক্ষুই প্রথম কথা বলল, "বসুন মিস্টার বক্সী। আমি সহজ কথায় হিসাবটা একটু মিলিয়ে দেই বরং।"

চারু বক্সী আর কোনও কথা বাড়িয়ে, চুপচাপ, চেয়ার বসে পড়েন।

উর্বাক্ষু আবার বলা শুরু করে, "প্রথম থেকে পর পর বলছি। চারুবাবু আর শুভশ্রী দেবীর বিয়ের আগে, শুভশ্রী দেবী একটা সম্পর্কে ছিলেন অনুপমবাবুর সঙ্গে। প্রেমটা অনেকদিনের ছিল। সম্পর্কের জল অনেকটাই গভীরে গড়ায়। কিন্তু প্রবলেমটা বাঁধল, অনুপমবাবু তখনও চাকরি পাননি। অথচ শুভশ্রী দেবীর বাড়ি থেকে প্রেসার আসছিল বিয়ের। ছেলে দেখাও চলছিল শুভশ্রী দেবীকে না-জানিয়ে। তখনই শুভশ্রী দেবীর বাড়ি থেকে চারুবাবুর খোঁজ পায়। পাত্র ভালো, সরকারি চাকরি করে, ফ্যামিলিও ভালো। আপত্তির কোনও কারণ ছিল না। এদিকে অনুপমবাবু চাকরির চেষ্টা চালিয়েও চাকরি পাচ্ছিলেন না। ফলে একরকম বাড়ির প্রেসারেই শুভশ্রী দেবীর সঙ্গে অনুপমবাবুর সম্পর্কটা ভেঙে যায়। কিন্তু সেটা নামেমাত্রই। বিয়ের সাতদিন আগে অবধিও লুকিয়ে লুকিয়ে শুভশ্রী দেবীর সঙ্গে অনুপমবাবুর যোগাযোগ যাতায়াত সবই ছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখি, অনুপমবাবু আর শুভশ্রী দেবীর মধ্যে আগেও একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক হয়। বিয়ের সাতদিন আগেও ওনারা লুকিয়ে দেখা করেন। আর কোনও একটা চরম মুহূর্তে ওনাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হয়, কোনও প্রটেকশন ছাড়াই। বিয়ের আগের দিন রাতে শুভশ্রী দেবী জানতে পারেন উনি কনসিভ করেছেন। কিন্তু তখন অনেকটা দেরী হয়ে গেছিল। কিছু করতে গেলে অ্যাবর্সন করতে হতো।

শুভশ্রী দেবী ভীষণ ঘাবড়ে যান। কারণ ব্যাপারটা জানাজানি হলে খারাপ হবে। উনি তাই কাউকে কিছু না-বলে, চারু বক্সীকে বিয়েটা করে নেন। বিয়ের পর চারু বক্সীকে শুভশ্রী দেবী নিজেই সব বলে দেন। চারু বক্সী জানি না কেন, তখনকার মতো ব্যাপারটা নিয়ে কিছু না-বললেও মন থেকে সেটা মুছে ফেলতে পারেননি। আই মাস্ট সে, চারুবাবু, সবসময় মহান সাজা ভালো নয়। মাশুল দিতে হয় এর জন্য। বাই দ্য ওয়ে, পিয়াসীর জন্ম হয়। চারুবাবুও ব্যাপারটা সবার থেকে চেপে যান, পিয়াসীকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসতে লাগলেন। কিন্তু সমস্যা বাঁধল অন্যখানে। অনুপমবাবু বছর কয়েক বাদে ফিরে এলেন শুভশ্রী দেবীর লাইফে। ততদিনে উনি একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি জোগাড় করেছেন। অ্যাজ আই সে, শুভশ্রী দেবী কোনোদিনই অনুপমবাবুকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি, তাই অনুপমবাবুর সঙ্গে শুভশ্রী দেবীর নতুন করে অ্যাফেয়ার তৈরি হয়। কিন্তু পিয়াসী যে আসলে অনুপমবাবুর মেয়ে, সেটা শুভশ্রী দেবী লুকিয়ে গেলেন অনুপমবাবুর কাছ থেকে। এরপর চারুবাবুর পিঠপিছে শুভশ্রী দেবী আর অনুপমবাবুর অ্যাফেয়ার চলতে থাকল। এর পরের ঘটনা আমরা জানি। শুভশ্রী দেবী চারুবাবুকে ডিভোর্স দিয়ে অনুপমবাবুকে বিয়ে করেন। তখনও অনুপমবাবু জানেন না পিয়াসী আসলে ওনার নিজের মেয়ে। শুভশ্রী দেবীও কোনও একটা কারণে সেটা জানাননি। হয়তো নতুন করে ঝামেলার ভয়ে। এই জায়গাটা আমার কাছেও অস্পষ্ট। এমনকি পিয়াসী মিসিং এই খবরটা শোনার পরও কিন্তু শুভশ্রী দেবীর চোখে-মুখে আমি কোনও শোক দেখিনি। যাই হোক, এবার একটু এখনকার দিনে আসি। শুভশ্রীকে একরকম হার্ট করার জন্যই চারুবাবু পিয়াসীকে ওনার কাছে যেতে দিতেন না। যেতে চাইলেও, ঝামেলা করতেন। কিন্তু একটা সময় পর শুভশ্রী দেবী ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। আর তিনি রিভার্স সাইকোলজি অ্যাপ্লাই শুরু করেন। তিনি চারুবাবুকে ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করেন যে, পিয়াসীকে অনুপমবাবু আর শুভশ্রী দেবীর বাসায় যাতায়াত করতে না-দেওয়া হলে, শুভশ্রী দেবী পিয়াসীকে জানিয়ে দেবে ওর আসল বাবার পরিচয়। সেটা চারু বক্সীও চাইবেন না, এটাই স্বাভাবিক। তাই পরের দিকে, পিয়াসী দুই বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে। চারুবাবুর সঙ্গেও অনুপমবাবু আর শুভশ্রী দেবীর সম্পর্ক কিছুটা সহজ হয় পিয়াসীর খাতিরে। কিন্তু বাস্তবটা অন্য। একদিকে

চারুবাবু যেমন শুভশ্রী দেবী আর অনুপমবাবুকে দু-চোক্ষে সহ্য করতে পারতেন না; তেমনি শুভশ্রী দেবী আর অনুপমবাবুও চারুবাবুকে পছন্দ করতে না। সির্ফ অভিনয় চলত ভালো সম্পর্কের। এবার আসি কয়েকমাস আগের কথায়। কয়েকমাস আগে অনুপমবাবুর কোম্পানি লসে রান করা শুরু করে। আর বেশ কিছু স্টাফদের ছাটাই করে। এই সময় অনুপমবাবুর চাকরি চলে যায়। ব্যাস, কথায় আছে পয়সা না-থাকলে প্রেম জানলা দিয়ে পালায়। শুভশ্রী দেবীর ক্ষেত্রেও তাই হল। অনুপমবাবুর ওপর ওনার মন উঠে গেল। এদিকে সংসারে অভাব। শুভশ্রী দেবী সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন চারু বক্সীর কাছে। আগের বারেই শুভশ্রী দেবীর ব্ল্যাকমেইলিং চারুবাবুর মনে ছিল সম্ভবত, উনিও এবার উলটে চাল চাললেন নিজের। একসময় অনুপমবাবুর জন্য চারু বক্সীর সঙ্গে শুভশ্রী দেবীর সম্পর্ক খারাপ হয়েছিল। অতএব অনুপমবাবুকে, এতবছর পর সেটাই সুদ সমেত ফেরত দেওয়ার চান্সটা চারুবাবু মিস করতে চাইলেন না। উনি শুভশ্রীকে মেন্টাল সাপোর্ট দেওয়ার নামে ইমোশনালি উইক করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কথায় আছে মানুষ যখন ভীষণরকম ভেঙে পড়ে, তখন যে পাশে থেকে সাপোর্ট দেয়, মানুষটা ইমোশনালি তার ওপর উইক আর ডিপেন্ডেবল হয়ে পড়ে। শুভশ্রী দেবীর ক্ষেত্রেও তাই হলো। পুরোনো সম্পর্ক পরকীয়ায় বাড়ে। অনুপমবাবুকে তোয়াক্কা না-করেইচারু বক্সীর সঙ্গে শুরু হল শুভশ্রী দেবীর নতুন অ্যাফেয়ার। কিন্তু পিয়াসীর মিসিং হওয়া ঘটনাটা আচমকাই ঘটে যায়। আর আপনারা তিনজনই জড়িয়ে পড়েন ব্যাপারটায়। আর তখনই অনুপমবাবু কোনো-না-কোনোভাবে জেনে ফেলেন শুভশ্রী দেবীর সঙ্গে চারু বক্সীর এই অ্যাফেয়ারের কথাটা। আর এটাও জেনে যান পিয়াসী আসলে ওনার নিজের মেয়ে। তাই হয়তো সেদিন রাতের বেলা, লুকিয়ে চারু বক্সীর বাসায় ঢুকে ওনাকে অ্যাটাক করেছিলেন, তাই না অনুপম বাবু?"

উর্বাঙ্কুর চোখ চকচক করছে একটা চাপা উত্তেজনায়। অনুপম হাজরা হঠাৎ করে উর্বাঙ্কুর মুখে নিজের নাম শুনে নড়েচড়ে বসেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে চিবানো স্বরে শাসিয়ে শাসিয়ে বলেন, "শালা, রস বেড়েছে তাইনা? বিলা করে দিতাম সেদিন মালটাকে মেরে। নেহাৎ..."

কথাটা বলতে বলতে চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছে অনুপম হাজরার। কড়া নজরে উনি চারু বক্সীর দিকে তাকিয়ে আছেন। চারু বক্সীও চেয়ারে কিছুটা

থতমত হয়ে চুপচাপ বসে অনুপম হাজরাকে দেখছেন। মাঝখানে শুভশ্রী মাথা নীচু করে অপ্রস্তুতভাবে বসে আছেন চেয়ারে। কেউ কোনও কথা বলছে না আর।

উর্বাক্ষু এবার শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় বলল, "শুভশ্রী দেবী, আই মাস্ট সে, আপনি প্রো লেভেলের গোল্ডডিগার। প্রথমে অনুপমবাবুর জন্য চারুবাবুকে ঠকালেন; চারুবাবু, যেই মানুষটা এটাও অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছিলেন যে আপনার পেটের বাচ্চাটা অন্যের। আর শেষে গিয়ে অনুপমবাবুকেও ঠকালেন?"

শুভশ্রী কোনও উত্তর দিলেন না; মাথা নীচু করে উর্বাক্ষুর কথাগুলো চুপচাপ শুনছেন শুধু।

উর্বাক্ষু সেদিকে নজর না-দিয়ে নিজের কথায় ইতি টানল, আমি জানি না পিয়াসী এখন কোথায়? কিংবা কে জড়িত ওর মিসিংয়ের সঙ্গে। চারুবাবুর বাড়ির গেটে আটকানো কাগজে লেখা সংস্কৃত লাইনটার মানেও উদ্ধার হয়নি। ওটা উদ্ধার হলে হয়তো কিছুটা এগোনো যাবে। আমার মনে হয়না পিয়াসী সুইসাইড করেছে। সেটা করলে বডি পাওয়া যেত এতদিনে। আমার লজিক বলছে এটা কিডন্যাপ কেস। আপনারা এতদিন আমার থেকে এতকিছু না-লুকিয়ে মিথ্যা না-বলে, সত্যিটা বলে দিলেই প্রবলেম মিটে যেত। আপনাদের কনটিনিউয়াস মিথ্যা বলার জন্য আমার প্রাথমিক সন্দেহ আপনাদের ওপর হয়। কিন্তু এখন আপনারাও বুঝতে পারছেন সেটা টাইম ওয়েস্ট হয়েছে। দেখুন আপনাদের তিনজনকেই বলছি, আমি পিয়াসীকে খোজার চেষ্টা করব। কিন্তু সেটা কীভাবে আমি এখনও বলতে পারছি না। আমরা আমাদের মতো করে চেষ্টা করব। আর এটা ছাড়া উপায়ও নেই কোনও।"

হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। ফোন ওঠায় উর্বাক্ষু, "হ্যালো, সাব ইন্সপেক্টর উর্বাক্ষু রায় স্পিকিং..."

ওপাশ থেকে কনস্টেবল আশুতোষের গলা, "স্যার, এখানে ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিংয়ের পাশের গলিতে একটা বডি পাওয়া গেছে।"

"তোমরা যে-কয়জন আছ, ওখানে জায়গাটা কভার করো, আমি আসছি উইদ ইন টেন মিনিট..."

টেলিফোন রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় উর্বাক্ষু। চারু বক্সী কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করেন, "কোনো খবর স্যার ঝিরির?"

উর্বাক্ষু বেরিয়ে যেতে যেতে গম্ভীর গলায় বলে, "বুঝতে পারছি না। একটা বডি পাওয়া গেছে ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিংটার পাশের গলিতে। আমি যাচ্ছি এখন স্পটে। কিছু খবর হলে জানাব।"

(৯)

ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিংয়ের পাশ ঘেষে একটা সরু মতো পাকা গলি চলে গেছে। শিলিগুড়ির এই এলাকাটা বেশ ছিমছাম। সন্ধের সময় স্ট্রিটলাইট জ্বললেও, স্ট্রিটলাইটগুলো কিছুটা দূরত্ব মেপে দাঁড় করানো। আর তাতেই বেশ একটা আলো-আঁধারি পরিবেশ তৈরি হয়েছে সমস্ত রাস্তা জুড়ে।

লাশটা গলির রাস্তাটায় আটকে পড়ে আছে। আশপাশে কোনও ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই। দু-পাশে পর পর কয়েকটা বাড়িঘর আছে। বড়োকোনও ঝামেলা হলে ওরাও নিশ্চয়ই টের পেত। উর্বাক্ষু যখন পৌঁছাল স্পটে, তখন প্রায় রাত সাড়ে আটটা। আশপাশের লোকজন ভিড় করেছে। পুলিশের কয়েকজন যদিও আগে থেকেই জায়গাটা ঘিরে দিয়েছে, যাতে বাইরের কেউ ফটাফট ঢুকে যেতে না-পারে।

জিপ থেকে নেমে, উর্বাক্ষু ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। যে-বডিটা রাখা সেটা একজন পুরুষ মানুষের। খালি গা, পরনে নীল-সাদা চেক লুঙ্গি। লাশটা দেখে বয়স আন্দাজ করা কঠিন। লোকটার দুটো হাত বুকের কাছে জাপটে একটা মূর্তি ধরে আছে। চোয়ালটা কিছুটা উঁচু করানো, আর মুখটা হাঁ করা। চোখ দুটো আধবোজা। মাথায় সামান্য এলোমেলো চুল। লোকটা চোখে মুখে কোনো যন্ত্রণার ছাপ নেই। এমনকি শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন অবধি নেই। একঝলক দেখলে মনে হয় কেউ যেন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে।

উর্বাক্ষু সামনের একজন কনস্টেবলকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, "লাশটা এখানে পড়ে থাকতে প্রথম কে দেখে?"

কনস্টেবল বিকাশ চাপা স্বরে যতোটা সম্ভব বিনয় এনে উত্তর দিল, "স্যার, সামনের ওই বেগুনি কালারের বাড়িটা দেখছেন না? ওনারা প্রথম

দেখেন। সন্ধেবেলা ভদ্রলোক ইভিনিং ওয়াক করতে বের হন। বেরোনোর সময় চোখে পড়ে। আমরা শালুগাড়া থেকে ফিরে, তখন মিত্র নার্সিংহোমের ওখানে একটা চায়ের দোকানে জিপ দাঁড় করিয়ে চা খাচ্ছিলাম। ভদ্রলোক এসে খবর দিলেন। আমরা গেলাম। তারপর থানায় আপনাকে খবর দিলাম।"

"বুঝলাম... লোকটার আইডেনটিটি জানা গেছে? এই এলাকার কেউ চিনতে টিনতে পেরেছে?"

"না স্যার, এখনো কিছু জানা যায়নি।"

উর্বাক্ষু বিকাশের কথাটা শুনে ঘাড় নাড়াতে নাড়াতে বিড়বিড় করে নিজে নিজেই বলে চলে, "বডিতে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। তাহলে মরল কীভাবে? পয়জনিং? বা অন্যকিছু শারীরিক সমস্যা? সেটা পরীক্ষাসাপেক্ষ যদিও।"

তারপর বিকাশের দিকে তাকিয়ে অর্ডার দেয়, "বডিটাকে পোস্টমর্টেমে পাঠাও। আর এটা কী?"

উর্বাক্ষুর চোখ লোকটার বুকের কাছে দু-হাতে জড়িয়ে রাখা মূর্তিটার দিকে। মূর্তিটা ভালো করে দেখতে দেখতে বলল, "এটাকে বের করো তো। কীসের মূর্তি এটা?"

বিকাশ একটু টেনে-হিঁচড়ে লোকটার বুকের সামনে দু-হাতের বেষ্টনি থেকে বের করে আনল মূর্তিটা।

চেনা কোনও দেবদেবীর মূর্তি না। বেশ অদ্ভুত দেখতে ওটা। বরং একঝলক মূর্তিটা দেখলে বেশ ভয় হয়। দেখে মনে হচ্ছে পুরোনো কোনও মূর্তি। কত পুরোনো বোঝা যাচ্ছে না। মূর্তিটায় লাল লাল মতো কীসের একটা দাগ লাগা। এখন সেই দাগটা শুকিয়ে গিয়ে, মূর্তির গায়ে লেপ্টে আছে।

মূর্তিটা হাতে নিয়ে ভালো করে সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে উর্বাক্ষু। পাথরের না-কি পোড়ামাটির মূর্তি বোঝা যাচ্ছে না। পুরুষ মূর্তি। অ্যাটায়ারটাও ভীষণ অদ্ভুত; মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে একটা পদ্মের ওপর। মূর্তিটা-সহ পদ্মটাকে বহন করছে সাতটা শুয়োর। পদ্মের ওপর একটা মৃত মানুষ শুয়ে আছে। মূর্তিটার বাঁ-পা ওই মানুষটার বুকের ওপর

রাখা। আর ডান পা ভাঁজ হয়ে বাঁ-পায়ের থাইয়ে এসে স্পর্শ করেছে। একঝলক দেখলে এটাকে নাচের কোনও মুদ্রা বলেই মনে হয়। আপাদমস্তক নীল রঙের এই মূর্তিটার তিনটা মাথা। তারমধ্যে মাঝের মাথাটা একটা ষাঁড়ের। চোখ দুটো বিস্ফারিত, বীভৎস দেখতে। আর ঠিক কপালের মাঝ বরাবর তৃতীয় আরেকটা চোখ অর্ধবোজা অবস্থায় আছে। বিশাল বড়ো একটা হা-মুখ; তার মধ্যে থেকে সরু মতো একটা লকলকে জিভ বেরিয়ে এসেছে। মাথার ওপর হাড়ের মুকুট; আর সেই মুকুটের ওপর এক সারিতে পরপর পাঁচটা মাথার খুলি বসানো আছে। গলায় একটা সর্পমালা আর একটা মরার খুলির মালা। দু-হাতে দুটো মরার মাথার খুলি উলটো করে ধরা।

এর বাইরে কিছু বুঝে উঠতে পারল না উর্বাক্ষু।

বিকাশকে ডেকে উর্বাক্ষু বলল, "শোনো এই মূর্তিটা আমি একটু নিয়ে যাচ্ছি। একজন স্পেশালিস্টকে দেখাতে হবে এটা, যে এই স্কাল্পচারের ব্যাপারে স্টাডি করেছে, এমন কাউকে। তার আগে এটার থেকে যা যা ফিঙ্গার প্রিন্ট কালেক্ট করার করে নাও।"

কথা শেষ করে উর্বাক্ষু জিপে গিয়ে বসে।

১০

"স্ট্রেঞ্জ!", মূর্তিটা অনেকক্ষণ ধরে নেড়েচেড়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর শুধু একটা কথাই অনিরুদ্ধর মুখ ফুটে বেরোল।

"স্ট্রেঞ্জ কেন? কীসের মূর্তি এটা?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে উর্বাক্ষু।

"আগে বল, এটা পেলি কোথায়?"

উর্বাক্ষু অনিরুদ্ধকে ডিটেইলসে সমস্তটা বোঝাল। উর্বাক্ষুর কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনল অনিরুদ্ধ। উর্বাক্ষুর কথা শেষ হওয়ার পর অনিরুদ্ধ বিশেষ কিছুই বলল না। ওর মুখটা কেমন একটা থমথমে মতো হয়ে গেছে। শুধু নীচু গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলো, "হুম..."

অনিরুদ্ধকে হঠাৎ করে চিন্তিত দেখে উর্বাক্ষু প্রশ্ন করে, "হুম কী? কিছু তো বল..."

"কী বলব বুঝতে পারছি না।"



"মানে?"

"বৌদ্ধতন্ত্র আর বৌদ্ধতন্ত্রের দেবদেবীর ব্যাপারে তোর কতটা আইডিয়া আছে জানি না। আই থিংক আইডিয়া নেই। থাকলে জিজ্ঞেস করতি না এই প্রশ্ন।"

"হ্যাঁ, সিরিয়াসলিই আমার কোনও আইডিয়া নেই।"

"হুম..." সামনের টেবিল থেকে মূর্তিটা তুলে নিয়ে, ওটার একদম নীচের দিকে আঙুল দেখিয়ে অনিরুদ্ধ বলল, "দেখ... এটা দেখছিস? তোর এই মূর্তিটা যেটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেটার ঠিক নীচে সাতটা শুয়োর। এটা বৌদ্ধতন্ত্রের দেবী মারিচি-র আইকনোগ্রাফির মধ্যে পরে।"

"কে মারিচি?"

"মারিচি হল, হিন্দুদের যেমন সূর্য, তেমনি বৌদ্ধতন্ত্রে সূর্যের কাউন্টারপার্ট দেবী হচ্ছেন মারিচি। মারিচির মূর্তিতে সাধারণত মূর্তির নীচে এরকম সাতটা শুয়োর থাকে। এটার মানে, মারিচির রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে সাত সাতটা শুয়োর।"

"আচ্ছা, তার মানে এটা ওই মারিচি দেবীর মূর্তি?"

"নো স্যার... এখানেই তো সমস্যা। এই মূর্তিটাকে যদি মারিচির মূর্তি ধরে নেই, সেখানে সমস্যা হলো, তুই দেখতে পাচ্ছিস, মূর্তিটা নাচের মুদ্রায় একটা ডেডবডির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তিনটা মাথা, মাথার ওপর পাঁচটা মরার মাথার খুলি, গলায় নরমুণ্ডের মলা। এটা আবার মারিচির মূর্তিতে দেখা যায় না। এগুলোর সঙ্গে আরেক বৌদ্ধতন্ত্রের দেবতা হেরুকের বৈশিষ্ট্য মিলে যায়। নৈরাত্ম বলে যে তন্ত্রের দেবী আছে, তার মূর্তিতেও অবশ্য এই ডেডবডির ওপর নাচের মুদ্রা ব্যাপারটা দেখা যায়। যদিও একটা সাধনমালায় হেরুকের এই ডেডবডির বুকে পা রেখে নৃত্যরত ব্যাপারটা দেখা যায় না; সেখানে বলা আছে হেরুকের বাঁ-পা একটা পদ্মের ওপর রাখা, আর ডান পা নাচের মুদ্রার মতো ভাজ হয়ে, বাঁ-পায়ের থাইয়ের ওখানটা স্পর্শ করেছে। এই নাচের মুদ্রার সঙ্গেও তোর এই মূর্তিটার নাচের ভঙ্গিমা মিলে যাচ্ছে। এই মুদ্রাটার নাম 'অর্ধপয়ংক'। হেরুক তন্ত্রতে এই হেরুকের উল্লেখ আছে। সাধারণত হেরুকের একটা মাথা হয়। কিন্তু সাধনমালা ২৪৩-এ হেরুকের তিনটা মাথার উল্লেখ আছে, যেটার সঙ্গে তোর মূর্তি ম্যাচ করছে।

হেরুকের দুটো হাত; বাঁ-হাতে বজ্র আর ডান হাতে একটা লাঠি মতো জিনিস, যার আগায় একটা মড়ার খুলি। তোর এই মূর্তিটায় দুটো হাতেই দুটো মরার খুলি উলটো করে ধরা। এখানে সেটা ম্যাচ করছে না। এমনকি হেরুকের মাথার ওপর পাঁচটা নরমুণ্ড ছাড়াও ধ্যানী বুদ্ধ দেখা যায়, আর হেরুকের সারা শরীরে হারের অলংকার সেটা এখানে দেখছি না। তাছাড়া, হেরুকের গলায় এরকম সর্পমালা থাকে না। যদিও হেরুকের ভয়াবহ মুখাবয়ব, রক্তচক্ষু এসবের সঙ্গেও তোর মূর্তিটার অ্যাটায়ার ম্যাচ করছে; কিন্তু, তবুও... কিছু কিছু আবার বললাম যে হেরুকের মূর্তির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না।"

"যেমন?", সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করে উর্বাক্ষু।

"যেমন, ভালো করে দেখ, তোর এই মূর্তিটার তিনটা মাথার মধ্যে মাঝের মাথাটা আসলে একটা ষাঁড়ের। আর মাথায় দেখ হাড়ের মুকুট পরা।"

অনিরুদ্ধের কথামতো উর্বাক্ষু মূর্তিটাকে ভালো করে দেখার জন্য ঝুঁকে পড়ে।

অনিরুদ্ধ একটা পেনের পেছন দিক দিয়ে পয়েন্ট করে করে উর্বাক্ষুকে বোঝাচ্ছিল। ও বলে চলল, "তো এই ষাঁড়ের মাথা আর হাড়ের মুকুট কিন্তু আরেক বৌদ্ধতন্ত্রের দেবতা যমান্তকের চিহ্ন।"

"যমান্তক? সে কে?"

"যমান্তক হল বৌদ্ধদের একজন দেবী মঞ্জুশ্রীর একটা রূপ। 'গেলুক স্কুল অফ টিবেটান বুদ্ধিজ়ম'-এ, ওরা চক্রসম্বর ও গুহ্যসমাজের পাশাপাশি যমান্তকের ধ্যানও করে। যমান্তক বল, কিংবা মেঘসম্বর, বজ্রভৈরব— সবাই এক। মৃত্যুর দেবতা যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন বলে এরকম নাম। তবে মঞ্জুশ্রীর মাথাটা ষাঁড়ের কেন হল, এটা নিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং গল্প আছে। শুনবি? আউট অফ দ্য টপিক যদিও..."

"বল শুনি..."

"প্রচলিত মিথে বলা আছে, একবার একজন সন্নাসী একটা গুহায় একমনে ধ্যান করছিল; হঠাৎ সেই গুহায় দু-জন ডাকাত একটা ষাঁড় চুরি করে নিয়ে এসে ঘাটি পাতে; আর সেই ষাঁড়টাকে ওরা ওই গুহার মধ্যেই

বলি দেয়। সেটার একমাত্র সাক্ষী হয়ে থাকল ওই সন্নাসী। যেহেতু সে ছিল ওই ঘটনার একমাত্র সাক্ষী, তাই ওই ডাকাত দুটো, প্রমাণ লোপাটের জন্য ওই সন্নাসীকেও গলা কেটে মেরে ফেলে। ওরা মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়, কিন্তু সে গুড়ে বালি। হঠাৎ ওরা দেখে ওই সন্নাসী গলা-কাটা শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে; আর, সামনে পড়ে থাকা ষাঁড়ের মাথাটা কুড়িয়ে নিয়ে নিজের মাথার জায়গায় বসিয়ে নিয়েছে। তারপর ওই সন্নাসী ডাকাতগুলোকে গুহার মধ্যেই মেরে ওদের রক্তপান করে। আর সেটা করামাত্রই ওঁর মধ্যে একটা অদ্ভুত খিদার জন্ম হয়। সন্নাসীর তখন ইচ্ছা হয়, লোকালয়ের সমস্ত মানুষের রক্তপান করবে সে। বৌদ্ধদেবী মঞ্জুশ্রী তখন, যমান্তকের রূপ ধারণ করে ওই সন্নাসীর সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। এই হল পুরো মিথটা।"

"ন্টারেস্টিং স্টোরি..."

"হ্যাঁ... এবার দেখ, তোর এই মূর্তিটার মধ্যে যমান্তকের এই তিনটা বৈশিষ্ট্য থাকলেও, বেশ কিছু গরমিলও আছে।"

"যেমন...?"

"যেমন, যমান্তকের মূর্তিতে সাধারণত দেখা যায় যমান্তক ষাঁড়ের ওপর অধিষ্ঠিত। কিন্তু তোর এই মূর্তিতে কোনও ষাঁড় নেই; বরং একটা ডেডবডির ওপর নৃত্যরত এই মূর্তি। যমান্তকের বজ্রবেতালীরূপে আমরা যেরকম বিবরণ পাই ওনার, তাতে দেখি, তার দুটো হাত, মাথায় হাড়ের মুকুট, কপালে তৃতীয় একটা চোখ আছে। এসবই তোর মূর্তির সঙ্গে মিলে গেলেও, যমান্তকের সাধারণত হয় একটা ষাঁড়ের মাথা হয়, নতুবা নয়টা মাথা হয়। কিন্তু এখানে তিনটা মাথা। ফারাকটা বুঝতে পারছিস?"

মূর্তিটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে মাথা নাড়ায় উর্বাক্ষু। তারপর চিন্তিতভাবে বলে, "তাহলে?"

"দাঁড়া, আরো ব্যাপার আছে..."

"আবার কী?"

"তোর এই মূর্তির মাথায় হাড়ের মুকুট, কপালে তৃতীয় একটা চোখ, আর গলায় সাপের মালা, আর গায়ের রং গাঢ় নীল, এসবের সঙ্গে আরেকজন বৌদ্ধ দেবতার মিল পাওয়া যাচ্ছে। তার নাম বজ্রপানী। মামাকির ছেলে।"

"বজ্রপানী? নামের মধ্যে বজ্র আছে শুনে কেন জানি মনে হচ্ছে

আমাদের ইন্দ্রের সঙ্গে ম্যাচ আছে ওনার কিছু একটা।”

“উনি বেসিক্যালি বৌদ্ধদের দেবতা। বজ্রপানী কথার অর্থ হল ‘হোল্ডার অফ থান্ডারবোল্ট’। উনি হলেন বৃষ্টির দেবতা। কোনও মরসুমে বৃষ্টি কম হলে ওনাকে স্মরণ করার রীতি আছে। মিথ বলছে, যখন নাগরাজ বুদ্ধদেবের কাছে দীক্ষা নিতে আসেন, তখন বজ্রপানীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল গরুড়দের হাত থেকে নাগরাজকে রক্ষা করার জন্য। বজ্রপানীর গলায় সর্পমালা ব্যাপারটা এখান থেকেও আসতে পারে। অনেক বুদ্ধমূর্তিতে, বুদ্ধদেবের পাশে মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বরের সঙ্গে বজ্রপানীর মূর্তিও দেখা যায়। ও, বাই দ্য ওয়ে, বলা হয়নি তোকে। বজ্রপানীও কিন্তু পদ্মের ওপর অধিষ্ঠিত। আর কোনও একটা মতে, এই বজ্রপানীরও তিনটে মাথা আছে। কিন্তু বজ্রপানীর মূর্তিতে ওনার হাতে বজ্র দেখতে পাওয়া যাবে; তোর এই মূর্তিতে সেটা নেই। আবার বজ্রপানীর মূর্তি নৃত্যরত ভঙ্গিতে থাকবে না। সেটা হবে যোদ্ধার ভঙ্গিমায়। কিন্তু এই মূর্তিটা নাচের মুদ্রায় পদ্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অতএব...”

“অতএব, একটা মূর্তির মধ্যে চার-চারটে দেব-দেবীর আইকনোগ্রাফির ছাপ রয়েছে?”

“ইয়েস স্যার!”

“বুঝলাম। কিন্তু দেখ, মূর্তিটার গায়ে শুকনো লাল লাল কী একটা লেপটানো আছে। পূজা-টুজা হতো মনে হয় এই মূর্তিটার। সেক্ষেত্রে কোনও দেবতার মূর্তি না-হলে, পূজা হবে কেন?”

“সেটা আমিও বুঝতে পারলাম না। তবে এই মূর্তি এখনকার না। মূর্তিটার সঙ্গে কোনও লিপি খোদাই করা থাকলে আরো ডিটেইলসে বলা যেত। কিন্তু, এই মূর্তির স্ট্রাকচার, স্টেলার গঠন এসব দেখে আমার মনে হয়, এই মূর্তি পাল অথবা সেন যুগের। আনুমানিক নবম কিংবা দশম শতাব্দীর আশপাশের। তন্ত্রের দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি, যেমন— তারা, প্রজ্ঞাপারমিতা এসব মূর্তি নির্মাণ কিন্তু পাল কিংবা সেন যুগে শুরু হয়। তন্ত্রের রমরমা ব্যাপারটাও এই সময়ে ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। ওই সময়ের মূর্তি এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে কীসের মূর্তি এটা সেটা বোঝা যাচ্ছে না।”

আচ্ছা ঝামেলা হল। উর্বাক্ষু মুখে কিছু বলল না বটে; কিন্তু ভেতর

ভেতর বেশ বিরক্ত হচ্ছিল। কাজের কাজ কিছুই হল না। অনিরুদ্ধ ওকে চা-স্ন্যাকস অফার করেছিল। উর্বাক্ষু কিছুই খেল না; বরং অজুহাত দিয়ে মূর্তিটা নিয়ে বেরিয়ে এল অনিরুদ্ধের বাসা থেকে।

১১

উর্বাক্ষু চুপচাপ বসে আছে। গতকাল যে ডেডবডিটা পাওয়া গেছিল, ওটার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসেছে। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না সেটা উর্বাক্ষু নিজেই দেখেছিল কাল। সন্দেহ করেছিল হয়তো পয়জেনিং বা স্ট্রোক জাতীয় কিছু। কিন্তু পোস্টমর্টেম রিপোর্ট উর্বাক্ষুকে আরো একবার অবাক করল। লোকটার শরীরের ওপরে কোনও ক্ষত না-পাওয়া গেলেও, শরীরের ভেতরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দগদগে পোড়া। একটা মানুষের বাইরের শরীরে আগুনে পোড়ার লেশমাত্র কোনও চিহ্ন নেই। অথচ ভেতরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুড়ে ছাড়খাড় হয়ে গেছে— এটা কীভাবে সম্ভব? পোস্টমর্টেম রিপোর্টও কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। তবে ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুড়েই লোকটার মৃত্যু হয়েছে এ-ব্যাপারে সন্দেহ থাকে না। আর লোকটা ওভাবে দু-হাত দিয়ে মূর্তিটাকে জাপটে ধরেছিল কেন?— সন্দেহ হয় উর্বাক্ষুর। তাহলে কি লোকটার মারা যাওয়ার সঙ্গে মূর্তিটা কোনোভাবে জড়িত?— মনের ভেতর সম্ভাবনা তৈরি করার চেষ্টা করে ও। মাটির তলা থেকে অনেক সময় এরকম অনেক মূর্তি-টূর্তি পাওয়া যায়; সেগুলো বাইরের চোরা মার্কেটে চরা দামে বিক্রি হয়। এসব চোরাই মূর্তি বিক্রির দালাল থাকে। ওদের বিশাল এক একটা চেইন। নীচ থেকে ওপরমহল অবধি লেনদেন চলে ভেতর ভেতর। সেসব নিয়েই হয়তো দুটো দলের মধ্যে লাফড়া। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তো কিছু না কিছু একটা চিহ্ন পাওয়া যাবে। কিচ্ছু না... জাস্ট কিচ্ছু না! বাইরে থেকে বডিটা এক্কেরে সাফসুতরা। দেখে মনে হয় কেউ রাস্তার ওপর শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। কিন্তু ভেতরটা ওভাবে পুড়ে গেল কীভাবে? আগুন লাগলে তো গোটা শড়ীরেই লাগার কথা... গোটা শরীরই পুড়বে— ভেতর-বাইরে সব... কিন্তু বাইরে পোড়ার লেশমাত্র নেই, কোনও পোড়া দাগ নেই। অথচ ভেতরটা...

একে পিয়াসীর মিসিং কেসটার কোনও সুরাহা হয়নি। চারু বক্সী দু-

বেলা করে কল করে তাগাদা দিচ্ছে। তার ওপর এই এক নতুন কেস। ভেতর ভেতর ভীষণ বিরক্ত লাগছিল উর্বাক্ষুর। মেজাজ এমনিতেই খিঁচে আছে। তার ওপর মাথাটাও ধরেছে সকাল থেকে। মাইগ্রেনের প্রবলেম। আধকপালি ব্যথা যখন হয়, সেটা খুবই কষ্টকর। একবার ভেবেছিল চা দিতে যে ছেলেটা আসে, ওকে দিয়ে দোকান থেকে একটা গ্রেনিল জাতীয় কোনও ট্যাবলেট আনিয়ে নেবে। কিন্তু সেই ছেলেটাও আজকে আসেনি। উর্বাক্ষুর আরো বেশি বিরক্ত লাগছে কারণ, থানায় ঘাঁটি গেড়েছে এক তান্ত্রিক গোছের লোক। ঘাঁটি গেড়েছে কথাটা ঠিক না। লোকটা থানায় কী একটা কাজে এসেছিল। কনস্টেবল রামলাল পুরোনো লোক। সামনের বছর রিটায়ার করবে। ধম্মকম্ম ব্যাপারটায় ভদ্রলোকের অগাধ আস্থা। সাধু গোছের লোক দেখেছে, অমনি পাকরাও করেছে; লোকটাকে চেয়ারে বসিয়ে, রীতিমতো খাতিরদারি চলছে। উর্বাক্ষুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ' মনে হয়। কিন্তু ওর মতামত শোনার এখানে কেউ নেই। সেই তান্ত্রিক সাধু গোছের লোকটাকে ঘিরে থানার বাদবাকি সবাই হাত দেখাচ্ছে। আর সাধুটাও মহাআনন্দে হাত দেখে দেখে ওদের ভূত-ভবিষ্যৎ বাতলে দিচ্ছে। লোকটা এক-একটা কথা বলছে হাত দেখে, আর আশপাশের সবাই ঘাড় জোরে জোরে নাড়িয়ে কথায় কথা মেলাচ্ছে ওর। যত্তোসব বুজরুকি!

উর্বাক্ষু সন্দেহ করছে, লোকটা যাওয়ার আগে নিশ্চয়ই মোটা টাকা কিছু ডিমান্ড করবে। এই টাইপের লোকগুলো এরকমই হয়। প্রথমে হাত বা কপাল দেখে চমকে দেওয়ার মতো কিছু কথা বলবে; যেমন, "আপনার গত বছর একটা ফাঁড়া গেছে; সামনের বছরটা ভালো যাবে না; সাবধানে থাকবেন। প্রিয়জনের শরীর সাস্থ্য খারাপ যাবে..."— এই কথাগুলো খুব কমন কথা। শতকরা প্রায় নব্বই শতাংশ লোকের ক্ষেত্রেই খাটে। তাই আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে দিলে, লেগে যাওয়ার চান্সটাই বেশি। তারপর ওঠার আগে আগে ঠাকুর-দেবতার নাম করে মোটা অঙ্ক ডিমান্ড করবে। ভগবানের নামে চায় বলে, মানুষ বিনা বাক্য ব্যয়ে দিয়েও দেয় টাকা।

উর্বাক্ষুর এসব হাত দেখা-ট্যাখায় বিশ্বাস নেই। তার ওপর মাথা ধরেছে। ও এককোণে নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে, টেবিলের এক সাইড দিয়ে পা দুটো তুলে দিয়ে আধা শোয়া অবস্থায়, লোকটার ভণ্ডামি দেখছে।

লোকটা রামলালের হাত দেখে আরেকটা কী কথা বলতে যাচ্ছিল,

এবার আর না-থাকতে পেরে উর্বাক্ষু লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "নিজের হাতটা দেখে একবার বলতে পারবেন, আপনি ঠিক আর কতক্ষণ পর এখান থেকে বিদায় হবেন? আফটার অল এটা থানা। আপনার বুজরুকির ঠেক না!"

উর্বাক্ষুর কথায় সাধু গোছের লোকটা যতটা না ক্ষুণ্ণ হল, তারচেয়ে ঢের বেশি বিরক্ত হল রামলাল। ও তীক্ষ্ণ বিরক্তি মেশানো চাহনিতে উর্বাক্ষুর দিকে তাকাচ্ছিল। উর্বাক্ষুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। লোকটা শান্ত দৃষ্টি উর্বাক্ষুকে একবার আপাদমস্তক দেখল; তারপর খুব স্বাভাবিক একটা হাসি হাসল। এরকম হাসি সাধারণত খুব চেনা মানুষ অনেকদিন পর চেনা কারও সঙ্গে হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেলে হাসে। লোকটার চোখের চাহনি দেখে মনে হচ্ছে উর্বাক্ষু ওর বহুদিনের চেনা কেউ। লোকটা রামলালের সামনের চেয়ারটা থেকে উঠে উর্বাক্ষুর দিকে এগিয়ে এল। সাধুটার পাকা দাড়ি-গোফ প্রায় বুক অবধি নেমে এসেছে। মাথায় একটা পাগড়ি জাতীয় জিনিস পরা। সঙ্গে কাঁধে ঝোলানো একটা ঝোলা। বুকে কাঁচাপাকা লোম। দেহে মেদের লেশমাত্র নেই। একঝলক দেখে বয়স আন্দাজ করা যায় না। উর্বাক্ষু এবার একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। লোকটা যদি এখন উর্বাক্ষুকে জ্ঞানগম্যির কথা শোনানো শুরু করে, তাহলে সেটা খুবই বিরক্তিকর হবে। এমনিতেই টনটন করে মাথার এক সাইড দিয়ে ব্যথা; তার ওপর মাথায় দু-দুটো কেস ঘুরছে। লোকটার জ্ঞান শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই উর্বাক্ষু। ও ভাবছিল, দিব্যি রামলালের ওখানে বসেছিল লোকটা; খোঁচাটা না-মারলেই বরং ভালো হতো।

লোকটা উর্বাক্ষুর সামনে এসে সটান সামনের চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল। উর্বাক্ষু লোকটার এরকম ব্যবহারে একটু অবাক হল। অবাকের থেকেও বেশি অসন্তুষ্ট হল। লোকটার সামান্য ভদ্রতাটুকু জানা নাই? বসার আগে একটা পারমিশন নিতে হয়, এটা কি শিখিয়ে দিতে হবে এই বয়সে? উর্বাক্ষু টেবিলের সামনে থেকে পা নামিয়ে নিল। সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। লোকটা উর্বাক্ষুকে শান্ত চাহনিতে আপাদমস্তক দেখছে। মুখে ঠিক আগের মতোই সেই হাসিটা লেগে আছে। উর্বাক্ষুর সারা মুখে-চোখে বিরক্তি। ইচ্ছে করছিল চেয়ার থেকে উঠে লোকটাকে সটান ঘাড় ধাক্কা দিয়ে থানা থেকে বের করে দেয়।

লোকটা শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, "আপনি এসবে বিশ্বাস করেন না বোধহয়। সে নাই করতে পারেন। বিশ্ব সংসারে সবাই সবকিছু বিশ্বাস করলে, সংসার চলবে কীভাবে? মতানৈক্য নতুন মত তৈরি করে। নতুন মতামত নিয়ে নতুন মানুষের সৃষ্টি হয়। তাইতো এত বৈচিত্র। না-হলে সবকিছুই একরকম হলে সৃষ্টি চলত কীভাবে?"

লোকটার কথা শুনে এবার বেশ অবাক হল উর্বাক্ষু। কী মার্জিত বাচনভঙ্গি লোকটার! এই টাইপের লোকগুলোর এত মিষ্টি মার্জিত কথাবার্তা হয় না। কী বলবে বুঝতে পারছিল না উর্বাক্ষু। ভেতর ভেতর ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল ওর। আমতা আমতা স্বরে উত্তর দিলো, "না, মানে... ওই আর কী। বিশ্বাস করার প্রয়োজন পড়েনি কোনোদিন।"

"বিশ্বাস করানোর তো আলাদা করে কোনও ওষুধ নাই বাপ। বিশ্বাস বলতে আপনি কী বোঝেন?"

"মানে ওই, পূজা-টূজা, তাবিজ-কবজ, আচার-রীতি— আমি খুব একটা মানি-টানি না। সেদিক থেকে আমি নাস্তিক..." আমতা আমতা করে উত্তর দেয় উর্বাক্ষু।

লোকটাকে এত কৈফিয়ত ও কেন দিচ্ছে, সেটা উর্বাক্ষু নিজেও জানে না। মনে হচ্ছে, নিজে থেকে না, বরং, কেউও যেন ওকে মন্ত্রবলে সম্মোহিত করে উত্তর দেওয়াচ্ছে।

লোকটা হেসে বলে, "স্থূল পূজা মানে শুধুই আড়ম্বর বাপ। আসল হল মানস পূজা। নিজেকে বিশ্বাস করেন?"

"মানে?"

"নিজের আত্মাকে বিশ্বাস করেন?"

"হ্যাঁ, সেটা করব না কেন? প্রাণ আছে বলেই তো হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি..."

"তার মানেই আপনি আস্তিক। নিজেকে নাস্তিক বলাটা আদতে নিজেকে বুঝ দেওয়ার মতো।"

"আপনার কথা বুঝতে পারছি না ঠিক করে।"

লোকটা হেসে উঠল। অথচ সেই হাসিতে কোনও ব্যঙ্গ নাই। যেন একটা প্রশান্তি মাখা আছে। তারপর শান্ত গলায় বলে উর্বাক্ষুকে, "এই তো বাপ। এখানে এসেই সবাই বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। মহানির্বাণ তন্ত্রে বলা আছে,

"সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তুনি দৈবত / যদাত্মনি প্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পয়েৎ।" কিছু বুঝলেন না জানি। বলছে, আপনার আত্মাই আপনার ইষ্টদেবতা। দুইয়ের মধ্যে কোনও ফারাক নেই বাপ। আপনি মাংসাশী হলে আপনার ইষ্টও মাংসাশী। আপনি নিরামিষাশী হলে, আপনার ইষ্টও নিরামিষাশী। আপনার পক্ষে যেটা শ্রেয়, আপনার ইষ্টের পক্ষেও সেটাই শ্রেয়। আপনার, আমার— সবার ইষ্টই গোড়ায় এক ও অভিন্ন, একপ্রাকৃতিক। আমাদের মধ্যে যে মায়া বাস করে, তার জন্যই আমাতে-তোমাতে প্রভেদ দেখতে পান বাপ। আমাকে-আপনাকে ভিন্ন বলে মনে হয়। তন্ত্র দেহের মধ্যেকার এই ইষ্ট, এই আত্মাকে ছাড়া, বাইরের আর কাউকে ঈশ্বর বলে মনে করে না। তাই, বলছি, আপনি আত্মায় বিশ্বাসী হলে, আপনি ঈশ্বরেও বিশ্বাসী।"

উর্বাক্ষু লোকটার কথা হা-করে শুনছিল। লোকটার মধ্যে কী একটা জানি ব্যাপার আছে। হঠাৎ করে ওর কথাগুলোকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে সরিয়ে দেওয়া যায় না। এবার টনক নড়ে উর্বাক্ষুর। লোকটা সংস্কৃত জানে? এই তো, কিছুক্ষণ আগেই কী একটা শ্লোক বলল। এটাই সুযোগ। পাছে আবার লোকটা অন্য টপিকে চলে যায়, দেরি না-করে ড্রয়ার থেকে পিয়াসীদের গেটে পাওয়া চিরকুটটা লোকটার দিকে এগিয়ে দিয়ে, উর্বাক্ষু নিজেকে যতটা সম্ভব শান্ত করার চেষ্টা করে, গম্ভীর গলায় বলে, "দেখুন তো এই সংস্কৃত লাইনটার মানে আপনি জানেন না কি?"

লোকটা উর্বাক্ষুর হাত থেকে চিরকুটটা নিয়ে, কাগজটাকে চোখের সামনে নিয়ে গিয়ে, বিড়বিড় করে, লেখাটা পড়ার চেষ্টা করে। লোকটার হয়তো চোখের সমস্যা আছে।

পড়া শেষ করে কিছুক্ষণ কীসব বিড়বিড় করল নিজের মনে; হয়তো কিছু একটা চিন্তা করার চেষ্টা করছে। তারপর উর্বাক্ষুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা তো কুলার্নব তন্ত্রের লাইন। এটার মানে, "যৈরেব পতনং দ্রবৈঃ সিদ্ধিস্তৈরৈব চোদিতা..." অর্থাৎ, যা কিছু মানুষকে অধঃপাতে নিয়ে যায়, নিরোগামী করে, সেইসমস্ত কিছু অবলম্বন করেই কুলসাধক সিদ্ধিলাভ করে।"

"ঠিক বুঝলাম না। একটু ভেঙে বলুন..." চেয়ারে নড়েচড়ে বসল উর্বাক্ষু।

সাধু লোকটা বলল, "কঠোপনিষদ জানা আছে?"

"না..."'

"স্বাভাবিক। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে 'শ্রেয়' আর 'প্রেয়'র ফারাক বুঝিয়েছিলেন।। 'শ্রেয়' মানে 'সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি'; আর 'প্রেয়' মানে 'ইহলোকের বস্তুবাদী সুখ'। কুলার্নব তন্ত্র বলে— প্রেয়র মধ্য দিয়ে শ্রেয় লাভ। সাধারণ মানুষের অবশ্য এসব শুনলে ধাঁধাঁ মনে হতে পারে। তন্ত্র বলে 'ভোগো যোগায়তে'; ভোগকে এড়িয়ে না, বরং ভোগকে আস্বাদ করার মাধ্যমে ভোগ বর্জন করতে হবে। কামনা চরিতার্থ করার মধ্য দিয়ে কামনার মুক্তি। কিন্তু বাস্তবে ভস্মে ঘি ঢাললে, আগুন কি নেভানো যায় বাপ?"

"আমি অত ডিটেইলসে বুঝতে পারছি না আপনার কথা। আমাকে শুধু এটুকু বলুন, আপনার মতে এই লাইনটার সঙ্গে তন্ত্র ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে; তাই তো?"

ধীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায় লোকটা। তারপর শান্ত স্বরে বলে, "তন্ত্রের এক চরম প্রক্রিয়া 'পঞ্চ ম-কার' সাধনা জড়িত আছে।"

"পঞ্চ ম-কার! সেটা কী?"

"পঞ্চ ম-কার একরকম তন্ত্রসাধনা। পঞ্চ ম-তে আছে মদ, মাংস, মাছ, মুদ্রা বা শস্য, আর মৈথুন। তন্ত্রসারে বলা আছে, "সুরা শক্তিঃ শিবো মাংসং তদ্ভোক্তা ভৈরবঃ স্বয়ং / তয়োরৈক্যে সমুৎপন্ন মোক্ষ উচাতে / আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্ / তস্যাভিব্যঞ্জকং দ্রব্যং যোগভিস্তেন পীয়তে / পুন্যাপুন্যং পশুং হত্বা জ্ঞানখড়গেন যোগবিৎ / পরে লয়ং নয়োচ্চিত্তং পলাশীতি নিগদ্যতে/ পরশক্ত্যাত্মমিথুন সংযোগানন্দ নির্ভরাঃ / মুক্তাস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদিতরে স্ত্রীনিবেবকাঃ।।" কুলকুণ্ডলিনী শক্তিই হল শিবশক্তি। এই শিবশক্তিই হল মদ, এই শিবই হল মাংস। স্বয়ং ভৈরবই হল তার ভোক্তা। শিব আর শক্তির মিলনে যে আনন্দের জন্ম হয়, সেটা ব্রহ্ম, সেটাই মোক্ষ।"

"কিচ্ছু বুঝলাম না। শুধু এটুকু বুঝলাম ব্যাপারটার সঙ্গে তন্ত্র জড়িত আছে। আচ্ছা আপনাকে একটা ছবি দেখাচ্ছি। দেখুন ভালো করে। মেয়েটা মিসিং, আর ওর মিসিং হওয়ার পরই ওদের বাসার গেটে এই লেখাটা পাওয়া গেছিল। আপনি এরকম দেখতে কোনও মেয়েকে দেখেছেন নাকি

দেখুন।" কথাটা বলে উর্বাক্ষু পিয়াসীর একটা ছবি লোকটার দিকে এগিয়ে দেয়। ছবিটা হাতে নিয়ে লোকটা ছবিটার গায়ে বারকতক হাত বোলায়; যেন ছবির মেয়েটাকে বহুকাল থেকে চেনে। তারপর ছবিটাকে দু-হাতে ধরে, ছবিটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকায় লোকটা। উর্বাক্ষু বুঝতে পারল না লোকটা কী করতে চাইছে। তারপরই যেটা হল, সেটা সাধারণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। লোকটা পিয়াসীর ছবিটা নিয়ে খুব মনযোগ দিয়ে দেখছিলো; হঠাৎ ওর ঠোঁটটা কেঁপে উঠল। চোখের চাহনি সরলো না। উর্বাক্ষু কৌতূহল নিয়ে লোকটার কার্যকলাপ দেখছে। মুখে কিছু বলছে না। লোকটার হাতটা ছবিটা ধরা অবস্থায় বারকতক কেঁপে কেঁপে উঠল।

এবার আর উর্বাক্ষু নিজের কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, "চেনেন?"

লোকটা কোনো উত্তর দিলো না উর্বাক্ষুর কথার। তারপর উর্বাক্ষুকে অবাক করে দিয়ে বিড়বিড় বলা শুরু করলো, "একটা অন্ধকার ঘর। অনেকগুলো মোমবাতি জ্বলছে। ভৈরবী চক্র...পঞ্চ ম কার সাধনা। সামনে একটা পর্দা টাঙানো; তিব্বতি থাংকা। সেই থাংকার মধ্যে... ভগবান না... একটা শয়তানের মুখ আঁকা! ওটার সামনে একটা বেদি। কিন্তু ভৈরবী চক্রের অধিষ্ঠাত্রী আনন্দ ভৈরব আর আনন্দ ভৈরবী। সেই চক্রে বসে, পঞ্চ ম-কার সাধনায় শয়তান পূজা কীভাবে সম্ভব? মেয়েটা মেঝেতে পড়ে আছে। ছটফট করছে যন্ত্রণায়! উলঙ্গ শরীর, স্থূল স্তন, পেটের দিকটা সামান্য উঁচু, খোলা চুল মেঝেতে ছড়ানো। একটা লোক। মাঝবয়েসি, মেদহীন চেহারা, পরনে লাল ধুতি, খালি গা। লোকটা মেয়েটার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর শরীর থেকে ধুতির আবরণ খুলে ফেলল। লোকটা মেয়েটার সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হচ্ছে। মেয়েটার ইচ্ছের বিরুদ্ধে মিলন হচ্ছে। তবু মেয়েটা বাধা দিতে পারছে না। নেশা জাতীয় কিছু একটা খাওয়ানো হয়েছে ওকে। ওখানে কে? ওই দু-জন ছাড়াও আরেকজন কেউ ঘরটায় আছে। সে আমার উপস্থিতি টের পেয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে ওদের এই কার্যকলাপ আরেকজন কেউ বাইরে থেকে দেখছে। কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? পেয়েছি! পেয়েছি!" কথাগুলো বলতে বলতে চকচক করে উঠল লোকটার চোখ দুটো; কথা জিভে জড়িয়ে যাচ্ছে; হাত দুটো আগের থেকে বেশি কাঁপছে, "এটা কী? একটা ছায়া ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। গাঢ় হতে হতে

একটা আকার নিচ্ছে। একটা অবয়ব... শয়তানের! মিশমিশে জমাট কালো ধোঁয়ায় গড়া শরীর। মাথার ওপর কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ারাশি। রক্তাভ লাল দুটো চোখের চাহনিতে বহু শতাব্দীর জমানো রক্তের খিদা। ছায়াটা ক্রমশ লোকটার সামনে এগিয়ে এসে, ঝুঁকে পড়ে কী একটা আদেশ দিল লোকটাকে। লোকটা মেয়েটাকে মাটিতে ফেলে উঠে দাঁড়াল। তারপর একটা ভোজালি দিয়ে মেয়েটার শরীরটা লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি চালাল লোকটা। মেয়েটা সামান্য চিৎকার করেই থেমে গেল। কাটা জায়গাগুলো দিয়ে চাপচাপ রক্ত থিকথিক করছে। সেখান থেকে রক্ত তুলে নিয়ে, নিজের গায়ে মাখল লোকটা। সামনে ওই শয়তানের ছায়া মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে। থাংকাটার একপাশে একটা বলির বেদি। লোকটা মেয়েটার চুলের মুঠি ধরে মেঝেতে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে নিয়ে হাড়িকাঠে ওর গলাটা বসাল। মেয়েটা ছটফট করছে। লোকটা খাঁড়ার বাট দিয়ে জোরে মেয়েটার মাথার পেছনে আঘাত করল। মাথা ফেটে মেঝেতে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। মেয়েটার নড়াচড়া মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেছে। এরপর লোকটা মুখে কী একটা মন্ত্র আওড়ে, খাঁড়াটা সজোরে মেয়েটার গলা লক্ষ্য করে চালিয়ে দিল। মাথাটা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল মুহূর্তে। বলি দিয়ে লোকটা মেয়েটার কাটা মাথাটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে থাংকায় আঁকা শয়তানের মুখটার সামনে দু-হাতে তুলে ধরল; আর সঙ্গে সঙ্গে ছায়া শরীরটা ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে লোকটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল। তারপর লোকটার চোখ-কান-নাক-মুখ দিয়ে শরীরের ভেতর ঢুকে গেল কালো কালো ধোয়াগুলো। কেঁপে কেঁপে উঠল লোকটার সমস্ত শরীর। মেয়েটার কাটা মাথাটা হাতে তুলে ধরা অবস্থায় লোকটা মেঝেতে বসে পড়ল। লোকটার মধ্যে কী একটা পরিবর্তন আসছে। ধীরে... ধীরে... ওর ভেতর থেকে একটা ঘুমন্ত শয়তান যেন জেগে উঠছে ক্রমশ। লোকটা মাথা তুলে তাকাল... আমার দিকে! আমাকে দেখছে! কিন্তু কীভাবে? কীভাবে দেখতে পাচ্ছে ও আমাকে? আমাকে দেখতে পাবার কথা নয় ওদের। লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ও টের পেয়েছে আমি দেখে ফেলেছি ওদের এসব কীর্তি। এ-কী লোকটার চোখটা...! লোকটার চোখে কোনও মণি নাই। কেবল একটা রক্তের মতো টকটকে লাল আস্তরণ চোখ ভেতরটা জুড়ে। বিশাল বড়ো একটা হাঁ-মুখ করে আমার দিকে ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে আসছে লোকটা। সেই হাঁ-মুখের ভেতর থেকে

বেরিয়ে এসেছে একটা লকলকে জিভ; আর ঠোঁটের কোণা দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে কাঁচা রক্ত পড়ছে লোলের মতো। লোকটার মুখটা ক্রমশ যেন পরিবর্তন হচ্ছে। ধীরে ধীরে কেমন একটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। মুখটা পালটে গিয়ে ক্রমশ ক্যাটক্যাটে নীল রঙের হয়ে উঠছে... থাংকায় আঁকা ওই ছবিটার মতো মুখের আদল নিচ্ছে লোকটার মুখটা। ওটা কী! কে ও? আমাকে ছাড়বে না ওটা! ছাড়বে না! মেরে ফেলবে! শুকনার রাস্তা ধরে গিয়ে, শালবাড়ি হাট-টা পার করে কিছুটা এগিয়ে ডান দিকের প্রথম গলি। সাদা রঙের বাড়ি। আমাকে শেষ করে দেবে শয়তানটা! এ-কী চারপাশে এত আওয়াজ কীসের? অনেকগুলো গলার স্বর একসঙ্গে... একটা মন্ত্র পড়ছে যেন... সমস্ত ঘর থেকে আওয়াজটা ভেসে আসছে। কিন্তু ঘরে তো আর কেউ নেই! কিন্তু আওয়াজটা...! ক্রমশ বাড়ছে আওয়াজটা... উফ-ফ্ কী শব্দ! গমগম করছে চারপাশে! এটা কীসের মন্ত্র? কার মন্ত্র? চিনতে পারছি না কেন শব্দগুলোকে? উফ-ফ-ফ্ কী জ্বালা করছে দুই কানে! শব্দটা যেন ক্রমশ আমার কাছে সরে সরে আসছে। আমি আর পারছি না! আমি... আমাকে বাঁচাও... মুক্তি... মুক্তি দাও আমাকে! আমাকে... আমা...” কথাটা বলতে বলতে, লোকটার মধ্যে একটা অসংলগ্ন ব্যাপার প্রকট হতে শুরু করেছে। উর্বাক্ষু ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। ও চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে, লোকটার কাঁধ ধরে ঝাকাচ্ছে, “কী হয়েছে? কোন লোক? ওরা কারা? কী বলছেন আপনি? কথা বলুন!”

লোকটা উত্তর দিল না। বিড়বিড় করে কী একটা মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকল। কথাগুলো এখন অসম্ভব জড়িয়ে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত আটকে যাচ্ছে। সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে লোকটার। তবু আপ্রাণ চেষ্টায় লোকটা একনাগাড়ে বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করছে। সেই মন্ত্রের ভাষা উর্বাক্ষু জানে না। বুঝতেও পারছে না কিছু। ভেতর ভেতর অসম্ভব একটা টেনশন হচ্ছে ওর। হঠাৎ লোকটার হাত থেকে ছবিটা নীচে পড়ে গেল। চোখের মণি দুটো কেমন একটা ওপরের দিকে উঠে গেল। চোখের পাতার ভেতর শুধু সাদা অংশটা দেখা যাচ্ছে। মণি নেই; আর সঙ্গে সঙ্গে শেষ একটা গোঙানির মতো শব্দ করে, জ্ঞান হারিয়ে, চেয়ারে এলিয়ে পড়ল লোকটা। উর্বাক্ষু কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখল লোকটার মুখের একপাশ দিয়ে সাদা ফ্যানা ফ্যানা গ্যাজলা মতো পড়ছে।

কী করবে বুঝতে পারছিল না উর্বাক্ষু। লোকটার কি স্ট্রোক হল? না কি হিস্টিরিয়া? উর্বাক্ষু দেখেছে এরকম পেসেন্টরা সময়ে সময়ে ভয়ংকর আচরণ শুরু করে। ইমিডিয়েট কিছু একটা করতে হবে। লোকটার হাবভাব আগাগোড়াই ভালো লাগছিল না উর্বাক্ষুর। এখন আবার এসব ব্যাপার। গোদের ওপর বিষফোঁড়া। শেষে দু-জন কনস্টেবলকে ডেকে, হাসপাতালে ফোন করে খবর দিয়ে, লোকটাকে হাসপাতালে ভরতি করার একটা ব্যাবস্থা করল।

তারপর থেকেই একটা খটকা লাগছিল উর্বাক্ষুর। লোকটার আচার-আচরণ নরমাল না। কিন্তু ঠিকানাটা কীসের? কার ঠিকানা? কী দেখল ছবির মধ্যে লোকটা? আর কীসের একটা বলির কথা বলছিল? ঘটনাগুলো পর পর সাজানোর চেষ্টা করে উর্বাক্ষু। তারপরই সিদ্ধান্ত নেয়, রিস্ক নেওয়াটা ঠিক না। একবার চেক করে দেখা উচিত অন্তত। জিপ নিয়ে, তমোঘ্ন আর রামলালকে সঙ্গে করে, উর্বাক্ষু শালবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

১২

বাড়িটা খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হল না উর্বাক্ষুদের। দার্জিলিং মোড় থেকে একটা রাস্তা সোজাসুজি চলে যায় মাটিগাড়া শিবমন্দিরের দিকে। আরেকটা রাস্তা ডানদিকে বেঁকে গেছে। সেই রাস্তা ধরে কিছুটা গেলে বাঁ-হাতে সেভিন কিংডম ওয়াটার পার্ক। আগে এখানে সিনেমাক্স মাল্টিপ্লেক্স ছিল। কিছু বছর হল উঠে গেছে। সেভিন কিংডম পেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে ডান হাতে ভিরাম্মা রিসর্ট। এই রিসর্টে বছর খানেক আগে একবার লা টমাটিনা ফেস্টিভ্যাল হয়েছিলো। দিল্লি পাবলিক স্কুল, জ্ঞানজ্যোতি মোড় পেরিয়ে আরো কিছুটা এগিয়ে শালবাড়ি মার্কেট। এখানে প্রতি মঙ্গল আর শনিবার হাট বসে। তখন ভিড়ের চোটে যাতায়াত করা অসুবিধা হয়ে যায়। এই এলাকাটা বেশিরভাগটাই নেপালি প্রধান। ফাঁকা মাঠের মধ্যে হাফ বাউন্ডারি ওয়াল গাঁথনি করা চৌকো চৌকো খোপ খোপ। তার মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে কয়েকটা জনবসতি। আগে এই জায়গাটা আরো ফাঁকা ছিল। রাত আটটা বাজতে না-বাজতে অন্ধকার হয়ে যেত সমস্ত এলাকা। এখন যদিও সেই ব্যাপারটা অতটা নেই। এখন রাত অবধি অটো পাওয়া যায়।

কাছেই একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। এছাড়া দু-পাশে খাওয়ার দোকানগুলোতে রাত অবধি ভিড় থাকে। এখানে প্রচুর বাসায় পেয়িং গেস্ট ব্যাবসা। কলেজ স্টুডেন্টরা সেখানে থাকে। তাই রাস্তার দু-পাশে ছোটো ছোটো একচালা, দো-চালা কাঠের খাবারের দোকানগুলোতে বেশ ভিড় থাকে; আর তাছাড়া এসব দোকানে খুব সস্তায় দু-বেলা খাবারও পাওয়া যায়। রাত হলে অন্ধকার আকাশের গায়ে এক টুকরো আলোর রেখার মতো পাহাড় দেখা যায়। পাহাড়ের ঢালে যে বস্তিগুলো আছে, সেই বস্তিগুলোর আলো। রাতের বেলায় একটা অতিপ্রাকৃত সৌন্দর্য এলাকাটাকে ঘিরে থাকে। মনে হয়, এই অশান্ত পরিবেশের মধ্যের কোনও জায়গা নয়; বরং অন্য কোনও বিশ্বের একটুকরো জমিন।

উর্বাক্ষুরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারল বাড়িটা সন্দীপ শেরপা নামে এক ভদ্রলোকের। ওনার বাড়ি কার্শিয়াংয়ে। এই বাড়িটা উনি ভাড়া খাটান। ভদ্রলোকের ব্যবসা আছে। মাঝে মাঝে ব্যবসার কাজে সমতলে এলে, এই বাড়ির একটা ঘর উনি নিজের জন্য রেখেছেন, ওখানে থাকেন।

তবে এই বাড়িতে সম্প্রতি মাসখানেক আগে একজন ভাড়া এসেছিলেন বটে, তবে তার নাম-ধাম, কী করেন— এসব কিছুই আশপাশের লোকজন জানে না। ওই লোকটা না-কি খুব অদ্ভুত। বাড়ি থেকে খুব একটা বেরোত-টেরোত না। কারও সঙ্গে মেলামেশাও করত না। তবে মাঝে মাঝে বাড়ির ভেতর থেকে না-কি অনেকরকম মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যেত। কিন্তু সবাই জানে ওই বাড়িতে ভদ্রলোক একাই থাকতেন। দু-দিন আগে ভদ্রলোককে দুপুর নাগাদ বেরোতে দেখা গিয়েছিল। তবে তারপর আর কোনও খোঁজ কেউ জানে না। এলাকার অনেকেরই মতে এই বাড়িটায় অপদেবতার উপদ্রব আছে; আর সেই ভাড়াটে খোদ এই অপদেবতাকে এই বাড়িতে এনেছেন। এলাকার লোকজনের মতে ওই ভদ্রলোক এই বাসায় ভাড়া আসার পর থেকে না-কি আশপাশের ফুল গাছগুলো সব শুকিয়ে গেছে। গাছে ফুলও হয় না, নতুন পাতাও গজায় না। উর্বাক্ষুরা দেখল— সত্যি সত্যিই তাই। আশপাশে যত চারাগাছ আছে, সবগুলোই কেমন জানি মরা মরা। ঠিক পুরোপুরি শুকিয়েও যায়নি; আবার সতেজও নেই। বাঁচা আর মরার মাঝামাঝি একটা অবস্থায় আছে। যদিও এসব কথায় বিশেষ পাত্তা দেয় না উর্বাক্ষু। স্থানীয়দের মধ্যে অনেকসময়ই অনেকরকম কুসংস্কার

থাকে। সেগুলোকে আমল না-দেওয়াই ভালো।

বাড়িটার গেট লক ছিল না; আর দরজাও ঝাপানো ছিল। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা। ঘরদোর অগোছালো, অপরিচ্ছন্ন। যেই এ বাসায় থাকুক না কেন, সে যে শৌখিন ছিল না, এটা বাড়িঘরের অবস্থা দেখেই বোঝা যায়; আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, সমস্ত ঘর জুড়ে একটা পচা সোদা মতো গন্ধ। কিছু একটা মরে পচে গেলে যেরকম একটা গন্ধ বেরোয়, ঠিক সেরকম। কিন্তু গন্ধটা কোথার থেকে আসছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তাহলে কি বুড়ো সাধুটার কথাই ঠিক? বাড়িটার ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ এ-ঘর ও-ঘর সার্চ করতেই বেডরুমে, বিছানার পেছন দিকের একটা দেওয়ালে লম্বা-চৌকো মতো একটা খোপ দেখতে পেল উর্বাক্ষু। তমোঘ্ন আর রামলাল মিলে সেটা একটু ঠেলা দিতেই খোপটার মুখ থেকে কাঠের স্ল্যাবটা সরে গেল; আর সামনে খুলে গেল আরেকটা গোপন কুঠুরি মতো— দশ বাই চোদ্দর একটা ঘর। দেওয়াল হাতরে সুইচবোর্ড খুঁজে আলো জ্বালাতেই বুকের ভেতরটা 'ছ্যাঁৎ' করে উঠল উর্বাক্ষুদের। সমস্ত ঘরের মেঝে জুড়ে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। এখন যদিও শুকিয়ে গেছে। ঘরের একটা দেওয়াল জুড়ে একপাশ থেকে আরেকপাশে একটা ওয়াল হ্যাংগিং টাইপ সাদা মোটা কাপড়ের পর্দা মতো টাঙানো। সেই পর্দায় একটা মুখ আঁকা; ছবিটা ভীষণ অদ্ভুত টাইপের; নীলাভ মুখের গড়ন, দুটো ক্রূর রক্ত চক্ষু; একটা লকলকে জিভ বিশাল হাঁ-মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ছবিটাকে দেখলে ভক্তির চেয়েও ভয় লাগে বেশি। ওটার সামনে একটা বেদি মতো বানানো; সমস্ত বেদী জুড়ে রক্ত ছড়ানো-ছিটানো। বেদিটার একপাশে চ্যালাকাঠ, আরেকপাশে দুটো ধাতুর পাত্র রাখা, দুটো পাত্রর গায়েই রক্ত লাগা। সম্ভবত পর্দায় আঁকা এই প্রতিকৃতিটাকে পূজা করা হয়। যদিও ছবিটা কোনও চেনা দেব-দেবীর নয়। এমনকি টিভিতে বা মোবাইলে অনেক সময়ই অনেক দেশ-বিদেশের দেব-দেবীর ব্যাপারে দেখায়। সেরকম কোনও দেব-দেবীর কথাও অনেক ভেবে উর্বাক্ষু মনে করতে পারল না। অথচ কেন জানি না ওর মনে হচ্ছে থাংকায় আঁকা এই প্রতিকৃতি ও চেনে। খুব ভালো করেই চেনে। কোথায় দেখেছে উর্বাক্ষু এই প্রতিকৃতি? দেখার কথা না; অন্তত এরকম কোনও ছবি আগে দেখে থাকলে কিছুটা হলেও স্থান-কাল পাত্র মনে থাকত। উর্বাক্ষুর স্মৃতি এতটাও খারাপ না। ও চিন্তা করার চেষ্টা করে। কিন্তু অনেক ভেবেও

কিছু মনে করতে পারে না। সামনে রাখা এই পাত্র দুটোতে কি রক্ত নিয়ে উৎসর্গ করা হয় পর্দায় আঁকা অদ্ভুত প্রতিকৃতিটাকে? অন্তত রক্ত লেগে থাকা পাত্রগুলো সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। চ্যালাকাঠটার ওপর উর্বাক্ষুদের দিকে পিঠ করে হাঁটু মুড়ে প্রণামের ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছে একটা উলঙ্গ মেয়ে। হাত দুটো দুপাশে ছড়ানো। সবথেকে বীভৎস ব্যাপারটা হল, মেয়েটার গলার থেকে মাথার অংশটা কাটা। সম্ভবত বলি দেওয়া হয়েছে। মুহূর্তের জন্য একটা চিনচিনে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল উর্বাক্ষুর মধ্যে। তাহলে কি সেই বুড়ো সাধুটার প্রত্যেকটা কথা ঠিক? এই মেয়েটাই কি তাহলে পিয়াসী বক্সী? ওই সাধু পিয়াসীর ছবিটা দেখে এই বাড়ির ঠিকানা, এমনকি বাড়ির ঘরদোরের যেরকম বর্ণনা করছিল, সমস্তটাই মিলে যাচ্ছে। এমনকি বলির ব্যাপারটাও। তাহলে কি...

যুক্তি দিয়ে পর পর সমস্ত ঘটনা সাজানোর চেষ্টা করে উর্বাক্ষু। কিন্তু কোনও মিসিং লিংক খুঁজে পায় না। জাস্ট একটা ছবি দেখে এভাবে সত্যি সত্যিই কি এতকিছু বলা সম্ভব? বলা যে সম্ভব সেই প্রমাণ উর্বাক্ষুর চোখের সামনে; কিন্তু কীভাবে? কিছুই ঠিকঠাক মেলাতে পারছে না উর্বাক্ষু। তমোঘ্ন পাশ থেকে নীচু গলায় উর্বাক্ষুকে বলল, "স্যার... পিয়াসী বক্সী না কি এই মেয়েটা?"

"এখনও বোঝা যাচ্ছে না। ঘরটা আরেকটু সার্চ করে দেখতে হবে। ভিক্টিমের মিসিং হওয়ার আগে যে ড্রেস পরে ছিল, সেই ড্রেস বা মোবাইল, মানিব্যাগ কিছু পাওয়া গেলে ভালো।"

"খুনটা কি আজ কালের মধ্যে করা?"

উর্বাক্ষু কড়া চাহনিতে তাকালো তমোঘ্নর দিকে। তারপর বিরক্তি মেশানো গলায় বলল, "থানার ওই বুড়ো সাধুটার মুখে তন্ত্রে ষটচক্রভেদে ছয় শূন্যের কথা শুনছিলাম কিছুক্ষণ আগে। তোমাকে না-দেখলে জানতেই পারতাম না, আরেকটা শূন্যও আছে; সেটা হল তোমার আই কিউ! ইডিয়ট! দেখতে পাচ্ছ না রাইগর মর্টিস হয়ে শরীরটা কীরকম স্টিফ হয়ে গেছে? আর বিচ্ছিরি পচা গন্ধ বেরোচ্ছে! আজ বা গতরাতের খুন তো এটা নয়ই। তারও আগের খুন এটা। মোস্ট প্রবাবলি তিন-চারদিন আগের হবে। শরীরের পচন ধরা দেখে বোঝা যাচ্ছে যেটুকু। এখনও ম্যাসিভ কিছু এক্সপোজ় হয়নি বডির। জাস্ট একটু স্টিফ হয়ে চামড়াগুলো চুপসে গেছে।

কিন্তু ওই সাধু পিয়াসীর ছবি দেখে কী করে এত নিখুঁত সমস্তটা বলে দিল?"

"স্যার এই বাড়ির ভাড়াটে দু-দিন ধরে মিসিং। ওই সাধুটাই এই বাড়ির ভাড়াটে লোকটা না তো? লোকটা কীরকম দেখতে ছিল... আমরা কিন্তু ওর কোনও ছবিই দেখিনি" আমতা আমতা স্বরে প্রশ্ন করে তমোঘ্ন।

"ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন তমোঘ্ন। সেটা হওয়াও কিন্তু পসিবেল। অনেক খুনিই থাকে এভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এরা আসলে মানসিক রোগী। কিন্তু সেই ব্যাপারটাও প্রমাণসাপেক্ষ। তার আগে এটা দেখতে হবে লাশটা কার?"

কথাটা বলতে বলতে আশপাশটা ভালো করে দেখতে লাগল উর্বাক্ষু; আর ঠিক তখনই নজরে পড়ল ঘরের এক কোণে পড়ে আছে একটা জিন্স, আর-একটা লাল কুর্তি। কুর্তির মধ্যে দলা পাকিয়ে গুঁজে রাখা একটা ব্ল্যাক কালারের ব্রেসিয়ার আর লাল পান্টি। উর্বাক্ষুর নজরে সেটা পড়তেই, সেদিকে এগিয়ে গেল ও; আর কুর্তিটা সরাতেই নজরে পড়ল মোবাইল ফোনটা। ফোনটা বন্ধ। গ্লাভস পড়া ছিল উর্বাক্ষুর। ফোনটা সাবধানে উঠিয়ে রামলালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটাকে অন করার চেষ্টা করে দেখো, চার্জ আছে না-কি। যদিও চার্জ থাকার কথা না..."

রামলাল ফোনটা হাতে নিয়ে পাওয়ার বোতামটা জোরে কয়েকবার টিপ দিতেই মোবাইলটা অন হয়ে গেল। পাসওয়ার্ড প্রটেক্টেড না। অতএব বিশেষ অসুবিধা কিছু হল না। দশ পার্সেন্টের কম ব্যাটারি আছে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। না-হলে মোবাইল আবার অফ হয়ে যাবে। উর্বাক্ষু রামলালের থেকে মোবাইলটা নিয়ে সটান মোবাইল ফটো গ্যালারি ওপেন করল; আর সেটা ওপেন করতেই দ্বিতীয় বারের মতো অবাক হল উর্বাক্ষু। গ্যালারিতে অনেকগুলো ফটো। ফটো দেখে উর্বাক্ষুর চিনতে কোনও অসুবিধা হল না। এই মেয়ের ছবি উর্বাক্ষু আগেও দেখেছে। পিয়াসী বক্সী!

কীভাবে জানা নেই, তবু, সেই সাধুর প্রত্যেকটা কথা ঠিক। যা ঘটছে সমস্তটাই, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে, যুক্তির বাইরে। তবুও সত্যিটা স্বীকার না-করা ছাড়া উপায় নেই। পিয়াসী বক্সী সেই নৃশংস ঘটনার ভিক্টিম। এই একবিংশ শতাব্দীতে হিউম্যান স্যাক্রিফাইসের মতো জঘন্য প্রথার শিকার হতে হবে একটা মেয়েকে, সেটা ভাবতেই গা ঘিনঘিন করে উঠছে উর্বাক্ষুর। তার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা রাগ চাড়া দিয়ে উঠছে উর্বাক্ষুর মাথায়। পিয়াসীর

মাথা কাটা বডিটার দিকে তাকানো যাচ্ছে না। মেয়েটার মুখটা বার বার মনের সামনে ভেসে উঠছে। লাশটা আদতে কার, এ ব্যাপারে এতক্ষণ নিশ্চিত ছিল না উর্বাক্ষুরা। তাই এতক্ষণ সেরকম কিছু অনুভূতি হয়নি। কিন্তু এখন পিয়াসীর মুখটা বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে; আর তাতেই একটা অস্বস্তি হচ্ছে উর্বাক্ষুর।

রামলাল জিজ্ঞেস করলো, "স্যার, এটা কীসের ছবি পর্দাটায়?"

"পর্দা না; ওটা থাংকা। দশম শতাব্দী নাগাদ তিব্বতিদের মধ্যে প্রথম এর চল হয়। আর তারপর তিব্বত থেকে পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। আন্দাজ দু-ফুট লম্বা সিল্কের কাপড়ে বৌদ্ধ দেব-দেবীদের ছবি এঁকে— সেটাকে পূজা করা হয়। এই সিল্কের কাপড়টাকে ওদের ভাষায় বলে 'থাংকা'। খুব পবিত্র জিনিস। এখনও তামাং, শেরপাদের মধ্যে এই থাংকা পূজা প্রচলিত আছে। ওরা এই থাংকার সামনে ধূপ জ্বালায় প্রতিদিন; হাঁটু মুড়ে এর সামনে বসে নীচু হয়ে প্রণাম করে। তবে এই থাংকাটা আলাদা। কারণ এটার ওপর কোনও দেবতার ছবি আঁকা নেই। অন্তত ছবিটা দেখে সেটা মনে হচ্ছে না। তবে এটা যার প্রতিকৃতিই হোক না কেন, এই প্রতিকৃতিকে পূজার প্রচলন ছিল; আর এই প্রতিকৃতির উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করা হতো রক্ত। বলি প্রথাও ছিল। কিন্তু তিব্বতি থাংকার ক্ষেত্রে এরকম কোনও ব্যাপারই কিন্তু নেই। এসব বলি, দেবতার উদ্দেশ্যে রক্ত উৎসর্গ করা... খটকাটা এখানেই। আমি কিছুই মেলাতে পারছি না তমোঘ্ন। তবে যাই হোক না কেন, এই কাল্ট রিচুয়ালের ভিক্টিম হল পিয়াসী বক্সী। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে পরিষ্কার না। কেন পিয়াসী বক্সী? এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে হবে; আর এই ঘটনাটার সঙ্গে কে বা কারা জড়িত সেটা খুঁজে দেখতে হবে। ওই বুড়ো সাধুটা বলছিল, একটা লোককে না-কি ও দেখেছে পিয়াসীকে বলি দিতে। এছাড়াও একটা ছায়া মতো মূর্তি এই ঘরটায় ছিল। সেটাকে সত্যি মানলে, আপাতত সিদ্ধান্তে আসা যায়, ঘটনাটার সঙ্গে দু-জন জড়িত। কিন্তু ওরা কারা? আপাতত পিয়াসী বক্সীর লাশটা পোস্টমর্টেমে পাঠাতে হবে। থানায় ফোন করো। সুজিত থাকলে, ওকে বলো এখনই লোক পাঠাতে। আর শোনো ওই সাধুটা বলছিল, ও না-কি দেখেছে একটা লোক পিয়াসীর সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হচ্ছে। আপাতত তাই ভ্যাজাইনা থেকে সিমেন বা মেল পিউবিক হেয়ার কিছু

পাওয়া গেলে, সেখান থেকে ডিএনএ স্যাম্পল কালেক্ট করে টেস্ট করতে হবে। সেক্ষেত্রে শুধু হিউম্যান স্যাক্রিফাইস না। রেপ অ্যান্ড মার্ডার কেস হবে।"

"কিন্তু স্যার, হিউম্যান স্যাক্রিফাইস এই যুগেও আছে? ভাবা যায়?"

"ভাবা যে প্র্যাকটিস করতে হবে সেটা তো দেখতেই পারছ। একটা সময় এই নরবলি ব্যাপারটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ক্ষমতাসম্পন্ন কেউ হলেই, এই ধান্দা করত। ধরো বাড়ির কেউ কঠিন কোনও রোগে আক্রান্ত। তখন তো ডাক্তার-চিকিৎসা এসব অতটা উন্নত ছিল না। তখন ওই ক্ষমতাসম্পন্ন লোকগুলো ক্ষমতার জোরে, আশপাশের গ্রাম থেকে নিরীহ লোকদের ধরে এনে নরবলি দিত ঠাকুরের উদ্দেশ্যে; যাতে, ওদের পরিবারের যে অসুস্থ হয়েছে, সে যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে। অনেক সময় ডাকাত দলের লোকজনও বড়ো বড়ো জমিদার-জোতদার যারা ওদের টাকাপয়সা দিতে চাইত না, ওদের ধরে এনে ঠাকুরের সামনে বলি দিত। কিন্তু এখন সেই প্রথা উঠে গেছে। এইসব কিছু এখন বেআইনি। ধরা পড়লে আর দোষ প্রমাণিত হলে ডায়রেক্ট ফাঁসি।"

কুঠুরি মতো ঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বেডরুমের একটা দেওয়ালে অন্যমনস্কভাবে চোখ পড়ল উর্বাক্ষুর; আর সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়ল ওর। ফ্রেমের ছবিটায় যে-মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে, সে-ই যে এই বাড়ির ভাড়াটে সে-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই উর্বাক্ষুর। আর আশ্চর্যের ব্যাপার মানুষটাকে ও ভালোমতো চেনে! তমোঘ্নের চোখও ওদিকে গেছে। সেও একইরকমভাবে বিস্মিত। আবছা আমতা আমতা স্বরে ও উর্বাক্ষুকে বলল, "স্যার, এই লোকটা তো..."

তমোঘ্নের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঘাড় নেড়ে উর্বাক্ষু উত্তর দিল, "দু-দিন আগে যে-লাশটা ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিংয়ের ওখানে পাওয়া গেছে, সেই লোকটা!..."

১৩

থানায় দুটো টেবিল জোড়া দিয়ে থাংকাটা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ওর ওপর; আর পাশেই রাখা হয়েছে সেই মূর্তিটা, যেটা সেদিন ওই ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিংয়ের ওখানে লাশটার সঙ্গে পাওয়া গেছিল। মূর্তিটার মুখের সঙ্গে থাংকায় আঁকা ছবিটার অদ্ভুত মিল। মূর্তি আর থাংকায় আঁকা ছবিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে অনিরুদ্ধ গম্ভীর গলায় উর্বাক্ষুকে বলে, "দুটো যে একই, সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা কার প্রতিকৃতি সেটাই তো বুঝতে পারছি না। এত মূর্তি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলাম এতগুলো বছর, কিন্তু এরকম কিছু কোনোদিন দেখিনি। মূর্তিটাকে পূজার চল ছিল, সেটা এটার গায়ে লাগা লাল লাল দাগ দেখলেই বোঝা যায়; প্লাস, থাংকার সামনে পুজার বেদিও তোরা দেখেছিস ওই বাড়িটায়। অতএব পূজা হতো এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু..."

উর্বাক্ষু অনিরুদ্ধকে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, আমাদের এখানে গ্রামাঞ্চলগুলোতে এখনও অনেক লৌকিক দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। সেরকমই কোনও লৌকিক দেব-দেবী না কি?"

"না না; সেরকম হলে এই টাইপের মূর্তি বা ছবি আরো পাওয়া যেত; কিংবা এখন ইন্টারনেটের যুগে, এরকম পূজার খবরও পাওয়া যেত মিনিমাম। সেটা তো পাওয়া যায়নি। আর থাংকায় আঁকা দেব-দেবীর পূজা কিন্তু মূলত বৌদ্ধ দেব-দেবীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়। যেমন, থাংকায় আঁকা দেবী তারার পূজা করা হয় ব্যাবসায় উন্নতি করার জন্য। ঝুট ঝামেলা, নানানরকম ফাঁড়া থেকে বাঁচতে পূজা করা হয় ধর্মপালের। মানে, বুঝতেই পারছিস, নিছক রুম ডেকোরেশন করার জন্য কেউ থাংকা কিনে ঘরে টাঙায় না। বসন্তপুর-ভক্তপুর-থামেল, কিংবা ওই পোখারা লেকের ওখানে যে-টুরিস্ট স্পটগুলো আছে, সেখানকার স্টলগুলোতে ভীষণ রিজেনেবল দামে থাংকা বিক্রি হয়। তাই বলছি এটা পুরোপুরিই তিব্বতি বৌদ্ধিস্ট কালচার। এই থাংকায় আঁকা ছবিটার সঙ্গে এই মূর্তিটার মিলটাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিস। এবার দেখ আগের দিনই তোকে বললাম, এই মূর্তিটার সঙ্গে চারজন বৌদ্ধ দেব-দেবীর মিল আছে; হেরুকা, যমান্তক, বজ্রপাণী আর মারিচি। কিন্তু পুরোপুরিভাবে পারটিকুলার কোনও একজনের সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। একইসঙ্গে চারটা দেব-দেবীর বৈশিষ্ট্য একটা মূর্তিতে।

অতএব জোর দিয়ে এটাও বলতে পারি না যে, মূর্তিটা যমান্তক কিংবা হেরুকা বা বজ্রপাণীরই হবে। কারণ ওদের প্রত্যেকের সঙ্গেই কিছু না কিছু অমিলও আছে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল, ওই সমস্ত বৌদ্ধ দেব-দেবীর পূজায় এইসব নরবলি কিংবা তাজা রক্ত উৎসর্গ বা উৎসর্গের নামে যৌনাচার ছিল বলে জানা নেই আমার।"

"বুঝলাম... কিন্তু একটা না একটা সিদ্ধান্তে তো আসতে হবে আমাদের।"

"আহা, কী মুশকিল! সিদ্ধান্ত না-পাওয়া গেলে কী করবি?"

"হুম সেটাই... আচ্ছা এই অঞ্চলে নরবলির ইতিহাস থেকে কিছু গেস করা যায় কি?"

"দেখো, হিউম্যান স্যাক্রিফাইস ব্যাপারটা কিন্তু আদি অনন্তকাল থেকেই চলে আসছে। আমাদের ভারতেই দ্যাখ না... গঙ্গাসাগরে নিজের সন্তানকে বিসর্জন দেওয়া, সতীদাহ... এগুলো তো সবার জানা। এমনকি পুরীর জগন্নাথের রথের নীচে অনেকে স্বেচ্ছায় পিষে মরত। এগুলো সবগুলোই এক একটা হিউম্যান স্যাক্রিফাইসের উদাহরণ। আমার এক বন্ধু, নির্বাণ বিশাই। ও রিপোর্টার। ওর একটা শখ হল পুরোনো পেপার কাটিং সংগ্রহ করা। সেই কবেকার সব কাটিং ও কালেক্ট করেছে; তোকে একদিন নিয়ে যাব ওর বাসায়। যাই হোক। সেই নির্বাণের কাছে পেপার কাটিং দেখেছিলাম একটা। খবরটা বেরিয়েছিল 'সমাচার দর্পণ'-এ। যতদূর মনে পড়ছে ১৮২২ সালের ২২শে জুন। তারিখটা মনে আছে, কারণ ওই দিনটা আবার আমার বার্থ ডে। নদীয়া জেলায় জয়কুড় গ্রামের রূপরাম চক্রবর্তীর লাশ পাওয়া যায়, পাশের আড়বান্দা গ্রামে। মোটিভ হিসেবে বলা হয়েছিল 'নরবলি'। আড়বান্দা গ্রামের গৌরকিশোর ভট্টাচার্যকে পুলিশ অ্যারেস্টও করেছিল সন্দেহের বশে। কিন্তু কিচ্ছু প্রমাণ করতে না-পারায় পরে ছেড়ে দেয়।"

উর্বাক্ষু অনিরুদ্ধের কথায় সায় দিয়ে বলে, "আরে, সে তো আমিও শুনেছিলাম একটা ঘটনা। আমার ঠাকুরদার মুখে শোনা। ১৮৩৭ সালের ঘটনা। বর্ধমানের রুক্মিনী দেবীর মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ, মন্দিরের দরজা খুলে দেখেন— মন্দিরে মায়ের মূর্তির সামনে মেঝেতে ছোপ ছোপ রক্ত; এছাড়া অনেক রক্তজবা ফুল, সোনার মুদ্রা আর গয়নাগাটি ছড়ানো আছে। এর পরপরই পাশের এক পুকুর থেকে আবিষ্কার হয়েছিল একটা মাথা কাটা

লাশ। বোঝাই যাচ্ছে আগের রাতে ওই মন্দিরে নরবলি হয়েছিল। কিন্তু সাসপেক্ট হিসেবে কাউকে অ্যারেস্ট করতে পারেনি পুলিশ।

"চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী মন্দিরেও একই ঘটনা ঘটেছিল। প্রতিদিন না-কি সকালে দেখা যেত মন্দিরের মেঝেতে মানুষের রক্তাক্ত কাটা মাথা। মন্দিরের তৎকালীন সেবায়েত মনোহর ঘোষের মৃত্যুর পর, তার ছেলে রামসন্তোষ ঘোষ তাই এসবে বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে, ওই এলাকা ছেড়েই চলে যান। খোদ কালীঘাটেই এরকম কত ঘটনা আছে। নরবলির পাশাপাশি, মানুষ নিজের জিভ কেটে দেবীকে উৎসর্গ করত। ১৮৩২ সালেরই ঘটনা। এটাও নির্বাণের থেকে শোনা। এক ভদ্রলোক নাপিতকে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাটে গেছিল পাঁঠা বলি দিতে। কিন্তু পাঁঠার বদলে, খাঁড়া চালিয়ে বসে সে নাপিতের গলায়। পড়ে এটার বিচার হয়েছিল আদালতে। লোকটার ফাঁসি হয় বিচারে।"

"বেশ হয়েছে... কিন্তু এই কেসটা কী হবে?"

"দ্যাখ, আমাদের এখানে নরবলির যে-ইতিহাস পাওয়া যায়, এবং যে দেবী মূর্তিদের উদ্দেশ্যে নরবলি প্রথাটা চালু ছিল, তারা সবাই কিন্তু আমাদের চেনা দেব-দেবী। কিন্তু এই মূর্তিটা, কিংবা থাংকায় আঁকা প্রতিকৃতিটা আলাদা। থাংকা কালচারটাই প্রধানত তিব্বতি কালচার। আবার বৌদ্ধ কোনও দেব-দেবীর ক্ষেত্রে এরকম নরবলি প্রথার ব্যাপারে আমি পড়িনি কোথাও। আর তোদের ওই সাধুর কথা ধরে নিলে, উৎসর্গের নামে যৌনাচার আর তারপর বলি— এই ব্যাপারটা হিন্দুতন্ত্র বল কিংবা বৌদ্ধতন্ত্র, কোথাওই নেই।"

"বুঝলাম..." উর্বাক্ষুর কপালে চিন্তার ভাজ স্পষ্ট। কী একটা ভাবতে ভাবতে ও বলল, "কেসটার কিছুই কূলকিনারা হচ্ছে না। আর পিয়াসীকে ওই লোকটা খুন করেছে যদি ধরেও নেওয়া হয়; তাহলে ওই লোকটাকে আবার কে খুন করল? সাধুটা বলছিল, ও না-কি ছবিতে দেখেছে পিয়াসী আর ওই লোকটা বাদেও ঘরে আরেকজন ছিল। কে সে? সেই লোকটাই কি তাহলে পিয়াসী খুন হওয়ার পর, ওই বাকি লোকটাকে মেরে ফেলেছে? কিন্তু মারল কীভাবে? ওই লোকটার দেহে পয়জেনিংয়ের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি; শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। স্ট্রোকও হয়নি। শুধু শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব পুড়ে ছাই... এটা কীভাবে সম্ভব? দেখে মনে হচ্ছে কেউ ম্যাজিকের মতো, লোকটার শরীরের ভেতরে ঢুকে, ভেতর

থেকে শরীরটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেছে!”

“ওয়েট... তুই বলেছিলি সাধুটা বলেছে, একটা জমাট ধোঁয়ার মতো কিছু শয়তানের আকার নিয়েছে। সেটাকে তুই লোক হিসেবে ধরে নিচ্ছিস কেন?”

“লোক হিসেবে না-ধরে ভূত হিসেবেও তো ধরতে পারি না। কী প্রমাণ করব? ভূত ব্ল্যাক ম্যাজিক করে মেরে দিয়েছে? ধোপে টিকবে এসব লজিক?”

“না সেটা টিকবে না। কিন্তু...”

এমন সময় উর্বাক্ষুর মোবাইলে একটা কল এল। কল রিসিভ করে উর্বাক্ষু কথা বলল কিছুক্ষণ। কথা বলতে বলতে ওর চোখ দুটো চকচক করছিল উত্তেজনায়। ফোন রেখে উর্বাক্ষু অনিরুদ্ধকে বলল, “রিপোর্ট চলে এসেছে। পিয়াসীর ভ্যাজাইনাতে সিমেন পাওয়া গেছে; আর সেই ডিএনএ-র স্যাম্পেলের সঙ্গে, সেদিন ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিংয়ের পাশের গলিতে যে-লাশটা পাওয়া গেছিল ওই লোকটার ডিএনএ ম্যাচ করে গেছে। কিন্তু ওই লোকটাকে কে খুন করল, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। এখন একমাত্র উপায়, ওই সাধু ভদ্রলোক এখনও হসপিটালে অ্যাডমিট আছে; ও সুস্থ হোক; তারপর ওর সঙ্গে একদিন বসতে হবে। এটা ছাড়া আর কোনও উপায় দেখছি না।”

উর্বাক্ষুর কথায় সায় দেয় অনিরুদ্ধ, “আমিও থাকব সেদিন। আমাকে কল করে ডেকে নিস।”

“বাই দ্য ওয়ে, তুই সত্যিই বিশ্বাস করিস, ভূতে খুন করেছে এই লোকটাকে?”

“এখনও বিশ্বাস করার মতো পর্যায় আসেনি কিছু উর্বাক্ষু। আগে ওই সাধু সুস্থ হোক। তারপর... ‘বিশ্বাসে মেলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর’ তর্কে লাভ নেই। আপাতত লজিক ফেলে বিশ্বাস করায় মন দিতে হবে। তাতে যদি কিছু সুরাহা হয়।”

১৪

উর্বাক্ষুর ওই সাধুর ক্ষমতায় অবিশ্বাস সরে গিয়ে ভক্তি এসেছে না-কি বোঝা গেল না; কিন্তু পরদিন হসপিটালে ওনাকে দেখতে গিয়ে "বাবা" বলে সম্বোধন করছিল। হসপিটালের কাউন্টার থেকে ওনার নামও জানা গেছে; বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্য।

এখন ভদ্রলোক ভালোই আছেন। জ্ঞান ফিরেছে। কথাবার্তাও নরমাল বলছেন। ঠিক কী কারণে ওইদিন ওরকম জ্ঞান হারিয়ে মুখ দিয়ে গ্যাজলা পড়ছিল, ডাক্তাররা ধরতে পারেনি। সমস্ত টেস্ট রিপোর্ট নরমাল। প্রথমে সবাই ভেবেছিল স্ট্রোক জাতীয় কিছু। কিন্তু স্ক্যানিং এমআরআই সবকিছুই করানো হয়েছে। কোনও রিপোর্টেই খারাপ কিছু নাই। অতএব ডাক্তাররা নিজেরাও ধন্দে আছে। শুধু পুলিশ মারফৎ ভরতি করা হয়েছে বলে হুটহাট করে পেসেন্টকে ডিসচার্জ না-করে এক-আধদিন সেবা-যত্ন করছে মুখ বুজে। না-হলে সরকারি হসপিটালে এতদিন কিছু না-পেলে ফেলে রাখে না।

বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্যকে উর্বাক্ষু সেদিনের পরে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনাই বলেছে। ভদ্রলোক অদ্ভুত একটা আচরণ করলেন। উর্বাক্ষুর সমস্ত কথাই উনি খুব মন দিয়ে শুনলেন; তারপর একটা হাই তুলে, "ও আচ্ছা" বলে, বেডে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঝলেন।

উর্বাক্ষু কিছুক্ষণ ওনার সামনে থতমত হয়ে বসে থেকে, উঠে চলে গেল। অথচ ওর অনেক কিছুই জানার আছে। পিয়াসী বক্সী আর ওর খুনি দু-জনেই যখন মৃত তখন লাশ আটকে রাখার মানে হয় না। অতএব পিয়াসী বক্সীর লাশটা ওর ফ্যামিলির হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে থানা থেকে। এদিকে অনেকগুলো প্রশ্নের কোনও উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। পিয়াসীকে ওই লোকটা খুন করলে, ওই লোকটাকে তাহলে কে খুন করল? আর কীভাবেই-বা খুনটা করা হয়েছে?

দু-দিন এই বৃদ্ধ সাধুর জেনারেল কেবিনে যাতায়াতও করল উর্বাক্ষু। সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায় না; যখন ব্যাপারটার সঙ্গে একটা ব্যখ্যাতীত ম্যাজিক জড়িয়ে আছে। উর্বাক্ষু ভেবেছিল কথার ছলে যদি কিছু জানা যায়। এমনিতে উর্বাক্ষু নাস্তিক। তবুও এই সাধুর ক্ষমতার ওপর ওর একটা আলাদা বিশ্বাস জন্মেছে এই দু-দিনে। কিন্তু বিশেষ কিছু লাভও হয়নি এতে। বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্য প্রতিবারের মতোই উর্বাক্ষুর সমস্ত কথা শোনেন; তারপর

একটা হাই তুলে, গা এলিয়ে, বেড়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়েন। বেশি জোরজবরদস্তি ওখানে বসে থেকে ভদ্রলোককে ফোর্স করতেও সাহস হয় না উর্বাক্ষুর; বয়স্ক লোক; কী থেকে আবার কী হয়ে যায়। আর তাছাড়া উনি তো সাহায্যই করেছেন কেসটায়; ক্ষতি তো কিছু করেননি। সেদিন ভদ্রলোক থানায় বসে একটা ছবি দেখে, নিজে থেকে এতকিছু প্রেডিক্ট করে দিলেন; অথচ এখন যখন উর্বাক্ষু নিজে ওনার কাছে সাহায্য চাইছে ইনডায়রেক্টলি, সেটা উনি বুঝেও যেন না বোঝার ভান করছেন। হয়তো উর্বাক্ষুর অবিশ্বাসের গোড়ায় এটা ওনার একটা চরম উপহাস। অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসের কাছে নত হতে দেখে উনি মনে মনে আনন্দ পাচ্ছেন। উর্বাক্ষুর ভেতর ভেতর লোকটার ওপর কেন জানি আলাদা একটা সফট কর্নার তৈরি হয়েছিল; তাই হয়তো লোকটার এমন আচরণে, ভেতর ভেতর বিরক্ত হলেও, নিজেকে সংযত করে নিচ্ছিল উর্বাক্ষু।

এভাবে দু-দিন যাতায়াত করে হাল ছেড়ে দিল উর্বাক্ষু। কত কেসই তো এরকম অধরা থেকে যায়। কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ এই কেসটার শেষটা জানার ইচ্ছে ছিল ওর। তা-ও ও নিজেকে সান্ত্বনা দেয় এই বলে যে 'খুনি-ভিক্টিম' দু-জনেই শেষ। এখানে আলাদা করে রহস্যের কী আছে? রেপ অ্যান্ড মার্ডার কেস নতুন কিছু না।"

অথচ মনে মনে ও নিজেও জানে, এই কেসটা সির্ফ একটা রেপ অ্যান্ড মার্ডার কেস না। এর মধ্যে আরো অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে।

ঘটনাটা একটা সময় একরকম প্রায় জোর করেই মাথা থেকে বের করে ফেলেছিল উর্বাক্ষু। সেদিন দুপুরের পর থেকেই আকাশ মেঘলা করে এল। আর তার কিছুক্ষণ পরই বৃষ্টি নামল। গ্রাম আর শহরের বৃষ্টির গন্ধ আলাদা। গ্রামের বৃষ্টির মধ্যে একটা ভেজা মাটির গন্ধ মিশে থাকে; একটা শিরশিরে রোমাঞ্চ, আর তার সঙ্গে মিশে থাকে জলের ছাটে ঘরদোর ভেসে যাওয়া সর্বহারা একটা কান্নার সুর। শহুরে বৃষ্টিতে মাটির গন্ধ পাওয়া যায় না। সোঁদা কংক্রিটের গন্ধ, নিকোটিন, পোড়া ডিজেলের ধোঁয়ার গন্ধ এসব এসে মেশে শহরের বৃষ্টির মধ্যে। পাশাপাশি একটা মন কেমনের বিকেল-সন্ধ্যা। সবকিছুই আছে; তবুও বুকের ভেতরটা কেমন একটা ছ্যানছ্যান করে ওঠে মাঝে মাঝেই। উর্বাক্ষু দু-দিন লিভ নিয়েছিল শারীরিক অসুস্থতা দেখিয়ে। যদিও শরীর ওর খারাপ-টারাপ না। আসলে মাঝেমধ্যে এরকম

ফাঁকিবাজি মারতে ওর ভালো লাগে। সন্ধ্যাবেলা সবে সসপ্যানে চা বসিয়েছে; জল ফুটছে, কলিং বেল বেজে উঠল। বৃষ্টির তেজটা বেড়েছে। রাস্তাঘাটে জল জমতে শুরু করেছে। শহরের এদিকটা নীচু বলে, একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়। এত ঝড়জলের মধ্যে কে আবার এল। ঘড়ির দিকে তাকাল উর্বাক্ষু। সাতটা বাজতে এখনও মিনিট দশেক বাকি। কারও আসার কথা না। অনিরুদ্ধও আউট অফ টাউন।

ওভেনের আঁচটা কমিয়ে দিয়ে, গিয়ে দরজা খুলতেই চমকে উঠল উর্বাক্ষু। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্য। বৃষ্টিতে ভিজে ওনার জামাকাপড় চুপসে গেছে। উর্বাক্ষু বেশ অবাক হল ব্যাপারটায়। এই ঝড়বৃষ্টির দিনে, বয়স্ক লোক; কিছুদিন আগেই ছাড়া পেয়েছেন হসপিটাল থেকে; এরমধ্যে উর্বাক্ষুর বাসায় আসার কী দরকার ছিল? যদিও মুখে সেই সন্দেহটা প্রকাশ করল না। একটা সময় উর্বাক্ষু নিজে যখন অমীমাংসিত কেসটাকে নিয়ে বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্যের কাছে ছোটাছুটি করেছে, তখন কোনও লাভ হয়নি। অথচ আজকে যখন ও মাথা থেকে সমস্তটা ঝেড়ে ফেলতে চাইছে, ঠিক সেরকম একটা সময়ে বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্য হাজির হয়েছেন। এটাই হয়তো নিয়তি।

"আপনি? এরকম একটা দিনে?"

"ভেতরে আসতে পারি?"

"তা পারেন; কিন্তু এই ঝড়জলের রাতে, এই শরীর নিয়ে, আর তাছাড়া আপনি আমার ঠিকানা পেলেন কীকরে?"

"থানা থেকেই পেয়েছি। শুনলাম আপনি ছুটিতে আছেন।"

"ও আচ্ছা। হ্যাঁ, শরীরটা বিশেষ ভালো নেই। আপনি তো ভিজে গেছেন পুরো। ভেতরে আসুন। টাওয়েল দিচ্ছি। গা মুছে নিন আর আমি আমার একটা পাজামা দিচ্ছি; ভেজা কাপড়গুলো মেলে দিয়ে, সেটা পরুন।"

ভদ্রলোক কোনো উত্তর না-দিয়ে, ঘরে ঢুকে, একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

"আরে, আপনি এই ভেজা গায়ে..."

"কিচ্ছু হবে না। বেশিক্ষণ সময় নেব না আপনার। আপনি অনেকবার আমার কাছে এসেছেন। সরাসরি না-বললেও বুঝতে পারি আপনার প্রয়োজন

ছিল আমাকে। আমিই একরকম জেদের বশে... সে যাই হোক। আপনাকে কিছু জানানো প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। সেটা জানিয়েই চলে যাব। বেশিক্ষণ থাকব না; আর আমার জন্য আপনাকে এত ব্যস্ত হতেও হবে না। টাওয়েল পাজামা কিছুই প্রয়োজন নেই। আমাকে যেতে হবে। তাই আপনি বরং ব্যস্ত না-হয়ে আগে আমার কথাগুলো শুনুন।"

তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন বুঝতে পেরে, উর্বাক্ষু আর বাধা দেয় না ভদ্রলোককে। তবুও, ভিজে চুপসে যাওয়া একজনকে সামনে বসে থাকতে দেখে কিছুটা অস্বস্তি হচ্ছিল ওর। তবু সেই অস্বস্তি চেপে বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্যের সামনে আরেকটা চেয়ার টেনে বসে উর্বাক্ষু বল, "বলুন..."

"থানা থেকে বলল— আপনি না-কি ওই তিব্বতি থাংকাটা আর মূর্তিটা বাসায় নিয়ে এসেছেন। সেটা শুনেই আপনার এখানে আসা। না-হলে এতকিছু কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না আমি। আপনি ওই মূর্তি আর থাংকটা নষ্ট করে ফেলুন। পুড়িয়ে ফেলুন, জলে ফেলে দিন, যা খুশি করুন, কিন্তু বাসায় রাখবেন না। ওটা ঘর সাজানোর জিনিস না। ওটা একটা সাক্ষাৎ শয়তান। সেই শয়তানকে আমি দেখেছি। তার ক্ষমতা আমি দেখেছি।"

উর্বাক্ষু ভেতর ভেতর বেশ বিরক্ত হল। থাংকা আর মূর্তিটা কৌতূহলের বশের বাসায় এনেছিল ও। কেসের জিনিসপত্র বাসায় আনাটা বেআইনি। থানার মধ্যে একমাত্র তমোঘ্ন ব্যাপারটা জানত। মনে মনে একরকম নিশ্চিত ছিল উর্বাক্ষু, যে নিশ্চয়ই তমোঘ্নর মুখ থেকেই তাহলে বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্য উর্বাক্ষুর থাংকা আর মূর্তিটা বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যাপারে শুনেছেন। কিন্তু এতদিন মনের ভেতর প্রশ্নগুলো দমিয়ে রেখেছিল ও। আবার প্রসঙ্গ উঠতে সেগুলোকে আর দমিয়ে রাখতে পারল না উর্বাক্ষু। জিজ্ঞেস করল, "দেখুন, এখানেই আমার কনফিউশান। পিয়াসী বক্সীকে যে লোকটা খুন করল, সেই লোকটাকে আবার কে খুন করল? বডিতে কোনও ক্ষত চিহ্ন নেই। কোনও বিষক্রিয়া বা অন্যকিছুর লক্ষণ নেই। তাহলে..."

"আগুন নিয়ে খেলতে গেলে, একটা সময় আগুনটা আপনার হাত পুড়িয়ে দেবে এটাই স্বাভাবিক। মানুষ আগুন আবিষ্কার করে ভেবেছিল আগুন তার আয়ত্তে। অথচ যে আগুনের শিখা আলো দেয়, সেই আগুন সর্বগ্রাসী হয়ে পুড়িয়ে ফেলতেও জানে।"

"মানে?"

"যে শয়তানের পূজা শুরু করেছিল ওই লোকটা, সেই শয়তানের হাতেই ওকে শেষ হতে হল। ও ভেবেছিল বীজমন্ত্রে শয়তান ওর করায়ত্ব। কিন্তু যে শক্তি নিজের ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে, তাকে কি সামান্য বীজমন্ত্রে আটকে রাখা যায়?"

"তার মানে আপনি বলছেন ওই ছায়ার মতো যেটা আপনি ওইদিন দেখেছিলেন, সেটা ওই লোকটাকে খুন করেছে?"

ধীর তালে মাথা নাড়ান ভদ্রলোক।

নিজের কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না উর্বাক্ষু। জিজ্ঞেস করে, "দেখুন সব মানলাম। কিন্তু কোর্টে ভূতে এসে খুন করেছে এটাকে অ্যালিবাই হিসেবে খাড়া করতে তো আর পারব না। আমার মনে হয় আপনি জানেন কে ওই লোকটাকে খুন করেছে। আপনি বলছিলেন ওই ঘরে পিয়াসী আর ওই লোকটা বাদেও আরেকজন ছিল। কে সে?"

"সে কোনও মানুষ না। শয়তান! যাকে আপনি বাড়িতে নিয়ে এসেছেন না জেনে-শুনে!"

উর্বাক্ষু লক্ষ্য করল কথাগুলো বলতে বলতে উত্তেজনায় শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে বৃদ্ধের। বৃদ্ধের চাহনিতে স্পষ্ট যে, তিনি মিথ্যা বলছেন না। কিন্তু অতিপ্রাকৃত কিছু হুটহাট করে বিশ্বাস করতেও যুক্তিতে বাধে। অথচ এই ক-দিন যা যা ঘটে গেল, সেগুলো সুস্থ স্বাভাবিক যুক্তি দিয়ে কীভাবেই বা ব্যাখ্যা করা যায়?

উর্বাক্ষু পালটা প্রশ্ন করে, "ওই থাংকায় আঁকা মুখের প্রতিকৃতি, বা মূর্তিটা আসলে কীসের? আপনি বার বার 'শয়তান' সম্বোধন করছেন। কিন্তু আমার এক বন্ধু বলছিল ওই মূর্তির মধ্যে একই সঙ্গে না-কি চারটা বৌদ্ধ দেব-দেবীর বৈশিষ্ট্য আছে..."

উর্বাক্ষুর কথা মাঝখান থেকেই কেড়ে নিয়ে গম্ভীর গলায় উত্তর দেন বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্য, "হেরুকা, যমান্তক, বজ্রপাণী আর মারিচি। জানি। কিন্তু মূর্তিটা ওদের কোনোটাই নয়। মূর্তিটার মধ্যে ওদের বৈশিষ্ট্য থাকলেও, আসলে ওটা কোনও দেবতার মূর্তিই না।"

"তাহলে? কীসের মূর্তি?"

"শয়তানের। আমি এই মূর্তির ইতিহাস জানি না। জানি না কী করে এই মূর্তি এখানে এল। এটা ঠিক কার মূর্তি সেটাও জানি না। শুধু জানি এই মূর্তি কোনও দেবতার না; শয়তানের! প্রত্যেকটা জিনিসের একটা করে ডার্কসাইড থাকে এটা মানেন তো? সাদার পেছনে কালো; আলোর পেছনে সমান ও বিপরীত অন্ধকার— আলোর মতোই কিন্তু শক্তিশালী। এই মূর্তিটায় চারজন বৌদ্ধ দেব-দেবীর বৈশিষ্ট্য থাকলেও, আসলে এটা একটা অশুভ অপদেবতা ছাড়া কিছুই না।"

"মানে আপনার মতে এই মূর্তিটা ওই চারজন দেবদেবীর মূর্তির অশুভ বা ডার্ক কাউন্টারপার্ট বাঁ প্রতিরূপ?"

'কাউন্টারপার্ট' কথাটা বৃদ্ধ কতটা বুঝলো জানা নেই। কিন্তু উনি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। তারপর কী একটা ভেবে নীচু গলায় উর্বাক্ষুকে বললেন, "মূর্তি আর থাংকাটা আনুন তো..."

উর্বাক্ষু বিশেষ কিছুই জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করল না আর; উঠে গিয়ে মূর্তি আর থাংকাটা নিয়ে এসে বৃদ্ধ সাধুর সামনে রাখল।

উর্বাক্ষু লক্ষ্য করল, এতক্ষণ বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্য বেশ স্টেডিভাবেই কথাগুলো বলছিলেন। কিন্তু ওই দুটো জিনিস দেখামাত্রই কেমন একটা নার্ভাস মতো হয়ে গেলেন। ওনার চোখের চাহনিতে যেন মুহূর্তে জাকিয়ে বসেছে ভয়। থাংকা বা মূর্তি কোনোটাই উনি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলেন না। উর্বাক্ষু ওগুলো এনে বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্য যে চেয়ারে বসে ছিলেন, ওর সামনের টেবিলটায় রেখেছিলো। দূর থেকেই সেগুলো ওপর ওপর দেখলেন ভদ্রলোক। তারপর চোখ বুজে নিজে মনে বিড়বিড় করে কী একটা পাঠ করলেন।

উর্বাক্ষু এসবে অভ্যস্ত নয়। ও ভেতর ভেতর সবটা জানতে অধৈর্য্য হয়ে পড়ছিল; এবার আর নিজের সাসপেন্স চেপে রাখতে পারল না। বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্যকে ও বলল, "কী দেখলেন?"

ভদ্রলোক উর্বাক্ষুর কথার বিশেষ কোনও উত্তর দিলেন না। শুধু নীচু গলায় গম্ভীর স্বরে সাবধান করে বললেন, "ফেলে দিন এই জিনিস। এই জিনিস ভালো না। এই জিনিস বাড়িতে রাখা মানে আগুন নিয়ে খেলা করা বাপ।"

উর্বাক্ষু বৃদ্ধকে আশ্বস্ত করে বলল, "আচ্ছা বেশ রাখব না। তবে ফেলে দিতে তো পারি না। থানায় জমা করে দেব না-হয়।"

উর্বাক্ষুর কথায় বৃদ্ধ আশ্বস্ত হলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে কী একটা কথা উর্বাক্ষুকে বলার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিলেন। তারপর চেয়ারে ভেজা শরীরেই নড়েচড়ে বসলেন। একজন বয়স্ক লোক ওভাবে ভেজা জামাকাপড়ে উর্বাক্ষুর সামনে বসে আছে দেখে ওর নিজেরও খুব অস্বস্তি হচ্ছিল।

বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্য বলা শুরু করলেন, "সেদিন আপনি আমাকে একটা কাগজে লেখা সংস্কৃত লাইনের অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি আপনাকে ব্যাখ্যাও করেছিলাম। আপনি বলেছিলেন পিয়াসী বক্সী নামের মেয়েটা নিখোঁজ হওয়ার পর, ওদের বাড়ির গেটে গোঁজা অবস্থায় এই লেখাটা পাওয়া গেছে। কাগজে লেখা কথাটাই মেয়েটার নিখোঁজের এটাই যোগসূত্র। যে-লোকটা মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেছিল, সে নিজেই কারণটা জানিয়ে গেছে। আপনারা ধরতে পারেননি; সেটা আপনাদের ব্যর্থতা। "যৈয়েব পতনং দ্রবৈঃ সিদ্ধিস্তৈরৈব চোদিতা", অর্থাৎ, যে-সমস্ত পার্থিব বস্তু মানুষের চারিত্রিক এবং নৈতিক অবনতি ঘটায়, সেই প্রলোভনের জিনিসগুলো ভোগ করার মধ্য দিয়েই সাধকের সাধনা। আপনি বলুন, আপনার মতে ঠিক কোন কোন কারণে মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটতে পারে বলে আপনি মনে করেন?"

উর্বাক্ষু একটু আমতা আমতা করে উত্তর দেয়, "সে তো অনেক কিছুই আছে।"

"হ্যাঁ। তন্ত্রে সেসব প্রলোভনের বস্তুগুলোকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। মদ, মাংস, মাছ, মুদ্রা আর মৈথুন। আর এই কঠোর সাধনার নাম পঞ্চ ম-কার সাধনা। সাধক তিনি, যার কোনও কিছুর ওপর আসক্তি থাকবে না। হাজার প্রলোভনের জিনিস ভোগ করেও যে নির্বিকার থাকবে। সে-ই হল প্রকৃত সাধক। তন্ত্রমতে সে-ই হল কৌলিক। এই পঞ্চ ম-কার সাধনা একটা সময়ে ছিল দিব্য সাধকদের তন্ত্রসাধনার শেষ ধাপের একটা কঠোর সাধনা। সবাই এই সাধনার সুযোগ পেত না। সবাইকে এই সাধনা করতে দেওয়াও হতো না। আশ্রমগুলোতে বিশাল প্রাঙ্গণের একটা কোণে ছোট্টো মতো ঘর থাকত পঞ্চ ম-কার সাধনার জন্য। সেই ঘরে কেবলমাত্র দিব্য সাধকের প্রবেশ ছিল। যে-কোনো কারও প্রবেশের অধিকার ছিল না। যারা

এই সাধনার সুযোগ পেতেন, তাদের কাছে এই সাধনা ছিল একটা চরম পরীক্ষা। মদ-মাংস-মাছ-মুদ্রা আর মৈথুন— এই পঞ্চোপচার ভোগের পরও রাগ-তেজ-আসক্তি বর্জন করে সাধনা করতে হতো; আর সাধনায় সফল হলেই তন্ত্রমতে সে প্রকৃত কৌলিক সাধক। এখানে কিন্তু এই মদ-মাংস-মাছ-মুদ্রা আর মৈথুন সব আপেক্ষিক অর্থ বহন করছে। 'মদ' মানে এখানে সুরা নয়। 'মাংস' মানে মাংস ভক্ষণ নয়। 'মৈথুন' মানেই স্ত্রী-সহবাস নয়। এখানে 'পাপ-পুণ্য' হল পশুর সমান। যে দিব্য সাধক জ্ঞানের খড়্গ দিয়ে সেই পাপ-পুণ্যের পশুকে ছিন্ন করে, ব্রহ্মধ্যানের মধ্যে মিলিয়ে মিশিয়ে এক করতে পারেন; মানে, বাইরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সঙ্গে মনের ভেতরের ব্রহ্মের সংযোগ ঘটাতে পারেন, তিনিই হলেন আসল মাংসাশী। 'মাছ' অর্থও এখানে আলাদা। 'ইরা' আর 'পিঙ্গলা' নামে মানুষের দেহের ভেতরের দুই নাড়িকে গঙ্গা-যমুনার উপমা হিসেবে ধরা হয়। সেই অর্থে রূপক হিসেবে 'মাছ' কথাটা এসেছে। 'মাছ' ভক্ষণ মানে, আসলে প্রাণবায়ুকে প্রাণায়ামের মারফৎ নিয়ন্ত্রণ করা। সেটাই হল প্রকৃত মৎস ভক্ষণ। একইরকমভাবে 'মৈথুন' মানে স্ত্রী মানুষের সঙ্গে শারীরিক মিলন নয়। যে সাধক সাধনার দ্বারা পরমশিবের সঙ্গে পরমাশক্তির মিলন ঘটাতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মৈথুনরত। ওই যে বললাম, এই সাধনা ছিল তন্ত্রের শেষধাপের দিব্য সাধকদের চরম পরীক্ষা। তাই সাধারণ যে কেউ পঞ্চ ম-কার বলতে স্থূল অর্থে মদ-মাংস-মাছ, মুদ্রা আর স্ত্রী সহবাস মৈথুন বুঝবে। আসল মানেটা বুঝতে পারবে না। কিন্তু একটা সময় পর তন্ত্রের অবনতি ঘটে; আর এরজন্য দায়ী তৎকালীন কিছু দক্ষিণাচারী মানুষ। এদের দ্বারাই মূলত তন্ত্র সাধনার পীঠগুলোতে সাধারণ মানুষের অনধিকার প্রবেশ ঘটল। যে-সাধনার নাম মুখে আনাও বারণ ছিল, যে পঞ্চ ম-কার সাধনা কেবলমাত্র দিব্য গুরুর আয়ত্তে ছিল— সেই সাধনার ঘর সর্বসাধারণের জন্য খুলে যায়। মুষ্টিমেয় সাধকের ধর্ম পরিণত হল সাধারণের ধর্মে। মানুষ সেই সময় তন্ত্র মানেই স্থূল পঞ্চ ম-কার সাধনা মনে করত। সাধনার নামে শুরু হল যথেচ্ছ মদ-মাংস এসব নিয়ে লাম্পট্য আর অবারিত যৌনাচার। মৈথুনের মানে গিয়ে দাঁড়াল স্ত্রী-সহবাস। সেটাই সাধনার অঙ্গ হয়ে গেল। এই সময় সারা পূর্বাঞ্চলে সাধু-সন্নাসী মানেই ধরা হতো তান্ত্রিক সাধু। এরা তুকতাক দেখিয়ে, চিটিমন্ত্রে বশীকরণ করে, বিদ্বেষণ, উচ্চাটণ এসব করে করে,

মানুষকে সহজেই ভড়কে দিতে লাগল। মানুষ এদের মান্যগণ্য করতে করতে লাগল। সহজেই এদের চ্যালা চামুণ্ডাও জুটে গেল। বিশুদ্ধ তন্ত্র, তার গৌরব হারিয়ে একটা সময় পরিণত হল কামশাস্ত্রের নামান্তর হিসেবে। যে দিব্য সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল "সোহহং জ্ঞান", মানে, নিজের দেহস্থ আত্মাকে গভীরভাবে অনুভব করা; সেই সাধনা গিয়ে পৌঁছাল যথেচ্ছ যৌনাচার আর কামাচারে। অতএব বুঝতেই পারছেন আপনি, পিয়াসী বক্সী মেয়েটাকে অপহরণ করা হয়েছিল সির্ফ, ভৈরবী চক্র বানিয়ে, পঞ্চ ম-কার সাধনার নামে মেয়েটার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করে, সবশেষে শয়তানের সামনে বলিদানের উদ্দেশ্যে। এখানেই সমস্যাটা। মূর্তিটায় বৌদ্ধ দেব-দেবীর বৈশিষ্ট্য প্রকট হলেও, নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এটা কেবলমাত্র ওই দেব-দেবীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিপরীতধর্মী একটা অশুভ রূপমাত্র। অথচ এই শয়তানের পূজায় ব্যবহৃত হচ্ছে বিশুদ্ধ ভৈরবী চক্র আর পঞ্চ ম-কার সাধনা। এখানে একই সঙ্গে হিন্দু কুলার্নবতন্ত্র আর বৌদ্ধতন্ত্র যেন মিলেমিশে গেছে। অথচ এটা হওয়ার কথা না। তাই আপনাকে বলছি এই মূর্তিটা, এই ছবিটা অশুভ। এই শয়তানকে আমি জাগতে দেখেছি। এ আবার জেগে উঠলে ঘোর বিপদ। আমি এর উৎস জানি না; এর পরিচয় জানি না। শয়তানের পরিচয় কেবল শয়তান। আলাদা করে কোনও পরিচয় হয় না। আপনি এই মূর্তি, এই থাংকা নষ্ট করে ফেলুন, ফেলে দিন বা পুড়িয়ে ফেলুন। কিন্তু ঘরে রাখবেন না। এত কথা আপনাকে বলতাম না। শুধু ঘটনার ব্যাপকতা বোঝাতে এতগুলো কথা আপনাকে এখানে এসে বলা।"

এতক্ষণ টানা কথা বলে বলে ভদ্রলোক হাঁপিয়ে গেছেন। উনি দম নেওয়ার জন্য একটু থামলেন। উর্বাক্ষু কী বলবে বুঝে পারছিল না। সত্যি সত্যি কথাগুলো সরাসরি সাধারণ যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না। আবার বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হয় বৃদ্ধের শান্ত চাহনির দিকে তাকিয়ে।

উর্বাক্ষু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করল বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্যের আচরণে একটা পরিবর্তন এসেছে। ভদ্রলোক কিছু একটা জিনিসে যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন। মুখ পানশে বিবর্ণ হয়ে গেছে মুহূর্তে। হাত আর ঠোঁট যেন সামান্য কাঁপছে ওনার। কিছু একটা বলতে চেয়েও, বলতে পারছেন না যেন। একটা অস্থিরতা ওনার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। উর্বাক্ষু

জিজ্ঞেস করল, আপনি ঠিক আছেন? শরীর খারাপ লাগছে না-কি আপনার?”

“না আমি ঠিক আছে। হঠাৎ করে কেমন একটা...” কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন ভদ্রলোক। তারপর উর্বাক্ষু ঘরের একটা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, “আপনার ঘরে খুব উঁইয়ের মাটি উঠেছে। দেওয়াল বেয়ে বেয়ে লম্বা লম্বা করে। এগুলো পরিষ্কার করেন না কেন?”

বৃদ্ধের কথায় উর্বাক্ষু একটু অবাক হয়। কারণ উঁইয়ের মাটি ঘরে জমার কথা না। কারণ উর্বাক্ষুর এই ফ্ল্যাটটা আগের বছরই নেওয়া। একদম নতুন। ড্যাম্পের প্রবলেমও নেই। পেছনে ঘুরে উর্বাক্ষু দেখতে গিয়ে নিজেও চমকে উঠল। সত্যি কথা। সমস্ত ঘরের দেওয়াল জুড়ে লম্বা লম্বা লাইন মতো করে উঁইয়ের মাটি এল কোথা থেকে? ওর ভালোমতো মনে আছে এটা আগে কখনও দেখেনি। দেখলে মনে থাকত। অথচ যেভাবে সমস্ত দেওয়াল জুড়ে উঁইয়ের মাটিগুলো উঠে গেছে, তাতে নজর এড়ানোর কথা না। কী একটা বলতে গেল উর্বাক্ষু; হঠাৎ বৃদ্ধের দিকে নজর পড়তেই দেখল বৃদ্ধের চোখ দুটো উত্তেজনায় চকচক করছে। ঠোঁটের কোনাটা হালকা মতো কাঁপছে। আর চেয়ারে পাথরের মূর্তির মতো শক্ত হয়ে বসে আছেন ভদ্রলোক। মুখ ভাবলেশহীন; দৃষ্টি পাশের দেওয়ালের দিকে। ব্যাপারটা বুঝতে না-পেরে বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে উর্বাক্ষুও পাশের দেওয়ালের দিকে তাকাল। আর তাকানো মাত্রই চমকে উঠল ও।

পাশের দেওয়ালে একটা মুখের আদল ফুটে উঠেছে। কিন্তু সেই আদল কোনো মানুষের চেনা আদল নয়; সেটা একটা শয়তানের মুখাবয়ব। আর যে জিনিসটাকে এতক্ষণ ওরা উঁইয়ের মাটি ভেবেছিল, ওটা উঁইয়ের মাটি না। দেওয়াল জুড়ে, মাকড়সাড় জালের মতো ক্রম বিস্তার করেছে নিকষ ঘন কালো ধোঁয়ার রেখা। দূর থেকে হঠাৎ করে দেখলে উঁইয়ের মাটি বলেই মনে হয়। উর্বাক্ষু কিছুটা ঘাবড়ে যায় এই ঘটনায়। ওর সামনে বসে থাকা বৃদ্ধ সাধুর চোখ চকচক করছে উত্তেজনায়। আগের দিনের মতোই ওনার ঠোঁটের কোনাটা হালকা হালকা কাঁপছে। উনি কি কিছু বলতে চেষ্টা করছেন, অথচ বলতে পারছেন না? বুঝতে পারছে না উর্বাক্ষু। এখন ওদের দু-জনেরই নজর সামনের দেওয়ালটার ওপর। বিকেলের আলো কেটে হঠাৎ করে যেমন সন্ধ্যা নেমে আসে, উর্বাক্ষুর এই বসার ঘরটাকেও এখন কেমন জানি অন্ধকার অন্ধকার লাগছে। বাল্ব জ্বলছে ঠিকই। কিন্তু ওই কালো

মিশমিশে ধোঁয়ার রেখাগুলো যেন সমস্ত আলো শুষে নিচ্ছে নিজের শরীরে। আর ক্রমশ এক দেওয়াল থেকে আরেক দেওয়ালে ডালপালা বিস্তারের মতো ছড়িয়ে পড়ছে কালো ধোঁয়ার রেখা।

উর্বাক্ষু চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল; চাপা গলায় আতঙ্কের ছাপ, "এটা কী! কী হচ্ছে এসব?"

বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্য কোনও উত্তর দিলেন না। উত্তর না-পেয়ে উর্বাক্ষু ওনার দিকে তাকিয়ে দেখে ভদ্রলোক বিড়বিড় কী একটা মন্ত্র জপ করছে। ওনার চোখ খোলা, শরীরটা পাথরের মতো শক্ত; শুধু ঠোঁট জোড়া মৃদু কাঁপছে।

উর্বাক্ষু ভদ্রলোকের দিক থেকে নজর ফিরিয়ে আবার দেওয়ালটার দিকে তাকাল। দেওয়ালের মুখের আদলটা এবার ক্রমশ জমাট হয়ে একটা মুখের আকার নিয়েছে। একটা শয়তানের মুখের আদল। এই মুখ উর্বাক্ষু আগেও দেখেছে। এটা মূর্তি বা থাংকায় দেখা সেই শয়তান অপদেবতার মুখ!

মুখটা দেওয়ালের গায়ে আদল তৈরি করে এবার যেন ক্রমশ দেওয়াল ছেড়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। ধোঁয়ায় গড়া মুখ; কী বিভৎস চোখের চাহনি! বিশাল হাঁ-মুখটা থেকে বেরিয়ে এসেছে লকলকে একটা সরু মতো জিভ। মাথার ওপর পাঁচটা নর কঙ্কাল।

এবার আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না উর্বাক্ষু। চিৎকার করে উঠলো, "কিছু বলুন! কী করব এখন?"

বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্যের সেই মন্ত্র নিশ্চিতভাবে কাজ করছে না। উনি নিজেও কিছুটা ঘাবড়ে গেছেন। ফটোর মধ্যে দিয়ে পিয়াসীকে খুঁজতে গিয়ে সেদিন হয়তো বিরুপাক্ষবাবু এই ধুম্র শয়তানকেই দেখেছিলেন; সেটাকেই উনি ছায়া মূর্তি বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তখন ওসব কথা বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল না। কিন্তু আজকে... ঘরের মধ্যে যেন একটা ঝড় শুরু হয়েছে। তীব্র একটা হাওয়া বইছে সমস্ত ঘর জুড়ে। আর তার সঙ্গে ঘর জুড়ে একটা জমাট অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। যেন আলো ঢেকে দিয়েছে কালো মেঘের আস্তরণ। শিরশিরে বাতাসে একটা সোদা গন্ধ ভেসে আসছে। উর্বাক্ষু বা বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্য দু-জনেই উঠে দাঁড়িয়েছে। উর্বাক্ষু ধুম্র শরীরটার দিকে

এগোতে যাচ্ছিল। বিরুপাক্ষবাবু উর্বাক্ষুর জামার হাতা ধরে টেনে পেছনের দিকে নিয়ে এল। চাপা গলায় ধমকে উঠলেন, "যাবেন না ওদিকে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন এখানে।"

উর্বাক্ষুর কেন জানি মনে হচ্ছে বিরুপাক্ষবাবুর সমস্ত কথা ঠিক। ওনার সব কথাই অক্ষরে অক্ষরে মানতে ইচ্ছা করছে উর্বাক্ষুর। উর্বাক্ষু আর এগোল না। ধুম্র শয়তানের আদল দেওয়াল থেকে বেরিয়ে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে। এবার উর্বাক্ষু সেই শয়তানের পুরো আদলটা দেখতে পেল চোখের সামনে। ঘন ধোঁয়া দিয়ে তৈরি কুচকুচে কালো সুঠাম দেহ। দাঁতাল মুখের থেকে লোল গড়িয়ে পড়ছে। উর্বাক্ষুর মাথা কাজ করছে না। ওই মুখের দিকে তাকালে নিমেষে যেন রক্তশূন্য হয়ে যায় সমস্ত শরীর। কী করবে ভাবছে উর্বাক্ষু। আর ঠিক তক্ষুনি বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্য এগিয়ে গিয়ে ধোঁয়ার শরীরটা লক্ষ্য করে সশব্দে চিৎকার করে ওঠেন একটা সংস্কৃত শ্লোক। কিন্তু ধোঁয়ার আদলের কোনো ফারাক হল না এতে। বিরুপাক্ষ বাবু নিজেও বুঝতে পারছেন ওনার কোনও টোটকাই কাজ করছে না এই শয়তানের সামনে। উর্বাক্ষু কিছু একটা করতে যাচ্ছিল। আর তখনই চোখের নিমেষে সেই শয়তানটা ওর নিকষ বলিষ্ঠ হাত দুটো দিয়ে চেপে ধরল বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্যের গলা। তারপর গলা ধরে ওনাকে শূন্যে উঠিয়ে নিল। যন্ত্রণায় ছটফট করছে বিরুপাক্ষ। উদ্ভ্রান্তের মতো হাত-পা এদিকে-ওদিক ছটফট করছেন। কিন্তু সেই বাহুবেষ্টনি থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না। উর্বাক্ষুর মাথা কাজ করছিল না। যুক্তি-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলছিল ও ক্রমশ। টেবিলের ফুলদানিটা তুলে নিয়ে সজোরে ঢিল মারে শয়তানটাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু গায়ে না-লেগে, ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ওপাশে গিয়ে পড়ে ফুলদানিটা। শয়তানটা এক হাতে গলা ধরে তুলে ধরেছে বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্যকে আর অন্য হাতটা একটা তলোয়ারের আকার নিয়েছে। আর সেই ধুম্র তলোয়ার ক্রমশ এগিয়ে আসছে বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্যের পেট লক্ষ্য করে; আর তক্ষুনি গোঙানির গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক, "মূর্তিটা উর্বাক্ষু! ওটা ভেঙে ফেল। নষ্ট করে দাও থাংকাটা... না-হলে মুক্তি নাই... সময় কম উর্বাক্ষু... তাড়াতাড়ি!"

উর্বাক্ষু লক্ষ্য করল ও তাকিয়ে থাকতে পারছে না। কেউ যেন শুকনা মরিচ গুড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে বাতাসে। জ্বালা করছে ওর দুই চোখ। তবু চোখ দুটো ডলতে ডলতে ও দেখছে শয়তানটা বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্যের শরীরের

কাছে ওর টিকালো নাকটা এনে গন্ধ শুকছে। যেন অনেক দিন বাদে আবার কাচা মাংসের গন্ধ পেয়েছে ও। মুষ্ঠির জোর ক্রমশ বাড়ছে। বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্য শ্বাস নিতে পারছেন না। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ; আর লকলকে জিভ দিয়ে লোল গড়িয়ে পড়ছে শয়তানটার। উর্বাক্ষু আর দ্বিতীয়বার ভাবার সময় নিল না। পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বালাতে গেল। কিন্তু প্রচণ্ড হাওয়ায় বার বার নিভে যাচ্ছে সেই লাইটার। কয়েকবার চেষ্টা করে ঘরের আরেক কোণে ছুটে গেল উর্বাক্ষু। হাতে সময় নেই। কোণে রাখা ছিল একটা কেরোসিন তেলের বোতল। সেটা তুলে নিয়ে থাংকাটা লক্ষ্য করে সজোরে ঢিল মারল উর্বাক্ষু। থাংকার ওপর কাঁচের বোতলটা পড়ে চৌচির হয়ে ভেঙে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে থাংকাটার সামনে গিয়ে সজোরে লাইটারটা জ্বালিয়ে, জ্বলন্ত লাইটারটা কেরোসিন তেলে জবজবে ভেজা থাংকাটার ওপর ছুড়ে ফেলল ও; আর অন্ধকার কেটে দাউদাউ করে উঠল থাংকাটা; আর সঙ্গে সঙ্গে উর্বাক্ষু লক্ষ্য করল শয়তানটা মুহূর্তের মধ্যে বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্যকে মুষ্ঠি থেকে মুক্তি দিয়েছে। পোড়া থাংকাটা কিছুটা গলেও ওর শক্তি কমিয়ে দিয়েছে। ঘরময় কেমন একটা উদ্ভ্রান্তের ছোটাছুটি মতো করছে ধুম্র শয়তানের ছায়াটা। তারপর কিছুটা সামলে নিয়ে উর্বাক্ষুর দিকে ক্রূর নজরে তাকালো ওই শয়তান। কী হিংস্র চোখের চাহনি! মুখের ভাবে অপর্যাপ্ত একটা নৃশংসতা। মাথার ওপরের পাঁচ-পাঁচটা নরমুণ্ড যেন জীবন্ত হয়ে উঠছে শয়তানের সেই তেজে। প্রায় সিলিং লাগোয়া মাথা, দীর্ঘদেহী ধুম্র রূপের একমাত্র লক্ষ্য এখন উর্বাক্ষু। শয়তানটা প্রথমে ঘাড়-মাথা নাড়িয়ে নিজেকে একটু ধাতস্থ করে নিল। তারপর ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে আসতে লাগল উর্বাক্ষুর দিকে। যেন কোনও কালো রাত্রি মুহূর্তে গিলে খাবে উর্বাক্ষুর কাঁচা কাঁচা মাংস। উর্বাক্ষু উদ্ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক করছে। মাথা ওর কাজ করছে না। এটাই কি তবে শেষ? যে জিনিসের অস্তিত্ব ও চিরকাল অস্বীকার করে এসেছে, শেষে সেই শয়তানের হাতেই কি ওর মৃত্যু? ভেতর ভেতর শিউড়ে উঠছে উর্বাক্ষু। এক মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে ভেসে উঠল গ্রামের বাড়ি, মায়ের মুখটা। আর কখনও হয়তো দেখা হবে না চেনা লোকদের সঙ্গে। হঠাৎ পাশ থেকে মেঝেতে পড়া অবস্থায় চিৎকার করল বিরুপাক্ষ বাবু, “মূর্তিটা নষ্ট করে ফেলো!”

টনক নড়ে উর্বাক্ষুর। মেঝের এককোণে পড়ে ছিল মূর্তিটা। আর এক

মুহূর্ত সময় নষ্ট না-করে শয়তানের মূর্তিটা দু-হাতে তুলে ধরে মেঝেতে সজোরে আছাড় মারল উর্বাক্ষু। মেঝের সঙ্গে ধাক্কা খেতেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল মূর্তিটা। আর সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ার মতো শয়তানের আদলটা উর্বাক্ষুর সামনেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ঘটনাটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওদের চোখের সামনে ঘটে গেল। নিস্পৃহ নিষ্পলক দৃষ্টিতে উর্বাক্ষু বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্যের দিকে তাকাল। ভদ্রলোক মেঝেতে শুয়ে আছে। জ্ঞান আছে; কিন্তু আঘাত লেগেছে বেশ কিছু জায়গায়। এবার দেওয়ালের দিকে নজর গেল উর্বাক্ষুর। দেওয়ালে কোনও মুখের আদল আর দেখা যাচ্ছে না। এমনকি কোনও উইয়ের মাটির মতো লম্বা লম্বা দাগও নেই। ঘরের বাতাসও স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আলো ফিরে এসেছে। সামনে টেবিলের ওপরটায় দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। সেই আগুনে পুড়ছে সেই অভিশপ্ত থাংকাটা। উর্বাক্ষু ছুটে গিয়ে বাথরুম থেকে এক বালতি জল এনে ঢেলে দিল আগুনের ওপর। আগুন নিভল না। আরো কয়েকবার জল এনে ঢালতে আগুন নিভল। ইতিমধ্যে বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্য নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। উর্বাক্ষু চাপা স্বরে বলল, "আপনি আজ রাতটা এখানেই থাকুন।"

"না আমাকে যেতে হবে... এখনই বেরোতে হবে।"

উর্বাক্ষু বাধা দিতে যাচ্ছিল কিন্তু কাজ হলো না কিছু। বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছে। তবে বৃষ্টির বেগ কিছুটা হলেও কমেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। গোলাপি আলো চিলিক দিচ্ছে কালো আকাশের গায়ে। দ্রুত পায়ে হেঁটে বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্য বেরিয়ে গেলেন উর্বাক্ষুর বাসা থেকে। যাওয়ার আগে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন ওই পোড়া থাংকার কালচে টুকরোগুলো।

ভদ্রলোককে দেখে বিন্দুমাত্র বোঝার উপায় নেই কিছুক্ষণ আগে ওনার সঙ্গে কী বিভীষিকাময় ঘটনা ঘটেছিল।

ঝড়বৃষ্টির রাতের একটা আলাদা ছায়া থাকে। সেই ছায়া যেন আরো বেশি বেশি ঝড়জলের রাতগুলোকে চলমান অশরীরীর মতো দেখায়— আরো বেশি অন্ধকার; আরো বেশি রোমাঞ্চ। প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে। মানুষকে রহস্যে ঘিরে রাখতে ভালোবাসে। সেরকম কালো মতো একটা ছায়া উর্বাক্ষুর গায়ে এসে পড়েছে যেন। রাস্তায় আলো জ্বলছে না। দু-পাশের গাছগাছালির পাতা হাওয়ায় ঝাপটা দিচ্ছে। পিচের রাস্তায় জল জমেছে। চারদিকে কেমন একটা কাদামাটি মাখা পথঘাট। ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে কোনও নর্দমা

থেকে। আর রাস্তার সেই জমা জল কেটে কেটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্য। দরজা খোলামাত্র শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়ার ঝোঁক ঘরে এসে ঢুকল। বদ্ধ ভাবটা নিমেষে কেটে গেল ঘরের ভেতরের। সঙ্গে একটা ভেজা মাটির গন্ধ। এই গন্ধটা উর্বাক্ষুর খুব প্রিয়। পেছন থেকে ঘরের আলো এসে পড়েছে বাইরের উঠানে কিছুটা। আধ খোলা দরজার মুখে একা একটা ছায়ামূর্তির মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে উর্বাক্ষু।

স্বপ্ন

শিলিগুড়ি,

২০১৯

১

"আমার কানে একটা অদ্ভুত নাম ভেসে আসছে। চেনা কোনও নাম না। এরকম কোনও নাম আগে কখনও শুনিনি। এমনকি সেটা আদৌ কারও নাম নাকি, সে-ব্যাপারেও আমার সন্দেহ হয় এখন। কী ভাষায় সেটা উচ্চারণ করা হচ্ছে, সেটাও আমি বুঝতে পারছি না। এখন যেরকম শার্ট-প্যান্ট পরে আছি, তখন আমার গায়ে এরকম প্যান্ট-শার্ট কিছুই পরা ছিল না। তাঁর বদলে আমার গায়ে কেমন একটা বেগুনি রঙের নকশা আঁকা কাপড়ের পোশাক পরা ছিল। আমার গায়ের পোশাকে আঁকা এই ধরনের নকশাগুলো আমি আগে দেখিনি কখনও। কোনও চেনা নকশা না ওগুলো। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কয়েক-শো লোক ভিড় করে আছে। ওদের পোশাকগুলোও অদ্ভুত ধরনের। মানে এখনকার দিনের মতো না। অনেকটা আদিম মানুষেদের মতো। আবার ওরা ঠিক আদিম মানুষ না। অনেকের মুখে লাল-সাদা রং করা, আমার মতোই নকশা আঁকা কাপড়ের পোশাক গায়ে। কারও কারও খালি গা, পরনে কোঁচানো ধুতি মতো গুটিয়ে নিয়ে পরা। সামনে লম্বা একটা পিরামিডের মতো স্ট্রাকচার। কয়েক-শো সিঁড়ি স্টেপ বাই স্টেপ উঠে গেছে ওপরে; আর সেই পিরামিডের নীচে ভিড় করে আছে কয়েক-শো মানুষ। আর সবাই সেই অদ্ভুত নামটা উচ্চারণ করে সমস্বরে চিৎকার করছে। ওই ভিড়ের মধ্য দিয়েই, ভিড় ঠেলে ঠেলে একটা মাচার মতো কিছু একটা করে আমাকে নিয়ে আসা হল পিরামিডটার সামনে। আমাকে চারপাশের মানুষজনের শোরগোল চিৎকার যেন আরো

কয়েকগুণ বেড়ে গেল। যে মাচা টাইপের জিনিসটা করে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেটা বয়ে নিয়ে চলছে কতোগুলো বাঘ। কিন্তু চারপায়ের বদলে, ওরা দু-পায়ে হাঁটছে; আর বাকি দুটো পা-কে ওরা হাতের মতো ব্যবহার করে, মাচাটাকে ধরে ধরে এগিয়ে চলছে। বাঘগুলো বাদেও, ওখানে বেশ কয়েকটা বিশাল বড়ো বড়ো পাখি ছিল। কোনও পাখি যে আকারে এত বড়ো হতে পারে, সেটা এর আগে কোনোদিন দেখিনি... আর জানতামও না। মানুষের আকৃতির লম্বা লম্বা সুঠাম চেহারার কতগুলো রংবেরঙের শিকারি পাখি... ভিড় করা মানুষজনের মধ্যে দিয়েই দু-পায়ে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে এদিকে-ওদিকে। মানুষগুলো বাঘ বা পাখিগুলোকে দেখছে। কিন্তু ওদের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে কেউ ঘাবড়ে যাচ্ছে না। দেখে মনে হচ্ছে, যেন এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করছিলাম— বাঘ কি হাঁটতে পারে? কিংবা সামনের দুটো পা দিয়ে কি এরকম মানুষের মতো হাতের কাজ করতে পারে? অত বড়ো বড়ো আকারের শক্তপোক্ত পেশিবহুল চেহারার রংবেরঙের পাখি কি আদৌ হয়? পাখির ব্যাপারটা বলি... ওগুলো কী পাখি ছিল, সেটাও দেখলাম ঠিক করে চিনতে পারছি না আমি। মাচা করে আমাকে ওই পিরামিডটার সামনে আনা হল। পিরামিডটা ঠিক পিরামিডের মতো দেখতে না। পিরামিডটা কয়েকটা ধাপের পর পর স্তরে স্তরে ভাগ হয়ে হয়ে খাড়া উঠে গেছে। মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা। কিছু কারুকার্য মনে আছে... ইগল, শঙ্খ, সাপ, ব্যাঙ... ডিজ়াইন করে খোদাই করা। সামনে খাড়া উঠে যাওয়া স্টেপ বাই স্টেপ সিঁড়ি। পেছনে তুমুল চিৎকার। মানুষজন কারও একজনের নাম উচ্চারণ করে জয়ধ্বনি দিচ্ছে মনে হল। যদিও পুরোটাই আমার অনুমান। সেই ভাষাটা আমি বুঝতে পারছি না। কোনোদিন শুনিওনি সেই ভাষা। জায়গাটাও আমি চিনি না। এরকম অদ্ভুত পোশাকের মানুষ, দু-পায়ে হেঁটে-চলে বেরানো বাঘ, মানুষের আকৃতির পাখি, আর এরকম পিরামিড... মনে হচ্ছিল আমাদের জগতের বাইরের অন্য কোনও জগতে এসে পড়েছি আমি। এই জগতের মানুষজন, পশুপাখি, নিয়মকানুন, আচারবিচার সব আমাদের জগতের থেকে অনেকটা আলাদা। এখানে কিছুই যেন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম মেনে হয় না। এরকম কোনও জায়গা আগে কখনও কোনও ওয়েবসিরিজ বা সিনেমায় দেখেছি বলেও মনে পড়ছে না।

"সিঁড়ি বেয়ে আমাকে ওপরে ওঠানো হচ্ছে ক্রমশ। একদম ওপরে দুটো বিশাল প্রাসাদ মতো স্ট্রাকচার। মনে হয় কোনও মন্দির জাতীয় কিছু। কিন্তু এই মন্দির আমার চেনা কোনও মন্দির না। কীসের মন্দির সেটাও বুঝতে পারছি না। ওই মন্দির দুটোর গায়ে রঙিন ছবি আঁকা; অনেকটা প্রাচীনকালের গুহাচিত্রের মতো। মন্দিরটার সামনের খোলা উঠানের ঠিক সামনে একটা প্রকাণ্ড পাথরের বেদি মতো রাখা। সেটাকে ঘিরে পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। মাচা থেকে নামিয়ে আমাকে ওই বেদিতে চিৎ করে শোয়ানো হল। আমার মুখটা আকাশের দিকে সোজাসুজি। ভালো করে তাকাতে পারছি না। দুপুরের গনগনে রোদের তাপ এসে পড়ছে মুখে। মাচা থেকে আমাকে নামিয়ে ওই বাঘগুলো সিঁড়ি দিয়ে দু-পায়ে মানুষের মতোই হেঁটে হেঁটে নীচে নেমে গেল। ওরা নীচে নামতেই, হঠাৎ চারজন লোক চারপাশ থেকে আমার হাত-পা চেপে ধরল। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। ভীষণ ভয় করছিল। আমি ছটফট করছিলাম। হাত-পা নাড়ানোর চেষ্টা করছিলাম; কিন্তু ঠিকভাবে নড়তে-চড়তে পারছিলাম না। ওরা চারজন আমার হাত-পা শক্ত করে ধরে রেখেছিল বেদির ওপর। এরপর একজন দীর্ঘদেহী মাঝবয়সি লোক আমার সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটার সমস্ত মুখে কুচকুচে কালো রং করা। কানের লতিতে লাল লাল রঙের কী একটা লাগানো। লম্বা চুল। লোকটার হাতে ধারাল ছুরির মতো একটা অস্ত্র। সেই অজানা ভাষায় কী একটা শব্দ তারস্বরে উচ্চারণ করে, আমার চোখের সামনেই লোকটা ওর হাতের ছুরিটা শূন্যে উঠিয়ে, সজোরে আমার বুকে বিঁধিয়ে দিল। তারপর সেটা ওপর দিকে টেনে নিয়ে, তারপর নীচের দিকে নামিয়ে আনল। আমি দেখতে পাচ্ছি, বুকের মধ্যে একটা গভীর কাটা দাগ তৈরি হয়েছে। সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। লোকটা ওই কাটা দাগটায় আঙুল দিয়ে দু-দিকে চাপ দিল। জায়গাটা আরো চওড়া হয়ে গেল। ছুরিটা দিয়ে আরো কিছুটা লম্বালম্বি কেটে ফেলল বুকের অংশটুকু। তারপর আমার চামড়া, মাংস, পাঁজরের হাড়ের খাঁচার ভেতর থেকে টান দিয়ে বের করে আনল আমার হৃদপিণ্ডটা। হৃদপিণ্ডটা দগদগ করছে, কাঁচা রক্ত চুইয়ে পড়ছে তখনও ওটা দিয়ে। আমি বুঝতে পারছি না হৃদপিণ্ড ছাড়াও আমি বেঁচে আছি কীভাবে? অথচ এতকিছুর পরও আমি বেঁচেছিলাম আর সমস্তটা নিজের চোখে দেখছিলাম। হৃদপিণ্ডটা বের করে এনে লোকটা নীচে ভিড় করা মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে সেটা ওপরের

দিকে তুলে ধরল; আর নীচে ভিড় করা মানুষগুলোর চিৎকার আরো দ্বিগুণ হয়ে গেল। ওদের চোখে মুখে খুশির আভাস স্পষ্ট। ওরা আবার কারও একটা নাম করে সমস্বরে জয়ধ্বনি করছে। এরপর যেটা দেখলাম সেটা আমি সহ্য করতে পারলাম না। সামনের দীর্ঘদেহী লোকটা চিৎকার করে একটা অজানা ভাষায় কী একটা উচ্চারণ করল; আর সেটা উচ্চারণ করার পর পরই লোকটা আমার সামনে আমার কলজেটায় একটা কামড় বসাল। ঘেন্নায় আমার গা গোলাচ্ছিল। লোকটার কালো কুচকুচে মুখটার দিকে তাকানো যাচ্ছে না। সেই মুখটায় এখন চ্যাটচ্যাটে রক্ত-মাংস মাখামাখি হয়ে একাকার হয়ে আছে। নীচে ভিড় করা লোকগুলো তারস্বরে চিৎকার করে চলেছে। এবার ওই চারজন যারা আমার হাত-পা ধরেছিল, ওরা এগিয়ে আসল আমার দিকে। ওদের সবার হাতে ধারাল ছুরি। এক এক করে ওরা আমার শরীর থেকে কান-নাক-জিভ-কেটে ফেলল। তারপর ওদের মধ্যে একজন একটা অদ্ভুত অস্ত্র দিয়ে আমার শরীর থেকে গলাটা আলাদা করে দিল। কিন্তু কী অদ্ভুত... তখনও আমি সমস্তটা দেখতে আর বুঝতে পারছি। এমনকি আমি অনুভবও করতে পারছি সবটা। আমার মুণ্ডহীন শরীরটা দু-জন চ্যাংদোলা করে পিরামিডের খাদের ধারে নিয়ে গিয়ে, ঢিল মেরে নীচে ফেলে দিল; আর আমার কাটা মাথাটা ওদেরই একজন হাতে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। ভেতরে কুঠুরিমতো একটা ঘর। এই ঘরটারও দেওয়ালে রং দিয়ে আঁকিবুঁকি আছে। ভেতরে একটা র্যারকের মতো জিনিস রাখা। সেখানে সারি সারি কাটা মাথা সাজানো আছে। ওরই একটা জায়গায় আমার মাথাটা ওরা রেখে দিল। ঘরের ফাঁক দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি আকাশের গায়ে কতগুলো বাংলা অক্ষর ভাসছে। মনে আছে এখন অক্ষরগুলো... ও, ক, ঞ, ঘ, ঝ, জ আর দ...”

নিজের কথাটা শেষ করে একটু থামল নীল। ঘরে এসি চালানো আছে; তবু ছেলেটা ঘামছে। সামনে সাইক্রিয়াইটিস ডঃ কিগান চক্রবর্তী। এতক্ষণ কিগান নীলের সব কথা খুব মন দিয়ে শুনছিল। মাঝে মাঝে কিছু কিছু জিনিস নোট ডাউন করে রাখছিল। নীল বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল; অথচ এতক্ষণ এতগুলো নৃশংস ঘটনা বর্ণনা করার সময় ওর ঠোঁট একবারের জন্যও কাঁপেনি। এরকম কিছু বর্ণনা করার সময় অনেকের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পালটে যায়; নার্ভাস হয়ে পড়ে অনেকে। কিন্তু না। নীলের মধ্যে এরকম

কোনও লক্ষণ কিগান লক্ষ্য করল না; বরং স্বপ্নটা বর্ণনা করার সময় নীল যথেষ্ট স্বাভাবিকভাবেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিগানকে বলল। চোখের চাহনি শান্ত, কন্ট্রোলড, হাত-পা খুব বেশি নাড়াচ্ছে না কথাটা বলার সময়; অতএব ও বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলছে না। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের ছেলে নীল। শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়ার ওদিকে থাকে। কিছুদিন থেকে ঘুমালেই এরকম কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছে ও; আর সেটা নিয়েই কিগানের কাছে এসেছে। নীলের সঙ্গে ওর মা নীরা দস্তিদারও এসেছেন। যদিও এখন উনি বাইরে রিসেপশনে অপেক্ষা করছেন। কিগান মনে করে, পেসেন্টের সঙ্গে গার্জেন অ্যালাও করলে, পেসেন্ট মন খুলে সমস্তটা সাইক্রিয়াইটিসের কাছে বলতে সংকোচ করে। অনেকের অনেক ব্যক্তিগত কথা বলার থাকে। অনেকক্ষেত্রেই চিকিৎসা করতে করতে অনেক ব্যক্তিগত কথা উঠে আসে। তখন রোগী সেটা বাড়ির কারও সামনে সাইক্রিয়াইটিসকে বলতে অস্বস্তি বোধ করে। এতে আখেরে ট্রিটমেন্টটা ঠিকঠাকভাবে হয় না। এতক্ষণ নীল যখন কিগানকে স্বপ্নের দৃশ্য বর্ণনা করছিল, নীলের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে কিগান কোনও অস্বাভাবিকতা দেখেনি; শুধু একটা জিনিস বাদে। একটা বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের একটা ছেলে স্বপ্নে নিজেকে খুন হতে দেখেছে; তা-ও আবার এত নৃশংসভাবে। তা-ও ওর চোখে-মুখে কোনও তাপ-উত্তাপ নেই ঘটনাটা বর্ণনা করার সময়।

কিগান জিজ্ঞেস করলো, "তারপর?"

নীল এবার একটু ইতস্তত করে উত্তর দিলো, "ঘুম ভেঙে গেল... ধরফর করে আমি উঠে দেখি আমার বেডরুমে আমি শুয়ে আছি। দরদর করে ঘামছিলাম। বুকের ধুকপুকানিটা কিছুটা বেড়ে গেছিল। কিছুক্ষণ পর বুঝলাম, আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। খারাপ একটা স্বপ্ন। কিন্তু একটু ধাতস্থ হতেই ঘরের আশপাশটা দেখে চমকে উঠলাম। কীভাবে কী হল সেটা আমার ব্যাখ্যার বাইরে। আমি দেখি আমার বেডরুমের সমস্ত দেওয়ালে, মেঝেতে কীরকম অদ্ভুত সব ছবি আঁকা, লেড পেন্সিল দিয়ে ঘষে ঘষে কেউ এঁকে রেখে গেছে... ঠিক যখন আমি ঘুমাচ্ছিলাম। এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কারণ ঘুমানোর আগে ওসব কিছুই আঁকা ছিল না। আঁকাগুলো দেখে আমি অবাক। কোনও ব্যাখ্যাই মাথায় আসছিল না। আমার ঘরের দেওয়ালে-মেঝেতে যে আঁকাগুলো ছিল, ঠিক এরকম আঁকাগুলোই আমি

স্বপ্নের মধ্যে ওই মন্দির দুটোর গায়ে খোদাই করা দেখেছিলাম।"

"তুমি ছবি তুলেছ আঁকাগুলোর নীল?"

"হ্যাঁ তুলেছি। দেখাচ্ছি। ওয়েট..." নীল মোবাইল বের করে গ্যালারি থেকে একটা ছবি বের করে কিগানের হাতে মোবাইলটা দিল।

মোবাইলের ছবিটা একঝলক দেখলে মনে হয়, কোনও বাচ্চা ছেলে দুষ্টুমি করে, সমস্ত বাড়ির দেওয়ালে-মেঝেতে চারকোল পেন্সিল দিয়ে এঁকে রেখে গেছে ওসব আঁকা। ঘাসের মতো খোঁচা খোঁচা একটা পেনসিল স্ট্রোক, তার ওপর লম্বা লম্বা কী একটা। একপাশে দেওয়ালে ছোটো ছোটো কয়েকটা মানুষের মতো ফিগার আঁকা; আর তার সামনাসামনি আরেকটা বড়ো আকৃতির ফিগার আঁকা— সেটার মাথায় পাগড়ি মতোন একটা কিছু; আর ওই ফিগারটার পাশেই আরেকটা ফিগার আঁকা— সেটার লম্বা লম্বা চুল, মুখের জায়গাটা ঘষে ঘষে কালো রং করা। সায়ন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিগুলো দেখল। ছবিগুলো আপাতদৃষ্টিতে দেখলে দেখতে লাগে, কোনও বাচ্চার হাতে আঁকা ছবি। কিন্তু এখানেও খটকা আছে। কারণ নীলদের বাসায় বাচ্চা কেউ নেই। মোবাইলটা ফিরিয়ে দিতে দিতে সায়ন নীলকে জিজ্ঞেস করল, "স্বপে তুমি এই আঁকাগুলোই দেখেছিলে?"

"হ্যাঁ, তবে ওগুলো রং করা ছিল... মানে এই ঘাসটার রং যতদূর সম্ভব হলুদ দেখেছিলাম। লম্বা লম্বা এই জিনিসগুলোর রং দেখেছিলাম নীল... নীলই মনে হচ্ছে দেখেছিলাম..."

"আচ্ছা বুঝলাম... এবার তুমি এরকম স্বপ্ন কতদিন থেকে দেখছ?"

"এর আগে দু-দিন দেখেছি।"

"একই স্বপ্ন?"

"না... আলাদা। তবে বিষয়টা মোটামুটি এক... দুটো স্বপ্নতেই আমি দেখি, আমাকে খুন করা হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা মিল আছে।"

কিগান নড়েচড়ে বসে কথাটা শুনে। কৌতুহল নিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কী?"

নীল বলে, "আমার স্বপ্নগুলো দেখার সময় মনে হয়, কেউ একজন আমার ওপর স্বপ্নের মধ্যে সজাগ নজর রাখছে। দুটো চোখ... স্বপ্নে আমি যেখানে যেখানে যাচ্ছি, কিংবা আমাকে যেখানে যেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে,

পুরো ঘটোনাগুলোর ওপরই সেই চোখ দুটো নজর রাখছে...”

“কী করে বুঝলে দুটো চোখ নজর রাখছে তোমার ওপর? তুমি চোখ দুটোকে দেখতে পাও স্বপ্নে?”

মাথা নাড়ে নীল, “না পাই না... কিন্তু আমি জানি... মানে আমি বুঝতে পারি ওই চোখ দুটো সর্বক্ষণ স্বপ্নের ভেতর আমাকে দেখছে। আমার গতিবিধির ওপর নজরদারি চালাচ্ছে। যেই আমি চোখ দুটোকে দেখার জন্য তাকাই... অমনি ওই দুটো ভ্যানিশ হয়ে যায়!”

“আচ্ছা বুঝলাম... আচ্ছা নীল প্রথম যেদিন তোমার এরকম স্বপ্ন এসেছিল ঘুমের মধ্যে, সেদিনের কথা এবার একটু শুনব তোমার কাছে... তুমি রেডি তো?”

মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায় নীল। তারপর নিজেকে কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে, আবার বলতে শুরু করল ও। কিগান লক্ষ্য করল, নীলের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আগের মতোই শান্ত স্বাভাবিক...

নীল বলে চলল, “প্রথম দিন যেদিন ওরকম দেখি, সেটা গত সপ্তাহের ঘটনা। লাইট অফ করে শুয়েছি। হঠাৎ আমার মনে হচ্ছিল কে যেন আমার কানের কাছে ফিসফিস করে কীসব বলছে। কী বলছে আমি বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছিল কোনও চেনা ভাষা না। আপনি দেখবেন, এরকম অনেক সময় হয়, যখন আপনি কোনও ভাষা শুনবেন, যেটা আপনি ব্যক্তিগতভাবে জানেন না... তবুও আপনার শুনে মনের মধ্যে একটা হালকা হালকা ধারণা জন্মাবে, এটা অমুক জায়গার ভাষা হতে পারে। কিন্তু আমি যে-ভাষার কথা বলছি, সেটা শুনে মনে হচ্ছিল, এটা এই জগতে কোনও ভাষা না... আমাদের চেনা পৃথিবীর বাইরের অন্য কোনও জগতের ভাষা ওটা। আমি একবর্ণও কিছু বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু একটা ফিসফিসানি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। অথচ জানেন, ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। মা-বাবা অন্য ঘরে। মা-বাবার ঘরটা একটু দূরে। সেখান থেকে আওয়াজ আসার কথা না। আমি উঠলাম। ঘরের লাইট জ্বালালাম। দেখি কেউ নেই ঘরে। আবার লাইট অফ করে শুলাম; কিছুক্ষণ পর থেকে আবার সেই ফিসফিসানি আওয়াজটা। কেউ আমার কানের কাছে ঠোঁট এনে কীসব যেন বলছে; আর চারপাশ থেকে কেমন একটা গমগম আওয়াজ হচ্ছে। মনে হচ্ছিল একসঙ্গে অনেকে

যেন মিলে কোনও একটা অজানা বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। সেই বাদ্যযন্ত্র এই পৃথিবীর না... অন্য কোনও জগতের। এই আওয়াজ আমি চিনি না। চেনা কোনও বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ না। সেই আওয়াজ মুখে বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করতে করতে একটা সময় ঘুমিয়ে পড়লাম; আর তখনই স্বপ্নটা প্রথম দেখি। প্রথম দিন দেখি আমার সামনে মাটিতে একটা লাশ পড়ে আছে। আমি লাশটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। একমনে লাশটাকে দেখছি। লাশটার গায়ে কতগুলো বাংলা বর্ণ খোদাই করা ছিল। আমি সেগুলোই বিড়বিড় করে পড়ছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ একজন একটা ধারাল বর্শা দিয়ে আমার মাথায় বিঁধিয়ে দিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে সামনের ওই লাশটার ওপর লুটিয়ে পড়লাম। ব্যাস, ঘুম ভেঙে গেল! তখনই প্রথম মনে হল... যখন আমি বর্শাবিদ্ধ অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলাম, আমার মনে হয়েছিল, কেউ আমার ওপর নজর রাখছে। দুটো চোখ... নিঃশব্দে আমাকে দেখছে... অথচ ওর নিজের উপস্থিতি আমার কাছে টের পাওয়াতে চাইছে না...”

“স্ট্রেঞ্জ... আচ্ছা সেদিনও ঘুম ভাঙার পর মেঝেতে-ওয়ালে ওরকম ছবি আঁকা দেখেছিলে কিছু?”

“না, সেদিন ছিল না। এটা গতকাল রাতের স্বপ্নটার পরই হয়েছে। আগে হয়নি কখনও।”

“বুঝলাম। প্রথম দিন লাশটার গায়ে কী কী বাংলা বর্ণ দেখেছিলে মনে পড়ে?”

“সবকটা মনে নেই... কয়েকটা মনে আছে... ঞ, ঘ, ঝ... আরো ছিল... বাকিগুলো মনে পড়ছে না...”

“এবার দ্বিতীয় দিনের স্বপ্নটার ব্যাপারে বলো।”

“প্রথম দিন স্বপ্নটা দেখার ঠিক চারদিন পর দ্বিতীয় স্বপ্নটা দেখলাম। সেদিনও মনে হচ্ছিল কানের কাছে কেউ একজন ফিসফিস করে কিছু একটা বলছে। একটু নার্ভাস হয়েছিলাম প্রথম প্রথম, কিন্তু পরে আর পাত্তা দেইনি। সেদিনও ঘুমানোর পর দেখি, আমার সামনে একটা চিতা জ্বলছে। চিতার আগুনের ধক এসে আমার গায়ে লাগছে; আর আমি অবাক হয়ে দেখছি চিতার আগুন থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়াগুলো বাতাসে মিশছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, বাতাসে মেশার আগে, কতগুলো বাংলা বর্ণের আকার নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছিল। এবারও কয়েকটা বর্ণ আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ে। বাকিগুলো ভুলে গেছি। যে-ক'টা মনে পড়ে, তারমধ্যে ছিল— ও, ক, ঞ... আমি চিতার দিকে তাকিয়ে কাঁদছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে কে একজন এসে একটা কাপড় দিয়ে আমার গলা চেপে ধরল। আমি শ্বাস নিতে পারছিলাম না। ছটফট করছিলাম। চোখ ঘোলা হয়ে আসছিল। একটা সময় নাড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল আমার। তখনও... চোখের দৃষ্টি ঘোলা হয়ে যাওয়ার আগে, মনে হয়, কাপড়ের ভেতর থেকে আবছা আবছা দুটো চোখ দেখেছিলাম আমার ওপর নজর রাখছে। ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলাম না চোখ দুটোকে। কিন্তু আমি মনে মনে জানতাম, একবার দেখার চেষ্টা করলেই চোখ দুটো আড়াল হয়ে যাবে, আর আমি ওগুলোকে দেখতে পারব না। ব্যাস, তারপরই আমার ঘুম ভেঙে গেল..."

"তোমার দ্বিতীয় স্বপ্নটার সঙ্গে সতীদাহ প্রথাটার একটা মিল আছে। তবে শ্বাসরোধ করে মারার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না। আচ্ছা তুমি কি ইতিহাসের ছাত্র?"

"না, ইঞ্জিনিয়ারিং..."

"পুরাণ বা ইতিহাস বিষয়ে প্রচুর বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করো? কিংবা এসব বিষয়ের ওয়েব সিরিজ বা ডকুমেন্টারি খুব বেশি দেখো?"

"না না, ওসবে আমার ইন্টারেস্ট নেই এক ফোটাও।"

"অনেক সময় আমরা বইতে এমন অনেক কিছু পড়ি বা টিভিতে দেখি, যেটা আমাদের প্রচ্ছন্ন মনে থেকে যায়। সেটাই আমরা স্বপ্নে দেখি। তবে তোমার ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবতে হবে আমাকে। তোমার এরপরের ডেট সামনের শুক্রবার।"

নীল ঘাড় নাড়িয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে যাচ্ছিল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, "স্যার, এটা কি রিইনকারনেশন... মানে ওই জাতিস্মর-টাতিস্মর ধরনের কোনও কেস?"

কিগান হেসে নীলকে উত্তর দেয়, "মনোবিজ্ঞান জাতিস্মর বা রিইনকারনেশন থিওরিকে স্বীকৃতি দেয় না নীল। তুমি চিন্তা কোরো না। এসব কোনো ব্যাপার না। পরের শুক্রবার তুমি বিকাল পাঁচটা নাগাদ আসো।

আমি ডেটটা লিখে রাখছি ডায়েরিতে...”

নীল চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে গেলে, মুহূর্তে মুখের ভাব চেঞ্জ হয়ে যায় কিগানের। একটা ছেলে গত দু-সপ্তাহ ধরে স্বপ্ন দেখছে তাকে নানারকমভাবে বলি দেওয়া হচ্ছে। হিউম্যান স্যাক্রিফাইস। অথচ কোনও বইতে বা সিনেমায় ও এসব দেখেওনি... পড়েওনি। তাহলে?

নোট খাতাটা বের করে নীলের কেস খাতাটায় আরো একবার চোখ বোলাতে শুরু করল কিগান। বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে নীলের স্বপ্নগুলোয়। ঘেঁটে দেখতে হবে সেগুলো। স্বপ্ন অনেক সময় রূপক কিছু হয়ে ধরা দেয়। এক-একটা স্বপ্নের একেক মানে থাকে। আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা থাকে। স্বপ্ন ডিকোড করতে পারলে, অনেকক্ষেত্রেই যে স্বপ্নটা দেখছে, তাঁর মেন্টাল কন্ডিশন বোঝা সম্ভব। আচ্ছা... নরবলির স্বপ্ন কীসের রূপক তাহলে? না কি কেউ নীলকে রিসেন্টলি কোনও হুমকি-টুমকি দিয়েছে? আর... সেসব মাথায় ঘোরার কারণেই... কিন্তু নরবলি কেন?— ভাবতে ভাবতে কিগানের কপালে ফুটে উঠেছে হালকা চিন্তার ভাঁজ। পরমুহূর্তেই আরেকটা বিষয়ে খটকা লাগে কিগানের। তারপরই চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে ওঠে ও। নীলের কেস-খাতাটা খুলে আজকের কিছুক্ষণ আগে লেখা পাতাগুলো বের করে কিগান। যেটা খুঁজছে ও, সেটা খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না ওকে। চোখ দুটো চকচক করে ওঠে কিগানের। নীলের তিনটা স্বপ্নের মধ্যে আরেকটা বিষয় কমন আছে। সেটা নীল বলার সময় মিস করে গেছে, কিংবা ধরতে পারেনি। সেটা হল বাংলা বর্ণগুলো। প্রথম স্বপ্নে নীল যে-ক'টা বর্ণ দেখেছিল তাদের মধ্যে কয়েকটা হল— ঞ, ঘ, ঝ... দ্বিতীয় দিন যে-বর্ণগুলো নীল স্বপ্নে দেখেছে তারমধ্যে ছিল— ও, ক, ঞ... আর গতকালের স্বপ্নটায় ও দেখেছে মোট সাতটা বর্ণ— ও, ক, ঞ, ঘ, ঝ, জ আর দ। বর্ণগুলোর দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে কিগান নিজের মনে বিড়বিড় করে ওঠে, “এখানে, প্রথম আর দ্বিতীয় দিনের দেখা বর্ণগুলোর মধ্যে ঞ-টা কমন। বাকিগুলো নীলের মনে ছিল না। আমার মনে হয়, নীল প্রথম আর দ্বিতীয় দিনও স্বপ্নে এই একই সাতটা বর্ণ দেখেছিল। ওর মনে না-থাকায়, সেটা ও মেলাতে পারেনি। কিন্তু এই বর্ণগুলোর কি আলাদা করে কোনও মানে আছে? বর্ণগুলোকে পর পর বসিয়ে দেখলে কেমন হয়? কোনও অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি হয় কী? সেক্ষেত্রে সেই শব্দের অর্থটা খুঁজতে

পারলেই কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে...”

ভাবামাত্রই নোটখাতায় নীলের স্বপ্নে দেখা সাতটা বর্ণ পর পর বসিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ বানানোর চেষ্টা করে কিগান। এদিক-সেদিক করে প্রায় পনেরো মিনিট ঘাঁটাঘাঁটি করেও কোনও অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করতে পারল না ও। শেষে প্রায় হাল ছেড়ে দেয় কিগান। অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজে নিজেই জিজ্ঞেস করে, ‘এগুলো র‍্যানডাম কতকগুলো অক্ষর, না কি সত্যি সত্যিই কোনও মানে আছে? না-কি নীল কিছু মিস করেছে? হতেও তো পারে! কিন্তু ভুল করলে এতটা নিশ্চিত হয়ে নিশ্চয়ই বলত না ও। তাহলে? অনেক ভেবেও কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না কিগান। শুধু কতগুলো সম্ভাবনা ওর মাথায় খেলেই, আবার পরমুহূর্তেই উধাও হয়ে যায়।

২

নীলের সামনেরটা গাঢ় কুয়াশায় ঢাকা; আর সেই কুয়াশা ভেদ করে একটা পোড়া পোড়া গন্ধ ওর নাকে আসছে। কুয়াশা কেটে এগিয়ে চলেছে নীল। এবড়োখেবড়ো পাথুরে রাস্তা। মাঝে মাঝে সবুজ ঘাসের গোছ। কিছুটা এগোতেই গুঁড়ো গুঁড়ো ছাই নজরে পড়ল নীলের। রাস্তাটা ঢেকে গেছে পুরু জমাট ছাইয়ে। সেই ছাইয়ের ওপর পা দিলে, পা ডেবে যাচ্ছে। নীল সাবধানে পা ফেলে ছাইয়ের গাদায়। পা ফেলতেই আঙুল চারেক পা ডেবে যায় নীলের। নিজেকে সামলে নিয়ে ও, এগোতে থাকে সামনের দিকে। নীলের কানের সামনে কারা যেন অনবরত ফিসফিস করে কথা বলে যাচ্ছে। কী কথা বলছে সেটা নীল বুঝতে পারছে না। কোনও একটা অজানা ভাষায় ওরা কথাগুলো বলছে। এপাশ-ওপাশ তাকায় নীল। আশেপাশে কাউকে দেখতে পায় না ও। অথচ অজানা ভাষার আওয়াজগুলো ওর কানে আসছে। মনে হচ্ছে ভীষণ কাছের থেকে... আরেকটু হলেই হয়তো ওদের গরম নিঃশ্বাস ওর কানে এসে লাগবে। কিন্তু নাহ্... কেউ নেই!

আরো কিছুটা এগিয়ে যায় নীল; আর এগোতেই দগদগে পোড়া লাশগুলো নজরে পড়ল ওর। ছাইয়ের গাদার ওপর সারি সারি লাশ। লাশগুলো আগুনে পুড়ছে। নীলের ভালোই বুঝতে পারছে, এই ছাই আসলে কীসের। জ্বলন্ত লাশগুলো থেকে আগুনের ফুলকি আর মিশমিশে ঘন কালো ধোঁয়া হাওয়ায়

ছড়িয়ে পড়ছে। কী বিশ্রী গন্ধ এখানকার বাতাসে! লাশগুলোর পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে নীল। ওর থামলে চলবে না। কোথায় যাচ্ছে ও নিজেই জানে না। অথচ এটা জানে যে ওকে হাঁটতে হবে এখনও অনেকটা রাস্তা।

হঠাৎ নীল লক্ষ করল সামনে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো মানুষ। ওদের মানুষ বললে ভুল বলা হবে। এই ছাইয়ের স্তূপের ওপর এক-একজনকে দেখতে অশরীরীদের মতো লাগছে। মনে হচ্ছে মাটি খুঁড়ে সরাসরি প্রেতযোনি থেকে উঠে এসেছে ওরা। কুচকুচে কালো, ঢ্যাঙা মতোন লম্বা, সুঠাম শরীর। এক হাতে স্রাইনের মতো ধারাল কাঁটা আর অন্য হাতে একটা করে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো। হঠাৎ কে একজন চিৎকার করে উঠল। লোকটাকে দেখা গেল না! শুধু আওয়াজটা ভেসে আসল বাতাসে; আর সঙ্গে সঙ্গে লাইন করে দাঁড়ানো লোকগুলো ওই ধারালো স্রাইনটা নিজেদের গলা লক্ষ্য করে ঢুকিয়ে দিল। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল টকটকে লাল রক্ত। রক্তে ভিজে গেল ছাইয়ের স্তূপ। যেখান দিয়ে রক্ত চুইয়ে পড়ছে, তার নীচেই হাতে ধরা কাপড়ের টুকরোটা মেলে ধরল লোকগুলো। ফোঁটা ফোঁটা রক্তে ভিজে গেল ওদের হাতে ধরা কাপড়ের টুকরোগুলো। সামনে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। তপ্ত আগুনের ধক এসে লাগল নীলের সমস্ত শরীরে। ওরা এরপর স্রাইন আর রক্তে ভেজা কাপড়ের টুকরোটা নিয়ে কী করে, সেটা দেখার জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নীল। লোকগুলো ওই রক্ত ভেজা কাপড়ের টুকরোগুলো সামনের আগুনে ছুড়ে ফেলে দিল। আর মুহূর্তে আগুনটা বদলে গেল কালো ধোঁয়ায়। সেই গাঢ় কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠে ক্রমশ পাতলা হতে হতে বাতাসে মিলিয়ে গেল। দৃশ্যটা দেখে গা গুলিয়ে উঠল নীলের! তবু নিজেকে সামলে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। আরো কিছুটা এগোনোর পর দেখতে পেল সারি সারি পাথরের চাঁই মাটির ওপর। পাথরের চাঁইয়ের ওপর কতগুলো মানুষকে শোয়ানো আছে; আর প্রত্যেকটা চাঁইয়ের ওখানে মানুষগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক-একজন করে দীর্ঘদেহী পুরুষ। ওদের সবার হাতে ধারালো ছুরি জাতীয় অস্ত্র। পরনে কালো কুচকুচে আলখাল্লা মতো; লম্বা লম্বা ঝাঁকড়া চুল, মাথায় পাখির পালকের মুকুট; ওদের সমস্ত মুখে রং করা। আবার ভেসে এল সেই চিৎকার; আর চারপাশে যেন শুরু হল মৃত্যুর আহুতি। দীর্ঘদেহী মানুষগুলো

পাথরের চাঁইয়ে শুইয়ে রাখা লোকগুলোর বুকে মুহূর্তে ছুরিগুলো বিঁধিয়ে দিল। বুক চিরে বের করে আনল দগদগে গরম কলিজা। চারপাশে থিকথিকে রক্ত। গণহত্যা চলছে সমস্ত এলাকা জুড়ে। আর থেকে থেকে ভেসে আসছে অদ্ভুত একটা আওয়াজ। কোথা থেকে ভেসে আসছে আওয়াজটা, সেটা নীল জানে না। শুধু শব্দটা শুনতে পাচ্ছে। পাথরের চাঁইগুলোর একপাশে, একটা বিশাল অগ্নিকুণ্ড— দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। দীর্ঘদেহী লোকগুলো ওই কলিজা হাতে এগিয়ে এল আগুনের সামনে। তারপর সবাই একসঙ্গে কী একটা মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করে আগুনে আহুতি দিল সদ্য কেটে আনা কলিজাগুলোকে। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত জায়গাটা ঢেকে গেল কুয়াশায়। ঘন গাঢ় কুয়াশা। এক ফোটাও বাতাস নেই এখানে। এরকম কুয়াশায় তাকিয়ে থাকা যায় না। যেভাবে হঠাৎ করে কুয়াশা ঘনিয়ে এসেছিল, ঠিক সেভাবেই হঠাৎ করেই কুয়াশা কেটেও গেল। কুয়াশা সরতেই, নীল দেখল ওর সামনে ছয়জন অদ্ভুত চেহারার প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক মানুষ না। আবার অনেকটা মানুষের মতো দেখতে। সামনে ছাইয়ের স্তুপ আর নেই। বরং চ্যাটচ্যাটে মল। বিশ্রী উগ্র একটা গন্ধ বেরোচ্ছে সমস্ত এলাকাটা জুড়ে। নীল দেখল ওই ছয়জন নিজেদের যৌনাঙ্গ ফেলে ওই মলের ওপর রক্ত ছিটাতে ছিটাতে সামনের দিকে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

এবার আর নিজেকে সামলাতে পারল না নীল। ওর গা ঘিনঘিন করছিল ঘেন্নায়। পেট ঘেঁটে দিল ওর। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গলগল করে বমি করে ফেলে নীল। বমি করামাত্রই মাথাটা টোলে ওঠে ওর। আর সঙ্গেসঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

জ্ঞান যখন ফিরলো, তখন নীল দেখল একটা অন্ধকার গুহা মতো। তার এক পাশ দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে গুহামুখে। নীল সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ওকে ঘিরে আছে চারজন উলঙ্গ মেয়ে। ওরা নীলের সমস্ত গায়ে একটা গাঢ় নীল রং মাখিয়ে দিচ্ছে। নীলের একটু অস্বস্তি হচ্ছিল উলঙ্গ মেয়েগুলোকে দেখে। সমস্ত গায়ে নীল রং মাখিয়ে ওই মেয়েগুলো নীলকে গুহার বাইরে নিয়ে এল। গুহার ঠিক সামনের খাদের জায়গায় একটা প্রকাণ্ড গভীর কুয়া। কুয়ার ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। চট করে তাকালে, কোনও তলের হদিস পাওয়া যায় না। কুয়াটা ঘিরে কয়েক-শো মানুষের ভিড়। সামনে নজর পড়তে চমকে উঠল নীল। কুয়ার ওপাশে একটা প্রকাণ্ড মূর্তি। কোনও

দেবতার মূর্তি কি? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে নীল। মূর্তিটার মাথাটা হাতির। লম্বা একটা শুঁড় আছে। কুয়াটার খাদে দাঁড়িয়ে নীল অবাক হয়ে মূর্তিটাকে দেখছিল! হঠাৎ পেছন থেকে কয়েকজন মিলে ওকে সজোরে ধাক্কা মারল। টাল সামলাতে না-পেরে নীল সোজা গিয়ে পড়ল কুয়ার ভেতর; আর সেটা দেখে চারপাশের লোকজন সবাই তারস্বরে চিৎকার করে উঠছে। কুয়ার ভেতরে তলিয়ে যেতে যেতে নীলের কানে ভেসে এল ভিড় করা মানুষদের চিৎকার। কী ভাষা এটা? নীল একবর্ণও ভাষাটা বুঝতে পারছে না! এ যেন এক হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর লুপ্ত কোনও ভাষা! নীলের চেনা জগতের সঙ্গে এই ভাষার কোনও মিল নেই। তবু বার বার এই ভাষাটাই ওর কানে ঘুরে-ফিরে আসছে। হঠাৎ অন্ধকারে একটা কোথাও গিয়ে ধাক্কা খেল নীল; আর মুহূর্তে চারদিকটা আরো বেশি করে যেন অন্ধকার হয়ে গেল! এটা কোন জায়গা নীল জানে না। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। উঠে দাঁড়াল নীল। এপাশ-ওপাশ উদ্ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করছে তবু রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। হঠাৎ সামনে তাকাতেই চমকে উঠল নীল। ওর সামনে দাঁড়িয়ে সেই সুবিশাল হাতির মাথাওয়ালা মূর্তিটা। সেটা মূর্তি হলেও, দেহে প্রাণ আছে। মূর্তিটার হাতে একটা কাঠের লম্বা বাঁকানো অস্ত্র। সেটার চারপাশে ধারালো ব্লেডের মতো পাথর বসানো। নীলের বুকটা কেঁপে উঠল মূর্তিটাকে দেখে। কী একটা বলতে যাচ্ছিলো ও। আর তখনই... নীল দেখল ওর চোখের সামনে, ওই মূর্তির প্রাণীটা হাতের ধারালো অস্ত্রটা দিয়ে নিজের গলা কেটে ফেলল। আর নিজেকে সামলাতে পারল না নীল। আতঙ্কে ভয়ে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল ও! আর তখনই উপলব্ধি করল নীল... আর ব্যাপারটা আন্দাজ করতেই ভয়টা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিল। নীলের গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছে না। যতই জোরে জোরে চিৎকার করার চেষ্টা করছে নীল, ততই যেন বাতাসে কর্পূরের মতো উবে যাচ্ছে সমস্ত গলার স্বর। ঠিক ওই সময় নীলের মনে হল কেউ একজন ওর ওপর নজর রাখছে... ঠিক যেভাবে আগের স্বপ্নগুলোতেও নজরদারি চালিয়েছিল সে। দুটো চোখ। নীল এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে খোঁজার চেষ্টা করে চোখ দুটো। কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না অন্ধকারে। হঠাৎ ওর মনে হল অদৃশ্য একটা আওয়াজ ওর কানের খুব কাছে ঠোঁট এনে কিছু বলছে ওকে। কান খাড়া করে নীল কথাটা শোনার জন্য। বাংলা! বাংলায় কথা বলছে

কেউ! কিন্তু ঠিক কথা না... কতগুলো অক্ষর ওর কানের কাছে কেউ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করছে। শোনার চেষ্টা করে নীল। ক... ও... এঃ... ঝ... ঘ... জ...দ... অদৃশ্য গলার আওয়াজটা অক্ষরগুলো উচ্চারণ করেই হঠাৎ করে থেমে যায়; আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল নীলের। এখন কানের কাছে ফিসফাস শব্দটা আর আসছে না। বিছানা থেকে ধরফর করে উঠে বসে দেখে সমস্ত দেওয়াল আর মেঝের ওপর চারকোল পেন্সিল দিয়ে কে যেন লিখে রেখে গেছে, "POL..."

সমস্ত ঘর জুড়ে এই একটাই শব্দ বারে বারে লেখা। নীল দরদর করে ঘামছে আর হাঁপাচ্ছে। জিভ শুকিয়ে আসছে ওর। নিশ্বাসের বেগ বেড়ে গেছে। বুকের ভেতরের ধুকপুকানিটা ও ভালোরকম টের পাচ্ছে। নীল লক্ষ করল একটা অজানা ভয় ক্রমশ যেন ওকে গিলে খাচ্ছে...

৩

"একজন দেবতা, যার শুঁড় আছে; মাথাটা হাতির? গণেশ?" নীলের আগের দিন রাতের স্বপ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ খাতায় লিখতে লিখতে কিগান জিজ্ঞেস করল নীলকে।

কী একটা ভেবে আমতা আমতা করে উত্তর দেয় নীল, "না ঠিক গণেশের মতো না।"

"ঠিক গণেশের মতো না মানে?" জিজ্ঞেস করে কিগান।

"ঠিক গণেশের মতো না... মানে, আমরা যেরকম গণেশ দেখি, ঠিক সেরকম না। একটু আলাদা।"

"কীরকম আলাদা? দুটো হাত ছিল বললে। মাথাটা হাতির; শুঁড় আছে। ইঁদুরের ওপর বসেছিল? বা সঙ্গে ইঁদুর ছিল বাহন হিসেবে?"

"না; ইঁদুর দেখিনি। আর তাছাড়া হাতের ওই অস্ত্রটা ঠিক একটু অন্যরকম। মানে, মূর্তিটাকে দেখলে ঠিক ভক্তি আসে না; বরং অস্বস্তি হয়। গণেশের মতো; কিন্তু ঠিক গণেশ না।"

"সেটার কারণ এটাও হতে পারে যে, তুমি স্বপ্নে দেখেছ হাতির মাথাওয়ালা মূর্তিটার ঠিক সামনে একটা গভীর খাদে তোমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এটাকেও তো একরকম হিউম্যান স্যাক্রিফাইস

আমরা বলতেই পারি। আর তারপরই দেখেছ সেই হাতির মাথাওয়ালা মূর্তিটা ওর হাতের ওই অদ্ভুত অস্ত্রটা দিয়ে নিজের গলা কেটে ফেলছে। তার কারণেই হয়তো সেই ভক্তি ব্যাপারটা তোমার মধ্যে আসেনি, যেটা সচরাচর আমাদের ভগবানের ছবি বা মূর্তি দেখলে আসে। বরং ভক্তির জায়গায় একটা ভয় বা আতঙ্ক কাজ করেছে।"

"হতে পারে; আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"ওই মূর্তিটার হাতে যে অস্ত্রটা দেখেছ, সেটা তুমি আমাকে এঁকে দেখাতে পারবে?" কথাটা জিজ্ঞেস করে কিগান নীলের দিকে একটা সাদা কাগজ আর ডট পেন এগিয়ে দিল। নীল কাগজ আর পেন হাতে তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করে করে নড়বড়ে হাতে একটা খসড়া ছবি আঁকল।

নীলের আঁকা শেষ হলে, কিগান আঁকাটা হাতে নিয়ে দেখে একটু অবাক হয়। নীল যেটা এঁকেছে সেটা চেনা কোনও অস্ত্র না। অন্তত কিগান আগে কখনও এরকম কোনও অস্ত্র হিন্দু পুরাণে দেখেনি। নীল যেটা এঁকেছে সেটা অনেকটা ওই রান্না করার খুন্তির মতো দেখতে; আর সেটার দু-পাশ দিয়ে চৌকো ব্লেড মতো। নীলের বক্তব্য অস্ত্রটার ওই ব্লেডমতো দেখতে অংশটা না-কি ধারালো চকচকে পাথরের দিয়ে বানানো ছিল। কিগান অনেকক্ষণ ছবিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল; কিন্তু কিছুই কূলকিনারা করতে পারল না। নীলের কেসটা ওর কাছে ক্রমশ জটিল হচ্ছে। ছবিটা পাশের টেবিলে রেখে কিগান নীলকে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, খুব সম্প্রতি, তোমার সঙ্গে কারও কোনও ঝামেলা হয়েছে? ধরো বেশ বড়োসড়োরকমের বাওয়াল কারও সঙ্গে? বা কেউ হুমকি-টুমকি কিছু দিয়েছে তোমাকে?"

"না... কেন?"

"না, এমনি জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা তোমার ঘরে কাল যে লেখাটা ছিল, ওটা ইংলিশে লেখা ছিল না কি বাংলায়?"

"ইংলিশে... P-O-L..."

"হাতের লেখাটা দেখে কাউকে সন্দেহ হয়?"

"না... চেনা কারও হাতের লেখা না। আর তাছাড়া সন্দেহ কী করে হবে? আমার বাড়িতে আমি, মা আর বাবা থাকি। বাবা-মা আলাদা ঘরে ঘুমায়। আমার ঘরে রাতে দরজা ভেতর থেকে লক করা থাকে। আমি

ঘুমাচ্ছিলাম। আমার ঘরে আর কেউ ছিল না। জানলা বন্ধ ছিল। তাছাড়াও জানলায় গ্রিল লাগানো। বাইরে থেকে কেউ এসে লিখে দিয়ে যাবে, সেই চান্সও নেই। তাহলে কে লিখবে বলুন?”

কিগান নীলের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝার চেষ্টা করছে। আগের দিনের মতোই স্টেডি। ছেলেটা কথাগুলো মিথ্যা বলছে না। মিথ্যা বললে মানুষের মধ্যে অসম্ভব একটা অস্থিরতা কাজ করে। সেটা নীলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে না। কিগান ঘড়ির দিকে তাকাল। লেট হয়ে গেছে। কিগান নীলকে বলে, “তুমি আবার পরের বুধবার, বিকেল পাঁচটায় আমার সঙ্গে চেম্বারে মিট করবে। আমি সময় আর তারিখটা লিখে রাখলাম।”

নীল ঘাড় নাড়িয়ে “আচ্ছা” বলে চেয়ার থেকে সবে উঠেছে, কী একটা মনে হতে কিগান বলে, “আচ্ছা নীল...”

“হ্যাঁ বলুন...”

“আগের দিনের স্বপ্নেও কোনও বাংলা অক্ষর দেখেছিলে?”

“ওহ্ হ্যাঁ হ্যাঁ... আমি বলতে ভুলে গেছিলাম... কালকের স্বপ্নে কোনও বাংলা অক্ষর আমি দেখিনি। তবে কেউ আমার কানের কাছে কয়েকটা অক্ষর বার বার উচ্চারণ করছিল। আমি তাঁকে দেখতে পাইনি। শুধু অক্ষরগুলো শুনেছি— ক... ও... ঞ... ঝ... ঘ... জ... আর, দ...”

“কিন্তু স্বপ্নতে কিছু শুনলে সেসব তো এতটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে থাকে না কারও... তুমি নিশ্চিত এই কয়েকটা অক্ষর ছিল?”

“হ্যাঁ... আমি জানি না কীভাবে? কিন্তু আমার এক্ষেত্রে মনে আছে অক্ষরগুলো। এগুলোই ছিল...”

“সেক্ষেত্রে নীল, আমার মনে হয়, তোমার স্বপ্নগুলোর মধ্যে আরেকটা মিল আছে। তুমি ধরতে পারোনি সেটা, বা কোনও কারণে মিস করে গেছ...”

“কী?”

“এই অক্ষরগুলো... আমার বিশ্বাস, প্রথম দুটো স্বপ্নেও তুমি এই কয়টাই অক্ষর দেখেছিলে। তোমার সবগুলো মনে ছিল না। কিছু মনে ছিল। এবার দেখো, গত দু-দিনের দেখা আর শোনা অক্ষরগুলো তুমি সবকটাই আমাকে বলেছ; আর এই দুটো দিনের স্বপ্নে দেখা আর শোনা অক্ষরগুলোর মধ্যে

কোনও ফারাক নেই। অতএব আমার ধারণা প্রথম দুটো স্বপ্নেও এই কটা অক্ষরই তুমি দেখেছিলে। এই ব্যাপারটা পরে আবার কোনোদিন এরকম কোনও স্বপ্ন দেখলে খেয়াল করবে। তোমার স্বপ্নগুলোর সঙ্গে এই বাংলা অক্ষরগুলোর কোনও সম্পর্ক আছে না-কি সেটা এবার একটু খুঁজতে হবে...”

নীল কীরকম একটা ফ্যালফ্যাল করে কিগানের দিকে তাকিয়ে ওঁর কথাগুলো শুনছিল। তারপর কী একটা ভেবে ও কিগানকে বলে, “কিন্তু জানেন... একটা ব্যাপার...” এটুকু বলে থেমে যায় নীল। কী একটা ভাবে। তারপর আবার বলে, “আমি যখন স্বপ্নের মধ্যে ওই অক্ষরগুলোর দিকে তাকাই, কিংবা কেউ আমার কানে কানে অক্ষরগুলো বলে যায়, তখন আমার কেমন একটা ঘোর চলে আসে। মনে হয়...” আবার বলতে বলতে থেমে যায় নীল।

কিগান জিজ্ঞেস করে, “কী মনে হয়?”

আবার কিছু একটা চিন্তা করে নীল বলে, “একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যাপার। মনে হয় হাত-পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে। আমি তলিয়ে যাচ্ছি অন্য কোনও ভাবনার জগতে। সেই অনুভূতিটা ঠিক কেমন, সেটা আমি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না।”

কথাটা শেষ করেই “আসি” বলে নীল বেরিয়ে যায় চেম্বার থেকে। কিগান নীলের শেষ কথাটার কোনও উত্তর দেয় না। নিজের সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে থাকে ও। মাথার ভেতরে অনেকগুলো প্রশ্ন জাগছে। প্রশ্নগুলো দিন দিন ক্রমশ জট পাকাচ্ছে। কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। স্বপ্নে বার বার নীল নিজেকে মরতে দেখছে... অদ্ভুত সব প্রতিকৃতি... প্রাণীরা এসে ওঁর স্বপ্নে ভিড় করছে... তারওপর ওই বাংলা অক্ষরগুলো; অক্ষরগুলো পর পর সাজিয়েও কোনও অর্থপূর্ণ মানে বের করতে পারেনি কিগান। আর সেই চোখ দুটো, যে প্রত্যেকটা স্বপ্নে নীলের ওপর নজরদারি চালাচ্ছে... ভাবতে ভাবতে চিন্তার ভাঁজ ফুটে ওঠে কিগানের কপালে। আর গম্ভীর হয়ে যায় ও। চিন্তায় তলিয়ে যায় নিজের অজান্তেই। নীলের কেসটা দিনকে দিন আরো জটিল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সুরাহা কিছুই হচ্ছে না। আজকে আর পেসেন্টও নেই কেউ। বাইরে মেঘলা করেছে। বৃষ্টি নামবে হয়তো। কিগান ওর বইয়ের শেল্ফের দিকে এগিয়ে যায়। গণেশের মতো দেখতে মূর্তিটার ব্যাপারটা ওকে ভেতর ভেতর বেশ একটা নাড়া

দিচ্ছে। কারণ গণেশের সঙ্গে এই হিউম্যান স্যাক্রিফাইস বা নরবলি কোনোভাবেই যুক্ত নয়— যতটুকু কিগান জানে বা পড়েছে। অন্তত পুরাণে কোথাও এরকম কিছু বলা নেই। যদিও হাতির মাথাওয়ালা দেবতা মানেই কি গণেশ? একটু খটকা লাগে কিগানের। গণেশ নামটাই আসলে পুরোনো বৈদিক বইগুলোতে কোথাও পাওয়া যায় না। বরং আগেকার বৈদিক পুঁথিগুলোতে বিনায়ক নামটা পাওয়া যায়। তবে সেই নামের সঙ্গে হাতির মাথাওয়ালা কোনও দেবতার উল্লেখ কিন্তু পাওয়া যায় না। অনেক বছর আগে গণেশ নিয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে ওর ডায়েরিতে নোট করে রেখেছিল কিগান। সেই ডায়রিটাই ও খুঁজছে। খুঁজতে খুঁজতে শেল্ফের এককোণে সেটা পাওয়া গেল। ডায়রিটা টেনে বের করে পাতা ওল্টাচ্ছে কিগান। হ্যাঁ ঠিক... কিগানের ধারণায় কোনও ভুল নেই। আনুমানিক ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, মানে সিন্ধু সভ্যতার সময়ে, তখনকার দিনের একটা শিলমোহরে হাতির ছবি পাওয়া যায়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ— বর্তমান পাঞ্জাব, আর বর্তমানে পাকিস্তানের কিছু অংশ জুড়ে এই সিন্ধু সভ্যতার বিস্তার ছিল। এই অঞ্চলগুলোর বেশিরভাগটাই ছিল জঙ্গল। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছিল সিন্ধু-সরস্বতী নদী। ওই সময় হাতি পোষার পাশাপাশি হাতিকে নানা কাজে ব্যবহার করা হতো। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, হাতির একটা গুরুত্ব ছিল সে-সময়েও। কিন্তু গুরুত্ব ছিল মানেই হাতিকে পূজা করা হতো— এরকম কোনও সিদ্ধান্ত কিন্তু এই তথ্য থেকে পাওয়া যায় না। এরপর ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ; ঋগবেদের রচনাকাল। তখন আবার একাধারে ইজিপ্টে পিরামিড তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এই ঋগবেদেও গণেশ বা হাতির মাথাওয়ালা কোনও দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেখানে উল্লেখ পাওয়া যায় 'গণপতি' বলে একটা শব্দের। গণেশের আরেকনাম গণপতি। কিন্তু হাতির মাথার ব্যাপারটা? সে-ব্যাপারে কিছু উল্লেখ ছিল না ঋগবেদে। গণপতিকে ঋগবেদে বলা হয়েছে গণদের দলপতি। এবার এই গণ, কোনও আদিবাসী সম্প্রদায়ও হতে পারে, কিংবা কোনও প্রান্তিক গোষ্ঠী। সেই ব্যাপারে ঋগবেদে আলাদা করে কিছু উল্লেখ নেই। নীল ওর তৃতীয় স্বপ্নে পিরামিডের মতো একটা স্ট্রাকচার দেখেছিল। পিরামিডটা স্তরে স্তরে ভাগ করা; আর সেটা দিয়ে খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। তাহলে কি সেই স্বপ্নটার সঙ্গে এই সময়কালটার কোনও মিল আছে? এই সময়টাই তো একইসঙ্গে ঋগবেদ

লেখা হচ্ছে আর পিরামিডও তৈরি হচ্ছে; আর ঋগবেদেও আমরা 'গণপতি' শব্দটার উল্লেখ পাই। কিন্তু কানেকশনটা কোথায়? কোনও মিলই তো নেই। কারণ ঋগবেদে গণপতির সঙ্গে ওরকম হিউম্যান স্যাক্রিফাইস বা নরবলির কোনও উল্লেখ নেই। এখানেই হিসাব মিলছে না। আর ঋগবেদের সময়ে ওরকম মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। সেটা শুরু হয় আরো পরে। মোটামুটি গুপ্ত বা কুষাণ যুগ থেকে। আগে যজ্ঞ-টজ্ঞ করে বীজমন্ত্র উচ্চারণের প্রথা ছিল। বলা হতো বীজমন্ত্র থেকে তৈরি হবে আরাধ্য দেবতার রূপ। আলাদা করে মূর্তি বানানোর কোনও চল ছিল না। কিন্তু নীল স্বপ্নে দেখেছে হাতির মাথাওয়ালা মূর্তিটার সামনের কুয়াটায় ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হল। নিশ্চয়ই সেটা ওই মূর্তিটাকে উৎসর্গ করেই। তার মানে, এমন একটা মূর্তিপূজা, যেখানে পূজায় দেবতাকে মানুষ উৎসর্গ করে মানত করা হতো... আর সেটা উৎসর্গ করার রীতিটা হল, মানুষটার সমস্ত গায়ে নীল রং করে, তাকে কুয়ায় ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া! স্ট্রেঞ্জ! কিন্তু গণেশ বা সমকালীন কোনও দেবতাকে নিয়ে এরকম ধরনের কোনও হিউম্যান স্যাক্রিফাইসের উল্লেখ তো ঋগবেদে নেই।

এবার মজার ব্যাপার হচ্ছে, আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের 'মানব গৃহসুত্র'-তে চারজন দেবতার উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি... যারা ঝুটঝামেলা তৈরি করত বিভিন্নভাবে। ওখানে এই চারজন দেবতাকে একসঙ্গে বিঘ্ন কর্তা' বিনায়ক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ৩০০ খ্রিস্টাবের 'যজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি'-তে একজন বিনায়কের উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি কি-না বিঘ্ন ঘটাতে ভালোবাসতেন। তাঁকেও 'বিঘ্ন কর্তা' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। মনে করা হয়, মূলত গ্রামদেবতা হিসেবে গ্রামে গ্রামে এই বিঘ্ন-কর্তা বিনায়কের সঙ্গে মাতৃকা দেবী হিসেবে পূজিতা হতেন অম্বিকা। 'বিঘ্ন-কর্তা' বিনায়ক ঠিক কী ঝুটঝামেলা বা বিঘ্ন ঘটাতেন? সেই ঝুটঝামেলার মানে নিশ্চয়ই নরবলি বা মানুষকে কুয়ায় ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া নয়। সেটা হলে অবশ্যই উল্লেখ করা থাকত দুটো পুঁথির অন্ততপক্ষে কোনও একটাতে। অতএব গণেশের এই আদি রূপের সঙ্গেও মিলছে না নীলের স্বপ্নে দেখা ওই হাতির মাথার মূর্তি। এমনকি ৩০০ খ্রিস্টাব্দে মহাভারত তার অন্তিম এবং শেষতম সংস্করণ এবং সংযোজনের পর্যায়ে পৌঁছায়। সেখানেও কিন্তু হাতির মাথাওয়ালা কোনও দেবতার উল্লেখ নেই। তাহলে তো আরো পিছিয়ে আসতে হয়।

গণেশ নামটা আর এই হাতির মাথার আইকনোগ্রাফিটা প্রথম চালু হয় পঞ্চম শতাব্দীর আশেপাশের সময়টায়। গার্ডিয়ান দেবতা গণেশের সঙ্গে যুক্ত হয় নবগ্রহ, সপ্তমাতৃকা। সপ্তম শতাব্দীতে লেখা হওয়া পুরাণগুলো গনেশকে শিব এবং শক্তির সন্তান হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করল। আর এই তথ্যের ভিত আরো শক্তপোক্ত হল, যখন নবম শতাব্দীতে আদি শংকরাচার্য গণেশকে সূর্য, শিব, বিষ্ণু আর শক্তির সমপর্যায়ে রাখলেন। দশম শতাব্দীতে গণেশের জন্য বানানো হল আলাদা মন্দির। গণেশের আধুনিকতম যে-রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত— দুই হাত, বাহন ইঁদুর— এই রূপের চল শুরু হয় এই সময়টা থেকে। দ্বাদশ শতাব্দীর সময়কালে, গণেশের পূজার চল ভারত ছাড়িয়ে তিব্বত, জাপান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া এসব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে কি নীলের স্বপ্নে দেখা ওই গণেশ মূর্তিটা ভারতের বাইরের? ভারত থেকে ওসব দেশে ছড়িয়ে পড়ার পর, গণেশ পূজার সঙ্গে কি তাহলে নরবলি বা হিউম্যান স্যাক্রিফাইসের মতো আচাররীতি যুক্ত হয়েছিল? সেরকম অন্তত কিছু মনে পড়ছে না কিগানের। এমনকি নীল একজায়গায় বলেছিল যে, ও দেখেছে ছয়জন অদ্ভুত দেখতে প্রাণী যৌনাঙ্গ থেকে রক্ত ছিটাতে ছিটাতে মলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে; যাদের শরীরের অর্ধেকটা মানুষের, আর বাকি অর্ধেকটা অন্য কোনও অজানা প্রাণীর। কিংবা মানুষের কলজে কেটে আগুনে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। এরকম নৃশংস আচাররীতি কি ওসব দেশে গণেশ পূজায় হতো? মনে হয় হতো না। থাকলে অন্তত জানা যেত। কিগান মোবাইলটা বের করে গুগল খুলল। সার্চবক্সে বিভিন্নভাবে লিখে খোঁজাখুঁজি করে হাতির মাথাওয়ালা মূর্তির ব্যাপারটা। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ও এই ব্যাপারে কোনও তথ্যই ইন্টারনেটে পেল না। মোবাইল রেখে ডায়রির লেখাগুলোয় মন দেয় কিগান। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সময়টায় গণেশ পুরাণগুলো গণেশের নানান কাহিনি বর্ণনা করা শুরু করে। সেখানেও নরবলি বা নীলের বর্ণনা করা ওরকম নৃশংস কিছুর বর্ণনা নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'গণেশ উপনিষদ' গণেশকে 'স্বয়ম্ভূ' বা 'সেলফ ক্রিয়েটেড গড' হিসেবে আখ্যা দেয়।

ডায়রি বন্ধ করে শেল্ফে তুলে রাখে কিগান। কোনও যুক্তিযুক্ত তথ্যই পাওয়া গেল না! আর গণেশের হাতে নীল স্বপ্নের মধ্যে যে অস্ত্রটা দেখেছে, ওরকম কোনও অস্ত্রের উল্লেখও কোথাও নেই। নীলের স্বপ্নগুলো ভীষণ

অদ্ভুত। প্রত্যেকটা স্বপ্নের সঙ্গেই একটা নরবলি কিংবা অদ্ভুত যৌনাচার যুক্ত আছে। আচ্ছা স্বপ্নগুলো কি একটা আরেকটার সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত?... মানে, ইন্টার কানেক্টেড? কিংবা স্বপ্নগুলোর মধ্যে ওই নির্দিষ্ট বিষয়গুলোর বাইরেও আলাদা করে কোনও মিল আছে কি— যেটা হয়তো কোনোভাবে ধরা যাচ্ছে না? আর সমস্ত মেঝের ওপর, দেওয়ালের গায়ে ওই আঁকা ছবিগুলোর তাহলে কে আঁকল? আর ওই "POL" কথাটার মানেই-বা কী? চেনা কোনও ভাষার শব্দ না ওটা। অনেক মাথা খাটিয়েও বিষয়গুলো ঠিক ধরতে পারছে না কিগান।

৪

নীল পোস্ট অফিসে কী একটা কাজে এসেছিল। আজকে সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে শিলিগুড়িতে। একটানা বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তাঘাটে কোথাও কোথাও জল জমে আছে। পোস্ট অফিসের কাজ সেরে নীল কোর্ট মোড়ে এসেছে অটো ধরার জন্য। শিবমন্দিরের ওদিকে আরেকটা কাজ আছে। এই বৃষ্টির দিনে বাড়ি থেকে বেরোতেই ইচ্ছে করে না। বৃষ্টির দিন মানেই জানলা খুলে হালকা একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে সারাদিন শুয়ে থাকা। মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটা আসবে। শিরশিরে ওয়েদারে দুপুরে খিচুড়ি আর ডিমভাজা। এখন যদিও বৃষ্টিটা একটু ধরে এসেছে। রাস্তাঘাট ভেজা। কোর্ট মোড় চত্বরে বরাবরই ভিড়। অটোগুলো লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিক থেকে যে অটোগুলো আসছে, সেগুলো প্যাসেঞ্জার নামিয়ে, ঘুরিয়ে নিয়ে আবার ওই লাইনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে; আর অটো থেকে মুখ বের করে চিৎকার মারছে, "মাল্লাগুড়ি... মার্কেট... জংশন..."

লোক ভরতি হলে স্ট্যান্ড ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দু-পাশের ফুটপাথে, একদিকে ফলের দোকান, অন্যপাশে পেপার ম্যাগাজিনের একটা ছাপড়ামতো দোকান। রাস্তার ওপাশে পর পর কয়েকটা ভাতের হোটেল। টিনের ছাউনি দেওয়া; সামনে কাচের পার্টিশন। সবগুলো হোটেলেই মানুষের ভিড়। এসব হোটেল বেশ চালু। এই চত্বরে যে-কয়টা অফিস বা দোকান আছে, টিফিন টাইমে বেশিরভাগই কম-বেশি এখানে লাঞ্চ করে নেয়।

স্ট্যান্ডের এক কোনায় একটা শেডের নীচে নীল দাঁড়িয়েছিল। ঠোঁটে

একটা সিগারেট গুঁজে সবে লাইটারটা জ্বালিয়েছে ও। হঠাৎ নীল লক্ষ্য করল রাস্তায় লোকজনের ভেতর দিয়ে, ভিড় ঠেলে ঠেলে কয়েকটা কালো কুচকুচে লিকলিকে লম্বা চেহারার প্রাণী বেরিয়ে এল। ওদের হাত-পাগুলো সরু সরু লম্বা লম্বা। লম্বা গলা। থুতনির অংশটা অনেকটা সামনের দিকে এগোনো। চোখগুলো কোটরে ঢোকানো। শরীরটা লম্বালম্বি একটা রেখায় ওপরে উঠে গেছে। দেহে কোনও বাঁক নেই। মানুষের স্বাভাবিক উচ্চতার থেকেও অনেকটা লম্বা আকৃতির এই প্রাণীগুলো। ওদের সমস্ত মুখে নানারকম রং মাখা; মাথায় পাখির ডানা কেটে বানানো মুকুট; গায়ে রংচঙে ফ্রক ধরনের আলখাল্লা; গলায় হাড় দিয়ে তৈরি নকশা করা মালা। নীলের নজর পড়ল ওদের আলখাল্লাগুলোর দিকে। রঙিন কালি দিয়ে আলপনা আঁকার মতো একেকটা আলখাল্লায়, একেকটা অক্ষর লেখা। বাংলা অক্ষর! টনক নড়ে নীলের। পড়ার চেষ্টা করে ও আলখাল্লায় লেখা অক্ষরগুলোকে। ক... ও... ঞ... ঝ... ঘ... জ...দ! স্বপ্নে দেখা সেই সাতটা অক্ষর! চমকে ওঠে নীল। মনের মধ্যে কেমন একটা 'কু' ডেকে ওঠে ওর। ওই অদ্ভুত দেখতে প্রাণীগুলোর প্রত্যেকের হাতে ধারলো অস্ত্র। অস্ত্রটার দিকে চোখ পড়তেই প্রচণ্ড আতঙ্কে কেমন একটা পাগল পাগল হয়ে যায় নীল। ওদের হাতের অস্ত্রটা চিনতে নীলের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না। ঠিক এই অস্ত্রটাই ও সেদিন ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেছিল হাতির মাথাওয়ালা ওই দেবতাটার হাতে। অস্ত্রটার ধারালো অংশটা চকচক করছে দিনের আলোতে। প্রাণীগুলো ক্রমশ নীলের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে নিজেদের মধ্যে ছড়াতে শুরু করেছে চারপাশে। নীল বুঝতে পারল ওরা নীলকে চক্রাকারে ঘিরে ফেলতে চাইছে। ওরা কে? আর কেনই-বা নীলের পেছনে এভাবে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, নীল কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না প্রশ্নগুলোর। শুধু ও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে— কতোগুলো ঢ্যাঙা লিকলিকে কুচকুচে কালো ভয়ংকর দেখতে প্রাণী ক্রমশ ওকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে। অথচ নীল বাদে রাস্তার অন্যান্য লোকজন কেউ ওদের দেখতে পাচ্ছে না। যে-যার মতো রাস্তা দিয়ে ওদের পাশ কাটিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। অথচ নীল একাই কেবলমাত্র প্রাণীগুলোকে দেখতে পারছে! এ-ও কীভাবে সম্ভব? একটা চিনচিনে ভয় ক্রমশ নীলের গলা বেয়ে দলা পাকিয়ে বেড়ে উঠছে। উদ্ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকায় ও। নীল আপ্রাণ চেষ্টা করছে, ওই প্রাণীগুলোর

নাগালের বাইরে পালানোর। কিন্তু কোনও এক জাদুবলে, কেউ ওঁর হাত-পা সব অসাড় করে দিয়েছে। ও একবার ভাবল, আশেপাশের লোকজনদের চিৎকার করে ডাকবে। কিন্তু সেটাও ও করতে পারল না। চিৎকার করতে গিয়ে নীল দেখল ওর গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভেতরটা কেমন যেন খালি খালি হয়ে যাচ্ছে ওর। কিছুই ভাবতে পারছে না। শুধু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে— লিকলিকে কুচকুচে কালো বীভৎস প্রাণীগুলোকে। ওরা এতক্ষণে আরো কাছাকাছি চলে এসেছে নীলের। কী করবে ভেবে পায় না নীল। কী উপায়ে রেহাই মিলবে— সেটাও ও জানে না। হঠাৎ নীল কানের কাছে একটা আওয়াজ শুনতে পেল। কেউ স্বর নামিয়ে, কানের কাছে মুখ এনে নীলকে কিছু বলছে। নীল একবর্ণও বুঝতে পারে না এই ভাষা। কিন্তু সেই আওয়াজটার মধ্যে একটা অদ্ভুত টান আছে। সেই মায়াটানে অনায়াসের আওয়াজটা নীলকে বেঁধে ফেলতে পারে। আওয়াজটা অনুসরণ করে পাগলের মতো এদিক-ওদিক তাকায় নীল। কিন্তু কাউকে দেখতে পারে না। আর তখনই... হঠাৎ... প্রাণীগুলোর চোখে চোখ পড়তেই কেমন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেল নীল; আর ঠিক তখনই ঘোরের মধ্যে একটা সম্ভবনা ওর মাথায় খেলে গেল— এই ভাষা... এই ভাষায় আর মানুষ এখন কথা বলে না। বহুকাল আগে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে এই ভাষা। আলখাল্লার মতো পোশাক... এগুলো এখনকার মানুষের পোশাক না; বরং কোনও হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির লোকেরা বহুকাল আগে এসব ব্যবহার করত। আর... আর... অনেকটা মানুষ মানুষ দেখতে অথচ মানুষ না— এই প্রাণীগুলো... কোনোমতেই এরা এই পৃথিবীর হতে পারে না। এই পৃথিবীর বাইরের কোনও অন্ধকার জগৎ থেকে ওরা এসেছে। যুগে যুগে... প্রতিটা জন্মে... আদি অনন্তকাল ধরে ওরা নীলকে তাড়া করে আসছে। এপাশ-ওপাশ উদ্ভ্রান্তের মতো তাকাতে তাকাতে নীলের তখন পাগল পাগল দশা। আশেপাশের মানুষজন যেন ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে; আর তার বদলে স্পষ্ট হচ্ছে ওই অন্ধকার জগতের প্রাণীগুলো। লোকগুলো ক্রমশ ওকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে। ওদের এগিয়ে আসার মধ্যে কী একটা ছন্দ আছে যেন। সবাই যেন মেপে মেপে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে সামনের দিকে পা ফেলে এগোচ্ছে। হঠাৎ টলে উঠল নীলের মাথা। টাল সামলাতে না-পেরে ও ভেজা রাস্তাটার ওপর ধপ করে

বসে পড়ল। আশেপাশের দোকানপাট, অটোস্ট্যান্ড— এখন আর কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না ও। শুধু চোখের সামনে কয়েকটা অদ্ভুত পোশাক পরা বীভৎস প্রাণী নীলের একদম কাছে এগিয়ে এসেছে। ওদের কোটরে ঢোকানো চোখ দুটোয় ঝলসানো দৃষ্টি। চাহনিতে অসম্ভব একটা হিংস্রতা। আশেপাশের আর কোনও আওয়াজ এখন আর নীল শুনতে পাচ্ছে না। শুধু সেই ফিসফিসানি আওয়াজটা ছাড়া। কেউ যেন নীলের কানের কাছে একনাগাড়ে কিছু একটা মন্ত্র পাঠ করে চলেছে। সেই মন্ত্রের ভাষা দুর্বোধ্য। অথচ মন্ত্রের ধ্বনিটার মধ্যে একটা তীব্র টান আছে। যে ওই মন্ত্রটা পাঠ করছে, তাঁর এক মুহূর্তের জন্যও গলা কাঁপছে না... গলা ওঠা-নামা করছে না। এক সুরে... এক ছন্দে মন্ত্রটা পাঠ করে চলেছে।

ঠিক এরকম ফিসফিস আওয়াজ নীল ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে বহুবার শুনেছে। এটাও কি তাহলে স্বপ্নই! চিন্তাটা মাথায় আসতেই বিভ্রান্ত হয়ে যায় নীল। স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে ফারাক করতে পারে না ও। নীলের লক্ষ্য করল ওর মাথার ভেতরটা কেমন একটা ঝিমঝিম করছে। মাথাটা আরো বেশি বেশি করে টলছে। চারপাশের সবকিছু যেন লাট্টুর মতো বনবন করে ঘুরছে ওর চারদিকে। কানের সামনে সেই মন্ত্রপাঠের ধ্বনি আরো বেশি করে যেন প্রকট হচ্ছে। পালানোর জোর নেই শরীরে। পালানোর রাস্তা নেই। ওরা নীলকে ঘিরে ফেলেছে চারদিক থেকে; আর তখনই নীল লক্ষ করল ওদের মধ্যে একজন নীলের দিকে ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে আসছে। নীলের কাছে আসামাত্রই ওই বীভৎস প্রাণীটা হাতের ধারালো অস্ত্রটা দিয়ে নীলের গলায় সজোরে কোপ বসাল। কাটা জায়গাটা দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল। মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল নীল। কিন্তু এরকম নৃশংস একটা দৃশ্য চোখের সামনে দেখেও আশেপাশের লোকজনরা কোনও ভিড় করল না। কেউ বিন্দুমাত্র ফিরেও দেখলো না নীলের দিকে। যেন মুহূর্তের মধ্যে নীলের উপস্থিতি ওদের মধ্যে থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। বৃষ্টি ভেজা রাস্তাটা রক্তে মাখামাখি হয়ে একাকার হয়ে গেল। নীলের শরীরে কোনও সাড় নেই। কিন্তু কী অদ্ভুতভাবে ও চোখের সামনে সমস্তটা দেখতে পাচ্ছে। ঘোলাটে দৃষ্টিতে ও দেখছে, ওই আলখাল্লা পরা প্রাণীগুলোর মধ্যে থেকে আরেকজন দীর্ঘদেহী প্রাণী বেরিয়ে আসল। সেটার সমস্ত শরীর টকটকে লাল; পরনে পোশাক নেই; উলঙ্গ। আর হাতে একটা ধারালো অস্ত্র। নীলের সামনে দাঁড়িয়ে ওই

প্রাণীটা একমুহূর্তও সময় নষ্ট না-করে হাতের অস্ত্রটা সজোরে বিঁধিয়ে দিল নীলের বুকে। তারপর যেটা ঘটল সেটা দেখামাত্র গা গুলিয়ে উঠল নীলের। মন চাইছিল কোনোভাবে শরীরটা ফেলে যদি পালিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু শরীর থেকে বেরোতে পারছিল না। কেউ যেন মন্ত্রবলে ওর আত্মাটাকে একটা লাশটার মধ্যে বন্দি করে রেখেছে। ওই দীর্ঘদেহী টকটকে লাল রঙের প্রাণীটা হাতের ওই ধারালো অস্ত্রটা দিয়ে ছিলে ছিলে কেটে আনল নীলের গায়ের ফিলফিলে চামড়াটা। তারপর সেই রক্ত মাখা চামড়াটা লোকটা জড়িয়ে নিল নিজের ওই লাল টকটকে শরীরটার ওপর। ওসব দেখে কেমন একটা ট্রমার মতো হয়ে গেছে নীলের। থেকে থেকে ভেতর থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে ও। আর সহ্য করতে পারছে না নীল— চোখের সামনে যা দেখছে সমস্তটা। কিন্তু উপায় নেই। হঠাৎ নীল লক্ষ্য করল ওর পায়ের নীচের মাটিটা হঠাৎ দু-ফাঁক হয়ে গেল; আর সেই নিকশ কালো গভীর গর্তের ভেতর দিয়ে নীল মাটির তলে তলিয়ে গেল। চোখের সামনের শুধু ঘন অন্ধকার আর অন্ধকার। নীচে কতটা গভীর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। চোখ বন্ধ করে তারস্বরে চিৎকার করল নীল। কিন্তু ও জানে ওকে এখানে শোনার কেউ নেই। ক্রমশ মাটি ফাঁক হতে হতে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে নীল। হঠাৎ ও লক্ষ করল সামনে থেকে একটা আলো মতোন ভেসে আসছে। মাটির নীচে আরেকটা পৃথিবী? স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মাটির নীচ থেকেই আসছে আলোটা। অনেকটা দিনের আলোর মতো দেখতে। আলোর উৎসটা ক্রমশ যেন বড়ো হচ্ছে; আর ওই আলোর শিখার উৎসের দিকেই ভারহীন অবস্থায় তীব্র গতিতে নেমে আসছে নীল। হঠাৎ ওর শরীরটা একটা শক্ত কিছুতে এসে ঠেকল। অসম্ভব ঠান্ডা কিছুতে। কিন্তু একফোঁটাও ব্যথা পেল না নীল। অথচ এত ওপর থেকে পড়লে তো হাড়পাঁজরা ভেঙে মাথা ফেটে চৌচির হয়ে মারা যাওয়ার কথা। কিন্তু সেসব কিছুই হল না। নীল চোখ মেলে দেখে আশেপাশে পাহাড়ের উঁচু উঁচু বরফ ঢাকা চূড়া। ও নিজেও একটা পাহাড়ি সরু খাড়াই রাস্তার ওপর পড়ে আছে। চারপাশ ধবধবে সাদা বরফে ঢাকা। এপাশ-ওপাশ ভালো করে দেখার চেষ্টা করে নীল। আকাশ এখানে শান্ত, গাঢ় নীল রঙের। ঠান্ডা হিমশীতল হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে। হঠাৎ নীল লক্ষ্য করল ওর সমস্ত শরীরটা আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। কিন্তু কে বাঁধল ওকে? হাত-পা নাড়াচাড়া করার চেষ্টা

করল নীল। কিন্তু সেটাও করতে পারল না। একটা অসম্ভব দমবন্ধ অস্বস্তিতে ও এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি করার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু শরীর বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করা যাচ্ছে না। হঠাৎ নীল লক্ষ করল ও ছাড়াও আরো কয়েকটা বডি রাখা আছে ওর আশেপাশে। জায়গাটায় টিলার মতো ছোটো ছোটো উঁচু উঁচু পাথরের স্তূপ। ওখানে জড়ো করে রাখা বডিগুলো। ওগুলো হাঁটু মুড়ে শান্তভাবে গুটিয়ে বসে আছে। সবকয়টাই শিশু। বয়স সবারই আন্দাজ ছয় থেকে পনেরোর মধ্যে। বরফে জমে মমি হয়ে গেছে। ওদেরও হাত-পা আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। দেহে প্রাণ নেই। আঁতকে ওঠে নীল। ওদেরও কি তাহলে এখানে এনে খুন করা হয়েছে? কিন্তু এতগুলো বাচ্চাকে এভাবে নৃশংসভাবে কারাই-বা খুন করল? আর এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলে-মেয়েগুলোকে খুনের কারণটাই-বা কী? আর ওই অদ্ভুত পোশাক পরা প্রাণীগুলোই-বা কারা? ওরাও কোথায় গেলো? ওরাও কি নীলের সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসেছে? মমিগুলোর দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে নীল। সেই চোখে একরাশ মৃত্যুভয় আর চাপা আতঙ্ক। তবে কি এটাই শেষ? মৃত্যু কি এরকমই দেখতে হয়?

আর নিজেকে সামলাতে পারে না নীল। হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই গলা ফাটিয়ে তারস্বরে চিৎকার করল ও। কিন্তু নীল নিজেও জানে, এই পাণ্ডববর্জিত পাহাড়ি অঞ্চলে ওকে বাঁচানোর কিংবা ওর কথা শোনার মতো কেউ নেই।

আর ঠিক তখনই... তখনই নীল অনুভব করল, ও ছাড়াও এখানে আরেকজন আছে। সে স্বপ্নের মতো এখানেও নীলের ওপর নিঃশব্দে নজরদারি চালাচ্ছে। দুটো ক্রূর চোখ। উদ্ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক সেই চোখ দুটোকে খোঁজার চেষ্টা করে নীল। কেউ নেই... কাউকে খুঁজে পায় না নীল ওখানে। কিন্তু ও মরিয়া। ওকে খুঁজে পেতেই হবে সেই চোখ দুটোকে। শেষে একরকম হাল ছেড়ে দিয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে মুহূর্তের জন্য একবার আকাশের দিকে তাকিয়েছিল নীল। আর তাকাতেই চমকে ওঠে ও। ও দেখে, আকাশের গায়ে দুটো টকটকে লাল চোখ নিঃশব্দে মুহূর্তের মধ্যে মেঘের ভেতর মিশে গেল।

৫

"তোর মাথা আর আমার মুণ্ডু..."

"মানেটা কী?"

"মানেটা কী-মানে? দ্বাদশ শতাব্দীতে তুই নিজেই বললি গণেশের পূজার চল ভারত ছাড়িয়ে বাইরের দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে তুই জানিসই না, কয়েকটা দেশে এর সঙ্গে সঙ্গে দেবতার কাছে মানত করে রক্ত উৎসর্গ করার রীতি ছিল! মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি। এই তো তোর জ্ঞানের দৌড়!"— রেগে উত্তর দেয় রিয়া। রিয়া কিগানের প্রেমিকা। ওদের প্রেমটা প্রায় সাড়ে পাঁচ বছরের। আর গত দেড় বছর থেকে ওরা লিভ ইন করছে। রিয়ার পুরাণের ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহ। দেশীয় এবং বিশ্ব পুরাণসংক্রান্ত নানান তথ্য মাঝে মাঝেই কিগান রিয়ার কাছ থেকে জানতে পারে। সেদিন রিয়াকে নীলের স্বপ্ন দেখার ঘটনাটা কিগান বলছিল। বিশেষ করে, ওই হাতির মাথার দেবতার ব্যাপারটা। সেই দেবতা গণেশ না-কি অন্য কেউ, এসব নিয়েই ওদের মধ্যে আলোচনা চলছিলো। কিগান সাধারণত রিয়াকে নিজের কাজের মধ্যে জড়ায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে কিগানের মনে হয়েছে রিয়াই একমাত্র ওকে একমাত্র ঠিকঠাক সাহায্য করতে পারবে। সমস্তটা শুনে এটাই ছিলো রিয়ার প্রথম এক্সপ্রেশন।

কিগান আরো উঁচুতে গলা চড়িয়ে উত্তর দেয়, মাথা মুন্ডু মানে? হিসেব তো সেটাই বলছে। দেখ প্রথম থেকে বলছি তোকে। ৩২৬ খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ অ্যালেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করল। সেটাকে যদি আমি ভারত আর গ্রিকদের মধ্যে যোগাযোগের একটা সূত্র বলে ধরি, সেক্ষত্রে তুই নিশ্চয়ই জানিস, ওই সময়কার অনেক গ্রিক মুদ্রা পাওয়া গেছে যেখানে হাতির প্রতিচ্ছবি আছে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর সময়ের একটা মুদ্রা পাওয়া গেছিলো, সেই মুদ্রায় খোদাই করা পাওয়া যায়— জ়িউস একটা হাতির ওপর বসে আছেন। পরবর্তী সময়ে ২০০ খ্রিস্টাব্দের সময়কালে বেশ কিছু ইন্দো-গ্রিক মুদ্রা পাওয়া যায় যেখানে হাতির ছবি খোদাই করা ছিল। তাহলে বুঝতেই পারছিস হাতির মাথার ধারণাটা ছিল; কিন্তু এর সঙ্গে হিউম্যান স্যাক্রিফাইস, বিকৃত যৌনাচার বা নরবলি ছিল না। এছাড়া তুই জাপানেই দেখ না। ওখানে শিনগন সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে গণেশ পূজার চল

আছে। জাপানে ‘গণবাচী’ নামে যে-একটা আলাদা গণেশ মূর্তির পূজা হয় কিংবা জোড়া মূর্তি হিসেবে ‘শো-টেন’ আর ‘কাঙ্গী-টেনের’ পূজা করা হয়, কোনোটার সঙ্গেই কিন্তু হিউম্যান স্যাক্রিফাইস বা নরবলি কিছু নেই। এবার জাপান ছাড়। সিল্ক রুট আর তিব্বত হয়ে মোঙ্গলিয়ায় গণেশের যে পূজার চল হয়, সেখানে গণেশের দুটো হাত, বাহন হিসেবে ইঁদুর নেই, ভুড়িওয়ালা পেট নেই; এই ব্যাপারগুলো নীলের স্বপ্নে দেখা হাতির মাথাওয়ালা মূর্তিটার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে; কিন্তু নরবলি ব্যাপারটা কিন্তু এখানেও দেখা যাচ্ছে না। এবার তুই মোঙ্গলিয়া-জাপান বাদ দিয়ে, সাউথ ইস্ট এশিয়ার যে-কোনো জায়গা ধর... হিউম্যান স্যাক্রিফাইস পাবি না। বালিতে গণেশের দুটো শুঁড়, কোনও ইঁদুর নেই বাহন হিসেবে। কম্বোডিয়াতেও একই কেস। গণেশের সঙ্গে কোনও ইঁদুর নেই, মোটা পেট নেই। থাইল্যান্ডে গণেশ একই সঙ্গে ফ্রা ফিকানেট আর ফ্রা ফিখানেশ্বর; অর্থাৎ বিঘ্নেষ এবং বিঘ্নেশ্বর। কিন্তু হিউম্যান স্যাক্রিফাইস কোথায়? খুঁজে দেখা! পাবি না!” শেষের কথা দুটো বেশ জোর দিয়ে বলে কিগান রিয়ার সামনে নিজের যুক্তি খাড়া করার জন্য।

“এই জন্য তোকে বলি অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী। নিজেই বললি সিল্ক রুট আর তিব্বত হয়ে গণেশের কনসেপ্ট ছড়িয়ে পড়েছে মঙ্গোলিয়ায়। কিন্তু তিব্বতে কী হয়েছে সেটা কি জানিস? জানিস না। তাহলে ফালতু ফালতু ভাট বকছিস কেন! জাপানের মতো, তিব্বতেও গণেশের দুটো রূপ। একটা রূপ ঝুটঝামেলা নির্মূল করে; আর আরেকটা রূপ ঝুটঝামেলা তৈরি করে; মানে বিঘ্ন কর্তা। ঠিক যেরকম ‘যজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি’ পুঁথিতে গ্রামদেবতা গণেশের যে বিঘ্ন কর্তারূপ আমরা দেখি সেরকমই। এবার শোন। বিঘ্নকর্তা গণেশকে তিব্বতে সবসময় দেখা যায় কালভৈরবের সঙ্গে। কালভৈরব হচ্ছে শিব। আমাদের ভারতের পুরাণেও গজাসুরের গল্প আছে। নাম শুনেই বুঝতে পাড়ছিস গজাসুরের দেহটা ছিলো হাতির। শিব এই গজাসুরকে মেরে, ওর গায়ের চামড়া খুলে এনে নিজের গায়ে জড়িয়ে নেন। আর এখানেও দেখ বাঁধা-বিঘ্ন ঘটানো গণেশের সঙ্গে ভৈরব। দুটো মিথের মধ্যে কি মিলটা বুঝতে পাচ্ছিস? শিব যেরকম গজাসুরের চামড়া নিজের গায়ে জড়িয়ে নেন, সেভাবেই নীলও স্বপ্ন দেখেছিল, কেউ একজন ওকে মেরে ওর গায়ের চামড়া খুলে নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল। তাই তো? কী... এবার কানেক্ট করতে পারছিস দুটো ঘটনা? এবার গণেশের দুটো রূপের মধ্যে, যে রূপ

বাঁধাবিঘ্ন নির্মূল করে, সেই রূপের বিবরণটা শোন। ওই গণেশের মাথাটা সাদা ধবধবে আর সমস্ত শরীর টকটকে লাল। এই লাল কীসের প্রতীক জানিস? রক্ত! আর এই গণেশের নাম তাই মহারক্ত গণপতি। তিব্বত ছেড়ে এবার নেপালে আয়। একবার পাচালি ভৈরবের হাতে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যায় একটা মেয়ে। মেয়েটা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায়। ও ঠিক করে, সেখান থেকে পালিয়ে যাবে। আহলেই পাচালি ভৈরবের হাত থেকে মুক্তি মিলবে। কিন্তু না... পালাতে গিয়ে মেয়েটার প্রিম্যাচিওর ডেলিভারি হয়ে যায় রাস্তায়। যে বাচ্চাটা জন্ম নেয়, তার মাথাটা হাতির। নাম হয় হেরাম্বা। এই হেরাম্বা হল নেপালের হাতির মাথাওয়ালা দেবতা; ওনাকে তুই গণেশের কাউন্টার পার্ট ভাবতে পারিস। এই হেরাম্বার বর্ণনাটা শোন। পাঁচটা মাথা, দশটা হাত আর বাহন সিংহ। এই হেরাম্বাকে মানত করে, রক্ত উৎসর্গ করার রীতি আছে নেপালে। এবার তুই কী করে নিশ্চিত হচ্ছিস, এই হেরাম্বার আইকনোগ্রাফিই তোর পেসেন্ট নীল স্বপ্নে দেখেনি?”

“না সেটা হওয়ার চান্স নেই। কারণ ও বলেছে ওই হাতির মাথাওয়ালা মূর্তিটার সামনে একটা বড়ো কুয়ো। সেখানে কেউ ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলো। আর হ্যাঁ, ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার আগে কয়েকজন ওর সারা গায়ে না-কি গাঢ় নীল রং মাখিয়ে করে দিয়েছিল। এসব রিচুয়ালের সঙ্গে তোর এগুলো ম্যাচ করছে না। আর তাছাড়া ও স্বপ্নে একজায়গায় দেখেছিল ওই হাতির মাথাওয়ালা প্রাণীটা একটা অদ্ভুত দেখতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেলছে।”

“এটার সঙ্গেও কিন্তু একটা মিসিং লিংক আছে।”

“কীরকম?”

“বার্মা...” নিজেকে সোফার ওপর একটু গুছিয়ে নেয় রিয়া।

“একটু খোলসা করে বল...” বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে কিগান।

রিয়া বলা শুরু করলো, “বার্মার লোককথা অনুযায়ী, একবার ইন্দ্র আর ব্রহ্মার মধ্যে প্রচণ্ড ঝামেলা বাঁধে। অনেকদিন কেটে গেল; কিন্তু সেই ঝামেলা মেটার না। অবশেষে একদিন ইন্দ্র ব্রহ্মার ওপর রেগে গিয়ে ব্রহ্মার গলা কেটে ফেলল। আর পরে রাগ ঠান্ডা হলে ইন্দ্র ব্রহ্মার সেই কাটা মাথার জায়গায় এনে বসাল একটা সোনালি হাতির মাথা। বার্মার লোককথা

অনুযায়ী ব্রহ্মার গায়ের রং টকটকে লাল। হাতির মাথা বসানোর পর আগের সেই এদিক থেকে ওদিক হলেই, ঝামেলা-ঝগড়া করা ব্রহ্মাই পরিবর্তন হয়ে শান্ত হল। এই ঘটনার সঙ্গেও আমাদের পুরাণের একটা ঘটনার মিল আছে; এখানেও কিন্তু বিঘ্নকর্তা গণেশ পরিবর্তিত হয়ে হয়েছিল বিঘ্নহর্তা। এবার কি তুই নীলের স্বপ্নে দেখা হাতির মাথাওয়ালা প্রাণীটার নিজের গলা কাটার ঘটনাটার সঙ্গে আমাদের চেনা গণেশের মিলটা ধরতে পাচ্ছিস?"

"পাচ্ছি... কিন্তু..."

"আর কিন্তু কী?"

"না ঠিক আছে সব। কিন্তু ওই গায়ে গাঢ় নীল রং মাখিয়ে কুয়ায় ধাক্কা মেরে ফেলার ব্যাপারটা? সেটা কিছুতেই কানেক্ট করতে পারছি না।"

"আরে ইয়ার, কিছু তো এক্সট্রা জিনিসপত্র দেখবেই। আফটার অল ওটা স্বপ্ন। আমার মনে হচ্ছে নীল ছেলেটা গণেশ নিয়ে এসব তথ্য কোথাও পড়েছিল। সেটাই মাথায় ঘুরছিল। আর তাই সেগুলোই স্বপ্নে দেখেছে। নাথিং এলস।"

"এত সহজ না ব্যাপারটা রিয়া। আর তাছাড়া ওই বাংলা অক্ষরগুলো। ওই সাতটা অক্ষরই বার বার ঘুরে-ফিরে নীলের প্রত্যেকটা স্বপ্নে আসছে। সেটারও কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না আমি। কারণ সাতটা অক্ষর এদিক-ওদিক করে অনেক সাজিয়েও আমি কোনও অর্থপূর্ণ শব্দ বের করতে পারিনি। তুইও চেষ্টা করে দেখতে পারিস। আমার ডায়রিতেই শেষ পাতায় পাবি অক্ষরগুলো..." কিগান আরো কী একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওর ফোনটা বেজে উঠল। নীলের মায়ের নম্বর থেকে কলটা এসেছে। ফোন রিসিভ করে কিগান, "হ্যালো?... হোয়াট!... কোন নার্সিংহোম? ওয়েল, আমি আসছি এক্ষুনি!"

ফোন রেখে, এক মুহূর্তও সময় নিল না কিগান। রিয়া কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলো, "কার ফোন? কে নার্সিংহোমে অ্যাডমিট?"

দরজা দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বেরোতে বেরোতে কিগান উত্তর দিলো, "নীল... বাকিটা ফিরে বলব। আসি! দরজাটা লাগিয়ে দিস। আর আমার ফিরতে লেট হতে পারে।"

৬

নীল ভরতি আছে মিত্র নার্সিংহোমের ৪০৮ নম্বর কেবিনে। নীলের মায়ের কাছ থেকেই ডিটেইলস জানতে পারল কিগান। ঘটনাটার সময় স্পটে যারা উপস্থিত ছিল, ওদেরই মুখেই শোনা, নীল না-কি কোর্ট মোড়ের অটোস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, হঠাৎ করে নিজে নিজে একা একাই কেমন সব অদ্ভুত আচরণ করছিল। শূন্যে হাত পা ছুড়ছিল... চারপাশে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে দেখতে থেকে থেকে গলাটা বিকট করে কেমন সব চিৎকার করে উঠছিল। তারপর হঠাৎ রাস্তায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়। চোখে-মুখে অনেক জল-টল দেওয়ার পরও যখন জ্ঞান ফিরল না, তখন নীলকে ওরা পাশের সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল। পরে নীলের মোবাইল ঘেঁটে লোকগুলো নীলের মায়ের নম্বরটা পায়। ওদের মধ্যেই কেউ একজন নীলের মা-কে কল করে ঘটনাটা জানায়। পরে বাড়ির লোক এসে, বন্ড সই করে নীলকে সরকারি হাসপাতাল থেকে নিয়ে গিয়ে পাশের মিত্র নার্সিংহোমে অ্যাডমিট করে।

এখন নীলের জ্ঞান এসেছে। কথাবার্তা স্বাভাবিক। ডাক্তার দেখে আলাদা করে কোনও অস্বাভাবিকতা কিছুই বুঝতে পারেনি। টেস্ট রিপোর্ট থেকে শুরু করে বাদবাকি সবকিছুই ওর নরমাল। তখনই না-কি নীলের মা কিগানকে কল করে ব্যাপারটা জানান।

কিগান নীলের মায়ের সঙ্গেই কেবিনে ঢুকল। নীল বেডে শুয়ে আছে। কিগানকে দেখে ও একটু নড়েচড়ে বসল। কিগানই বাধা দিয়ে বলল, "আহা, না না, তুমি শুয়ে থাকো নীল। রেস্ট করো... এখন কেমন আছ?"

নীল হালকা মাথা নাড়িয়ে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ ভালো..." কিগান লক্ষ্য করল নীলের মধ্যে এখনও কিছুটা দুর্বলতা আছে। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকার কারণেই হয়তো। কিগান নীলকে বলল, "আমি তোমাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না। শুধু তুমি আমাকে বলো তো... তোমার ঠিক কী হয়েছিলো?"

"আমি ঠিক জানি না। কোর্ট মোড়ে অটোর জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি লোকজনের মধ্যে থেকে কয়েকটা বীভৎস দেখতে প্রাণী ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসে আমাকে ঘিরে ধরছে। আর ওদের মধ্যে থেকে একটা লাল টকটকে প্রাণী এগিয়ে এসে আমার গায়ের চামড়াটা কেটে নিয়ে নিজের

গায়ে জড়িয়েছে। আর তারপরই আমি দেখছি, আমি মাটির ভেতরে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছি...”

নীলের কথাটা শুনে চমকে উঠল কিগান! মুহূর্তের মধ্যে ওর মনে পড়ে গেল রিয়ার কথা। রিয়া কিগানকে কিছুক্ষণ আগে এই গায়ের চামড়া কেটে গায়ে জড়ানোর ব্যাপারে বলতে গিয়ে গজান্তক শিবের কাহিনিটা শুনিয়েছিল। মহাদেব গজাসুরকে বধ করে, ওর গায়ের চামড়া ছিঁড়ে নিয়ে নিজের শরীরে জড়িয়ে নেন। নীলের এই হ্যালুসিনেশনের সঙ্গে কি পুরাণের ওই কাহিনিটার কোনও যোগ আছে?

কিগান হালকা স্বরে নীলকে জিজ্ঞেস করে, “কীরকম দেখতে ছিল প্রাণীগুলো? তুমি স্বপ্নে যেরকম দেখো, ওরকম?”

মাথা নাড়িয়ে উত্তর দেয় নীল, “হ্যাঁ...অনেকটা...”

“আর যে-লোকটা তোমার শরীর থেকে চামড়া কেটে নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল, সে? তার ব্যাপারে আরেকটু কিছু বলতে পারবে নীল?”

“আমার এখন ভালো করে ঠিক মনে নেই পুরোটা।”

“আচ্ছা থাক মনে করতে হবে না। আমরা এই ব্যাপারে পরে কথা বলব। আগে সেরে ওঠো। এখন তুমি রেস্ট নাও।”

নীল আবার বলে ওঠে, “ওই প্রাণীগুলোর গায়ে আলখাল্লা মতোন একটা পোশাক পরা ছিল। ওটার গায়েও ওই সাতটা বাংলা অক্ষর আমি দেখেছি, যেরকম স্বপ্নে দেখি। এক-একজনের গায়ের আলখাল্লায়, একেকটা অক্ষর। আর... আর...” কী একটা মনে করার চেষ্টা করে নীল। মুহূর্তে ওর নিস্তেজ চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। তারপর থেমে থেমে বলে, “আর স্যার, ওই চোখ দুটো... যে আমার ওপর নজরদারি চালায়... আমি দেখেছি...”

চমকে ওঠে কিগান, “তুমি তাকে দেখেছ? আমাকে বলতে পারবে—কীরকম দেখতে সে?”

মাথা নাড়ায় নীল, “আমি শুধু চোখ দুটো দেখেছি। ভয়ংকর... বীভৎস... টকটকে লাল দুটো চোখ। দেখলেই কেমন একটা ভয় করে। আমার ওপর নিঃশব্দে নজর রাখছিল। আমি তাকাতেই দেখলাম মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল। তারপর আর দেখতে পারিনি।”

“আচ্ছা চিন্তা কোরো না ওসব নিয়ে, অনেক সময় স্ট্রেস থেকে হয়

এসব। ঠিক হয়ে যাবে। আগে সেরে ওঠো, তারপর বাকি কথা সব হবে।"

কিগান বেরিয়ে আসছিল কেবিন থেকে। পেছন থেকে নীল ওকে ডেকে ওঠে, "স্যার..."

ঘুরে তাকায় কিগান, "কিছু বলবে?"

"আমি একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি আপনাকে..."

কিগান নীলের বেডের কাছে ফিরে আসে আবার। ঝুঁকে পড়ে নীচু গলায় বলে, "হ্যাঁ বলো..."

একটু আমতা আমতা স্বরে নীল বলে, "আমি আজ অবধি যতবার ওরকম অস্বস্তিকর স্বপ্নগুলো দেখেছি, প্রত্যেকবার ওসব নরবলির, খুনখারাপি, রক্তারক্তির পাশাপাশি স্বপ্নে আমি আরেকজনকেও দেখেছি।"

"কাকে?"

"আমার বড়ো মামিদিদুকে।"

"উনি এখন কোথায়?"

পাশ থেকে নীলের মা উত্তর দেন, "উনি বছর বিশেক হল মারা গেছেন।"

"আচ্ছা..." কিগান সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে আবার নীলকে জিজ্ঞেস করে, "তুমি ওনাকে কীভাবে দেখো? আই মিন, ঠিক কোন অবস্থায় দেখো ওনাকে? উনি তোমার স্বপ্নে এসে কী করেন? উনি কি তোমাকে স্বপ্নে কিছু বলেন? কিংবা, স্বপ্নে তোমাকে খুন করার চেষ্টা করেন?"

"না না... উনি সবসময় আমার স্বপ্নের মধ্যে কোনও একটা কোনায় দাঁড়িয়ে থাকেন। ওনার সারা শরীর আগুনে পোড়া। দগদগে ঘা। খুবলানো মাংস। উনি সমস্তটা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন। আর সব শেষে আমাকে ইশারায় হাত নেড়ে ওনার কাছে ডাকেন। কিন্তু আমার স্বপ্নের অদ্ভুত দেখতে লোকগুলো, বিশ্রী দেখতে প্রাণীগুলো আমাকে ওনার কাছে যেতে দেয় না।"

"তুমি কি তোমার বড়ো মামিদিদুকে আগেও স্বপ্নে দেখেছো? না কি এই ধরনের স্বপ্নগুলো যবে থেকে দেখা শুরু করেছ, তখন থেকে দেখছ?"

"না, এই অস্বস্তিকর স্বপ্নগুলো যেদিন থেকে দেখা শুরু করলাম সেদিন

থেকে। উনি প্রত্যেকটা স্বপ্নেই আসেন। আর এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন।"

"তুমি বললে যে স্বপ্নে ওনার সমস্ত শরীর আগুনে দগদগে পোড়া; সেক্ষেত্রে, তুমি স্বপ্নে ওনাকে চিনতে পারো কীভাবে?"

"আমাকে প্রত্যেকবারই কেউ একজন এসে ওনাকে চিনিয়ে দেয়।"

"কে?"

"আমি তাকে দেখতে পাই না। শুধু তাঁর গলার আওয়াজটা শুনি।"

"এই যে তোমার মনে হয়, তোমার কানের কাছে কেউ ফিসফিস করে কথা বলছে, এরকম আওয়াজ তুমি জেগে থাকলেও শুনতে পাও?"

"না... জেগে থাকলে না। যখন ঘুমাই, ওসব স্বপ্ন দেখি... তখন।"

"এছাড়া আর কোনোদিন শোনোনি?"

"শুনেছি তো... এই যে, কোর্ট মোড়ের এই ঘটনাটার সময় যখন খুনোখুনিগুলো চোখের সামনে আমি দেখছিলাম, তখন মনে হয়েছিল কেউ একজন আমার কানের খুব কাছে ঠোঁট নিয়ে এসে কীসব বলছে... ফিসফিস করে... আমি সেই ভাষাটা জানি না... কী বলছে, তার একবর্ণও বুঝতে পারছিলাম না। শুধু আওয়াজটা কেমন একটা তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। ওই আওয়াজটা শুধু আমিই শুনতে পাই। আর কেউ কখনও শুনতে পায় না। আমার ভেতর ভেতর কেমন একটা মনে হয়, ওই আওয়াজটা ওই দুর্বোধ্য ভাষায় আমাকে কিছু আদেশ করছে। কখনো-কখনো মনে হয়, আমার কানের কাছে আওয়াজটা একনাগাড়ে কোনও দুর্বোধ্য মন্ত্রপাঠ করছে। ঘুমের মধ্যে মনে হয়, আমি ওই আওয়াজটার সব কথা বুঝতে পারি। কিন্তু ঘুম ভেঙে গেলেই ওই ভাষাটা আমার দুর্বোধ্য লাগে। এমনকি মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি ওর কথা না-শুনলে ও আমাকে ছাড়বে না।"

"সেই আওয়াজটা আসলে কার? কিংবা, সে কে?— সেটা তুমি কোনোদিন স্বপ্নের মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করোনি?"

"দেখতেই তো পাই না তাকে। আর তাছাড়া এর আগে তো শুধু স্বপ্নেই আমি আওয়াজটা শুনতাম। এই প্রথম আমি স্বপ্নের বাইরে ওই আওয়াজটা শুনলাম।"

"বুঝলাম... আচ্ছা নীল, তুমি এখন রেস্ট করো। সুস্থ হওয়ার পর

আমরা একদিন বসব। ওসব নিয়ে কিছু ভেব না।"

নীল ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়ায়। কিগান কেবিন থেকে বেরিয়ে আসে।

বাইরে বেরিয়ে ও নীলের মা-কে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা নীল আগে কখনও এরকম রাস্তাঘাটে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়েছিল?"

ওর মা একটু ভেবে উত্তর দেন, "না, ঠিক সেটা না। কিন্তু ওই যে বড়ো মামিদিদার কথা বলল নীল, উনি হচ্ছেন আমার বড়ো মামার স্ত্রী। উনি যখন মারা গেলেন, তখন নীল ছোটো। বছর ছয়-সাত মতো বয়স হবে ওর। কিন্তু ওর সঙ্গে আমার বড়ো মামির অ্যাটাচমেন্ট বেশি ছিল। আগে তো আমরা গ্রামের বাসায় থাকতাম। নীলের সঙ্গে বড়ো মামির একটা আলাদারকমের ভাব-ভালোবাসা ছিল। তো ওনার মারা যাওয়ার সময়ে, খবরটা পেয়ে নীল অজ্ঞান হয়ে গেছিল।"

"উনি কীভাবে মারা যান?"

"সুইসাইড..."

"গায়ে আগুন দিয়ে কী? কারণ নীলের স্বপ্নে উনি দগদগে পোড়া শরীর নিয়ে আসেন।"

"না, ফাঁসি দিয়েছিলেন।"

"আপনাদের গ্রামের বাড়ি কোথায়?"

"সবারবাড়ি।"

"সেটা কোথায়?"

"জামালদহ থেকে রাণীরহাট হয়ে যেতে হয়।"

"কীভাবে যাওয়া যায়?"

"শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহারের যে বাসগুলো মাথাভাঙ্গা হয়ে যায়, ওই বাসগুলো ধরবেন। ওই রুটেই জামালদহ। জামালদহতে নেমে, অটো, টোটো সব পাবেন।"

"আমাকে আপনি আপনাদের সবারবাড়ি গ্রামের বাড়ির পুরো ঠিকানাটা দেবেন।"

"আচ্ছা আমি লিখে দিচ্ছি।"

"ওই বাড়িতে এখন কেউ থাকেন?"

"হ্যাঁ, ওখানে আমরা পুরোনো বাসিন্দা। আমার বড়ো মামা দামোদর চক্রবর্তীর নাম বললে সবাই এক নামে চেনে।"

"আচ্ছা... বেশ। আপনি আমাকে ঠিকানাটা লিখে দিন।"

নীলের মা কিগানকে ওদের গ্রামের বাড়ির ঠিকানা লিখে দিলেন। কিগান লেখাটায় একবার চোখ বুলিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর হঠাৎ নীলের মা-কে ও একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলো, "আচ্ছা, নীল যখন জন্মায়, তখন কোন মাস ছিল? বসন্তের প্রথম দিকে বা শীতের শেষের দিকে কি?"

"না, ওটা বসন্তকাল ছিল না। শীতের শেষে। মাঘ মাস ছিল। তখন প্রায় মাঘের শেষ। কেন বলুন তো?"

"না-না, কিছু না। এমনি জিজ্ঞেস করলাম। নাথিং এলস।"

আমতা আমতা স্বরে নীলের মা কিগানকে জিজ্ঞেস করেন, "নীলের ঠিক কী হয়েছে? আগে কত প্রাণবন্ত ছিল। বকবক করতে ভালোবাসতো। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারত। পুরো বাড়ি মাথায় করে রাখত। আর এখন... কেমন একটা নিস্তেজ হয়ে গেছে। সব সময় মনে হয়, কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আছে ও।"

"আমি একটা সম্ভাবনার ব্যাপারে চিন্তা করছিলাম বটে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটায় আমি এখনও নিশ্চিত নই। আরো কিছুদিন সময় লাগবে। আপনি ভাববেন না। নীল সুস্থ হোক। আমরা শিগগিরই আরেকদিন বসব। ততদিনে আমাকে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কিছু তথ্য জানতে হবে।

৭

কিগান একটা রোববার দেখে, সবারবাড়ি গ্রামে গেল। জামালদহতে বাস থেকে নেমে, টোটো ভাড়া করে রাণীরহাট। রাণীরহাট থেকে সবারবাড়ি। বিশাল গ্রাম। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে জলসূয়া নদী। নদীর পাড়ে পাড়ে নানান লোকদেবতার থান। চারদিকে সবুজ। চাষের জমির পাশে মাটি কেটে বানানো পুকুর। পুকুরে তিরতির করছে জল। জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে গাছের মরা ডাল। ডালের ওপর বসে কী যেন একটা পাখি বারদুয়েক অদ্ভুত একটা সুরে ডেকে ডানা ঝাপটে উড়ে চলে গেল। ছোটো ছোটো কাঁচা-পাকা বাড়িঘর রাস্তার দু-পাশে। বাড়িগুলোতে কোনও আড়ম্বর নেই। অথচ কী

আটপৌরে একটা ব্যাপার আছে। পাকা রাস্তা গিয়ে ভাগ হয়েছে দু-পাশের সরু কাঁচা মাটির রাস্তায়। বিচ্ছিন্ন ঝোপঝাড়, গাছগাছালি। গাছতলায় বাঁশের ওপর তক্তার ঠ্যাকনা দিয়ে বসিয়ে আড্ডার ঠেক বানানো হয়েছে। রাস্তার একপাশে তামাক চাষের জমি। দিনের বেলা বাড়ির সবাই মিলে তামাক তুলতে আসে। পাকা রাস্তা থেকে নেমে, মাটির সরু রাস্তা দিয়ে কিছুটা হেঁটে পর পর পাশাপাশি বেশ কয়েকটা বাড়িঘর চোখে পড়ল কিগানের। ও সেদিকেই এগিয়ে গেল। নীলের মা ওকে আগেই সমস্ত ঠিকানা লিখে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা দেখে বাড়ি খুঁজে পেতে কোনও সমস্যাই হল না। কিন্তু কিগান সরাসরি দামোদর চক্রবর্তীর বাসায় না-ঢুকে, আশেপাশের বাড়িগুলোতে নানান ছুতো সাজিয়ে খোঁজখবর নিতে লাগল। খোঁজখবর নিয়ে ওখান থেকে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কিগান জানতে পারল। দামোদর চক্রবর্তীর ওই বাড়িতে বর্তমানে থাকেন নীলের মায়ের ছোটো মামার পরিবারের লোকজন। দামোদর চক্রবর্তীর বাবা ছিলেন সেকালের জোতদার। প্রচুর জমিজমা। ওরা হল পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মণ। শোনা যায় কোচবিহারের রাজা বহু বছর আগে মিথিলা-কনৌজ এসব জায়গা থেকে ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে ডেকে এনে কোচবিহারের মধ্যে পাঁচটা গ্রাম ওদের মধ্যে ভাগ করে দেন। পাঁচটা গ্রাম ভাগ করে দেওয়া ব্যাপারটা থেকেই পঞ্চগ্রামী কথাটা এসেছে। একটা সময় রাজবাড়ির যাবতীয় পূজার দায়িত্বে এই পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মণরাই না-কি কেবল থাকতে পারত। তো যাই হোক, এই দামোদর চক্রবর্তীর পূর্বপুরুষরা জমি হিসেবে পেয়েছিল খাগড়াবাড়ি গ্রামটা। পরবর্তীতে ওনারা খাগড়াবাড়ির জমিজমা সব বিক্রি করে দিয়ে সবারবাড়ি গ্রামে থিতু হন। এই গ্রামেও দামোদর চক্রবর্তীর সম্পত্তি ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে। একটা সময় ভদ্রলোকের দারুণ প্রতিপত্তি ছিল এখানে। এখন রাজ আমলও নেই, আর আগের সেই প্রতিপত্তিও নেই। দামোদর চক্রবর্তী যখন মারা গেলেন, ওনার স্ত্রী, মানে নীলের বড়ো মামিদিদার বয়স তখন অনেক কম। বছর কয়েক আগে সবে বিয়ে হয়ে এসেছিলেন। ভদ্রমহিলার নাম ছিল ইন্দুবালা। কমবয়সে বিধবা; তার ওপর নিঃসন্তান। ভদ্রমহিলার জীবনটা খুব কষ্টের। আর তার ওপর তখনকার দিনে কমবয়সে কেউ বিধবা হলে, নানা সমস্যার মুখে তাকে পড়তে হতো। পাড়া গাঁয়ের কেউ-ই ওকে ভালো নজরে দেখত না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডাইনি, অপয়া এসব অপবাদ দিয়ে ব্রাত্য

করে রাখা হতো। রটানো হতো, ওই বউটাই না-কি নিজের স্বামীটাকে খেয়েছে। কমবয়সে কেউ বিধবা হলেই, সেটাকে অশুভ ব্যাপার মনে করা হতো তখনকার দিনে। ইন্দুবালাও ব্যতীক্রম ছিলেন না।

"আচ্ছা উনি, মানে ওই ইন্দুবালা দেবী, কীভাবে মারা গেলেন?" কিগান প্রশ্ন করল।

হাতের বিড়িটায় একটা লম্বা টান দিয়ে খুকখুক করে কাশতে কাশতে উত্তর দেন সবীল বর্মণ, "উয়াক ওই কদমতলী ধরচিলো..."

দামোদর চক্রবর্তীর বাড়ির দু-তিনটা বাড়ির পরই সবীল বর্মণের বাড়ি। ছিপছিপে চেহারা। তেলতেলা মাথায় কাঁচা-পাকা ছোটো ছোটো চুল। বুকে পেটে এক হওয়া চেহারা। দেখে মনে হয় গায়ের চামরাটা হাড়ের ওপর চেপটে আছে। খালি গা। পরনের তিলা পড়ে যাওয়া লুঙ্গিটা হাঁটু অবধি গোটানো। দাওয়ায় বসে কিগানকে ঘটনাটা শোনাচ্ছিল।

কিগান জিজ্ঞেস করে, "কদমতলী কে?"

"ও তোমরা জানেন না না?"

ঘাড় নাড়ায় কিগান।

হেসে ওঠে সবীল বর্মণ, "কদমতলী হল, এই গ্রামের দেবতা..."

"একটু খুলে বলুন বিষয়টা..." কৌতূহলী হয়ে কিগান জিজ্ঞেস করে।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে উত্তর দেয় সবীল বর্মণ, "তাহলে শোনো... ওই কদমতলী আগত মানসী ছিল, বুচচেন..."

"মানসী ছিল মানে? কদমতলী একজন মানুষ ছিল আগে?"

"হ্যাঁ... কদমতলী বুড়ির ঘর ছিল ওই জলসূয়াটার পারত... আগত তো সবাই নদীর জল খেত। ওই জল খায়া, বুড়ি ডায়রিয়া হয়া মরচে... ডায়রিয়ার মরা... মরা তো ওটি পড়ি রইল। ডায়রিয়ার মরা কেউ ছোঁয় না। তারপরে কয় বছর কাটিল। উয়ার জমি তো এমনি এমনি পড়ে রইল। কয় বছর পর জমিখান এক মুসলমান মানসী কিনি নিলেন। তখন থাইক্যা গ্রামের মানসীগুলা কদমতলী বুড়ির স্বপ্ন দ্যাখে... স্বপ্নে বুড়ি কইল— তোরা মোক এলা পূজা দে... পূজা না-দিলে গ্রামের মানসীগুলাক বুড়ি ভয় দ্যাকাইতো। গ্রামের মানসীগুলাক কথা শুনি আমরা ওটে দেখির গেলোং... বুড়ির ঘরের বগলত একটা কদম গাছ ছিল... ওর নীচত বুড়ির পূজার থান বানায়

দিলাম। ওটে দইচূড়া, পারো দিয়া আমরা পূজা দেই।"

"দইচুড়া মানে তো দইচিঁড়া... পারো মানে কি পায়রা?"

"হ্যাঁ..."

"এই কদমতলীই ইন্দুবালা দেবীকে ধরেছিল?"

"হ্যাঁ..."

"কিন্তু কদমতলী হঠাৎ করে ইন্দুবালা দেবীকে ধরল কেন?" কিগান আবার প্রশ্ন করে।

সবীল বর্মণ উত্তর দেয়, "কদমতলী বুড়ির খুব রাগ ছিল... তাহলে একটা কথা কই শোনো... ওই জমির মালিক, আমছারউদ্দিন মিঞা, একবার ফরিদপুর থাকি তিনট্যা মিসতিরি ডাকি নিয়া আসিল কদম গাছটা কাটার জন্য। খবর শুনি, আমরা সবাই ওটে গেলোং... আমছারউদ্দিনকে কদমগাছ কাটির দিব না। লোকটা শোনেই না... জোরজবস্তি তিনট্যা মিসতিরি কদম গাছ কাটল। সেই রাইতোত সবাই যখন ঘুমাইচে... কদমতলী বুড়ি দুইট্যা মিসতিরির ওপর আক্রমণ করল। পরেরদিন সকালে ওই মুসলমান বাড়িত দুইট্যা মিসতিরিই মরি ছিল। আর আরেকজন মিসভিরি তো ভয়ে ফরিদপুর পালাইচে। তার বছরখানেক পরে জলসূয়ার বন্যাত কদমতলীর জমিটা ডুবি গ্যাছে। তারপর আমরা কয়জন, আমার বাড়ির উত্তর পাশত কদমতলী বুড়ির পাকা থান বানে দিলাম। মূর্তি-টূর্তি কিছু নাই। এমনি থানটা আছে। তারপর ওইপাশে কেউ চিৎকার চ্যাঁচামেচি করলে, জোরে গান করলে, কদমতলী বুড়ি ক্ষেপে গিয়ে তার ওপর ভর করে। ইন্দুবালারও তেমন দশা হচিল। কদমতলীর থানের ওটে জল আনির গেছিল। ওটে একটা দিঘি আছে বুচচ। জল নিয়ে নিজের মনে গুনগুন করে গান করি আসি ধচচিল। ব্যাস... রাগ হয়া গেল কদমতলী বুড়ির। আসি ভর করিল ইন্দুবালার ওপর। ব্যাস... তখন তো বউটার পাগলি পাগলি অবস্থা। নয়া নয়া তো আমরা কেউ কিছু বুঝি নাই। খুব ভালোই ছিল। কিন্তু তারপরেই... একদিন আমার এটেকার একটা ছেলে দেখচিল ইন্দুবালা না-কি বাড়ির সামনে দাঁড়ায় ভর সইন্ধ্যাবেলা নিজের মনে বিড়বিড় করছিল। অথচ ওর সামনত কেউ ছিল না। ওই ছেলেটাকে দ্যাখার পরই বিড়বিড় করা বন্ধ করে। কৎক্ষণ ড্যাবড্যাব করে ছেলেটার দিকে তাকায়। তারপরে দৌড়ে যায়া ঘরত ঢুকচে আর

দরজা বন্ধ করি দিচে। আমরা তো শুনতাম, মধ্য রাইতোত ইন্দুবালার ঘর থ্যাকি পুরুষ মানসীর কথা শোনা যেত। বাইরে থেকে শুনি মনে হইত ঘরের ভিতর থ্যাকি একটা ছেলে আর একটা মেয়ের নিজের ঘরের মইধ্যে কতা কইতেচে। একবার কী হইচে... বাড়ির মানসীগুলা পুরুষ মানসীর গলার আওয়াজ পায়্যা ওই রাইতোত ইন্দুবালার ঘরের দরজা ভাঙি ঢোকে... দ্যাখে... কই... ঘরে কেউ নাই... খালি একলাই ইন্দুবালা বিছানাত চিৎ হয়্যা ঘুমায় আছে। কিন্তু জানো... তারপরেও অনেকদিনই ইন্দুবালার ঘর থ্যাকে পুরুষ মানসীর গলা শোনা যেত। তারপর একদিন শোনো কী হইল... গাও ধুবার ঢুকচে ইন্দুবালা। গা ধুতে ধুতে খুব ভয় পায়্যা, ভিজা গায়ে, জামাকাপড় ছাড়া বাইরে আচচে। আশেপাশের মানসী ওভাবে ইন্দুবালাকে দেখে অবাক হচে। কেউ কথা কয় না। ইন্দুবালাক দেখি মনে হয় বাথরুমত কেউ ছিল... তাক দেখিই ও ভয় পাচে। কিন্তু বাথরুমত ইন্দুবালা ছাড়া কেউ ছিল না। তাহলে এলা উমায় কাক দেখি ভয় পাইল বলো? ইন্দুবালা অত বড়ো বাড়ির বউ... তারওপর বিধবা মানসী। দামোদর চক্রবর্তীকে এই এলাকার মানুষ কত সম্মান দ্যায়। সেই দামোদর চক্রবর্তী মারা যাওয়ার পরে, লোকে কত কথা শুনাইচে ইন্দুবালাকে। তার ওপর এই কাণ্ড। বোঝো একবার অবস্থাটা। তার পরেরদিন থাকি নানারকম সমস্যা দেখা দিচিল। ইন্দুবালার মুখে লাল লাল ছোপ ছোপ... চোখ দুইট্যা টকটকা লাল। একা একাই বিড়বিড় করে। থাকি থাকি নিজে নিজেই হাসে... আবার পরক্ষণেই ধরো কাঁদতে থাকে। ওকে ঘরত রাখাই যায় না। ওই বউকে টাইনেটুইনে যত ঘরে নিয়ে আসে বাড়ির লোক... ওই বউ আবার চলি যায় ওই কদমতলীর থানে। তখন সবাই বুজিল নিশ্চয়ই উয়াক কদমতলীই ধরচে। শ্যাষত ইন্দুবালাকে দরজা বন্ধ করি আটকে রাখা হইল। তাছাড়া আর উপায়ও নাই। বাড়ির লোকগুলা সবাই মিলে ঠিক করল, পরেরদিনই ইন্দুবালাকে ধনঞ্জয় কবিরাজের কাছে নিয়ে গিয়্যা ঝাড়ফুঁক করায়, কদমতলীর থানে দইচুড়া মানত করায় নিয়ে আসা হবে। আর পরেরদিন কোই... পরেরদিন সকালে উঠি সবাই দ্যাখে মেয়ে ঘরে ফাঁসি দিয়ে ঝুলছে...”

সবীল বর্মণ কিগানকে নিয়ে গেছিল কদমতলীর থানের ওখানে। সিমেন্টের ঢালাই করে তিন দিক ঘেরা একটা থান। সামনে সিমেন্টের খুঁটি। পাকা মেঝে করা। মেঝের ওপর কয়েকটা পাথরখণ্ডের গায়ে সিঁদুর লেপে

দেওয়া। সবীল বর্মণ কিগানকে কদমতলীর থানটা দেখাতে দেখাতে বলে, "আগে যার-তার ওপর ঠাকুর ভর করত। আর এই কদমতলী ভর করলে তাঁকে বাঁচানো দায় হতো আমাদের। তারপর কালাচাঁদ বর্মণ গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দান করে আসল কদমতলীর নামে, তারপর থেকে এখন একটু দমেছে এই ঠাকুর। কিগান কোনও উত্তর দেয় না। একদৃষ্টিতে কদমতলীর থানটার দিকে তাকিয়ে কী একটা চিন্তা করতে থাকে একমনে। মাথার ভেতর অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন প্রশ্ন মাথা চারা দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রশ্নগুলোকে একসঙ্গে আনা যাচ্ছে না... কী একটা মিসিং লিংক আছে... কিগানকে সেটাই খুঁজে বের করতে হবে। কিগানের পাশে দাঁড়ানো সবীল বর্মণ বিন্দুমাত্র সেসব আঁচ করতে পারে না।

৮

আমছারউদ্দিনের এখন প্রায় আশির ওপর বয়স। চেহারা ভেঙে গেছে। দু-পাশের গালের চামড়া চুপসে গিয়ে চোয়ালটা বিশ্রীভাবে বেরিয়ে এসেছে। কোটরে ঢোকানো দুটো চোখ। মাথাভরতি ধবধবে সাদা চুল। গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। সারা মুখে অজস্র বলিরেখা।

কিগান আমছারউদ্দিনের দাওয়ায় বসে কথা বলছিল। ইটের গাথনি করা সাদামাটা বাড়ি। ওপরে টিনের চাল। সামনে মাটির উঠান। দুপুরের রোদ এসে পড়েছে উঠানের গায়ে। বাড়ির গা লাগোয়া একটা নারকেল গাছ। ঝিরিঝিরি পাতাগুলো উঠানের গায়ে রোদের ওপর নানান নকশা তৈরি করেছে যেন। আমছারউদ্দিনও ইন্দুবালাকে ভালো করেই চেনে। তারও প্রকট বিশ্বাস ইন্দুবালাকে কদমতলীই ধরেছিল। নীচু গলায় কিগানকে আমছারউদ্দিন বলছিল, "মুইও কি আগত বিশ্বাস করচোং? গ্রামের মানুসীগুলা কইলো, আমছার কদমগাছটা কাটিস না... এইবার দ্যাখেন, এতগুলা দিন ধরি জমিখান এমন করি পড়ি আছে। কেনার পরে থাকি জমিটায় হাত দিবারি পায় না। অনেক বছর আগে কদমতলী বুড়ির বাড়ি না-কি ওই কদমগাছটার তলায় ছিল। মরার পর ওটে হইল বুড়ির থান। রোজ সকালে না-কি দেখা যেত, আশেপাশের জঙ্গল-ঝোপঝাড় সব অমনই পড়ে আছে; কিন্তু কদমগাছটার নীচের জায়গাখান কে যেন রাতেরবেলা

এসে পরিষ্কার করি দিয়া যায়। মুই আগত এমন কথাত কান দ্যান নাই। ফরিদপুর থ্যাকে মিসতিরি ডাকি আনি কদমগাছটা কাটলুং। তারপরের থ্যাকেই শুরু হয় বুড়ির অত্যাচার। ওই রাইতোত ঘুমানো অবস্থায় দুইজন মিসতিরি মারা গেল। যে-মিসতিরিটা বাঁচি ছিল, সে ভয়ের চোটে পালায় গ্যাছে।"

"যে-মিস্ত্রীটা বেঁচে গেছিল, তার খোঁজ পাওয়া যায় পরবর্তীতে?"

"হ্যাঁ... ফরিদপুরত আমার পুরানো বাড়ি ছিল। ওরা তিনজনই ওটেকার লোক।"

"যদিও এতগুলো বছর আগের ঘটনা। তবু্ও, কোনও ঠিকানা দিতে পারেন?" কিগান জিজ্ঞেস করে।

আমছারউদ্দিন একটু ভেবে উত্তর দেয়, "ঠিকানা... হ্যাঁ সেটা দিবার পাই। সমস্যা নাই। কিন্তু ব্যাপার হল, ঘটনাটা কী কন তো... এতদিন পর ফারুকের ঠিকানা চান... কিছু হইচে?'

"না তেমন কিছু না। কিছু তথ্য জানার আছে। এটুকুই। ওর নাম ফারুক?"

মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায় আমছারউদ্দিন।

ঠিকানা নিয়ে ফিরে আসছিল কিগান। হঠাৎ কী একটা মনে হওয়াতে ফিরে এসে আবার আমছারউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, সেদিন রাতে ওই বাকি দু-জন মিস্ত্রীর মধ্যে কোনোরকম অস্বাভাবিকতা দেখেছিলেন?"

একটু চিন্তা করে উত্তর দেয় আমছারউদ্দিন, "না, তেমন কিছু নয়। খালি ফারুক আসি আমার কাছে মালিশের ত্যাল নিয়ে গ্যাছে। আসলে সারাদিন কাজ করে, ইলিয়াস আর আখতারের পায়ের ব্যথা হচিলো।"

"আচ্ছা... আপনি তেলের শিশিটা দিলেন ফারুককে?"

"হ্যাঁ... না-দিবার তো কোনো কারণই নাই..."

"বুঝলাম... কোন আয়ুর্বেদিক তেল দিয়েছিলেন মনে আছে কী?"

"আমাদের এটেকার কবিরাজের কাছ থ্যাকে আনা তেল। বাড়িত ছিল। বিষব্যাদনা হইলে আমরা সবাই মাখি ওই তেল।"

"বুঝলাম। আচ্ছা ধন্যবাদ। আসছি..." কথা শেষ করে ফিরে যায়

কিগান। ফিরতে ফিরতে কিগান ফারুকের ঠিকানাটায় চোখ বোলাতে বোলাতে প্ল্যান করে মনে মনে একবার ফরিদপুর যেতে হবে। এই রহস্যের সুতোর শেষ জটটা ফরিদপুরে আছে। সেটাকে একবার আলগা করতে পাড়লেই...

নিউ জলপাইগুড়ি জংশন থেকে সকাল এগারোটা পয়তাল্লিশে মিতালি এক্সপ্রেস ছাড়ে। সেটা করে প্রথমে চিলাহাটি। চিলাহাটি স্টেশন থেকে পোড়াদহ। পোড়াদহ রেল জংশন থেকে ফরিদপুর। ফরিদপুর স্টেশনে নেমে আরো দেড় কিলোমিটার হাঁটা পথ। ফরিদপুর ঢুকতে ঢুকতে পরদিন দুপুর গড়িয়ে গেল।

ঠিকানা জিজ্ঞেস করে ফারুক মিয়াঁর বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। ফারুক মিয়াঁর বয়স এখন সত্তর ছুঁইছুঁই। চোখে প্লাস পাওয়ারের মোটা চশমা। কাচের ভেতর থেকে ওনার চোখ দুটো আকারে আরো বড়ো দেখাচ্ছে। কাঁচা-পাকা চাপ দাড়ি। মাথায় টাক। পরনে ঢোলা মতোন একটা তিলা পড়া ময়লা জামা আর চেক-চেক লুঙ্গি। কিগানকে একটা বেঞ্চের ওপর বসতে দিয়ে ফারুক মিঞা ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো স্টিলের গ্লাস নিয়ে বাইরে এলেন। গ্লাস দুটো থেকে ধোঁয়া উড়ছে। একটা গ্লাস ফারুক মিঞা কিগানের দিকে এগিয়ে দিলেন। কিগান গ্লাসটা হাতে নিয়ে দেখে, ফারুক মিঞা চা বানিয়ে এনেছে। দু-জনে চা খেতে খেতে এটা-ওটা সেটা কথা বলছিল। হঠাৎ কিগানই প্রসঙ্গটা তুলল, "আমি আপনার কাছে অন্য একটা দরকারে এসেছিলাম ফারুকবাবু।"

"জি জি বলেন..." চায়ে চুমুক দিতে দিতে ফারুক মিঞা বলে।

"বহু বছর আগে আপনি এবং আপনাদের এদিককার আরো দু-জন মিলে সবারবাড়ি গ্রামে আমছারউদ্দিনবাবুর জমিতে কোনও গাছ কাটতে গেছিলেন?"

মুহূর্তে ফারুক মিঞার হাসিখুশি মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। ওনার দু-চোখের মধ্যে যে উষ্ণতা আর আতিথেয়তা কিগান একটু আগেও লক্ষ করেছে, সেটা মুহূর্তে যেন উবে গেছে। চোয়াল দুটো কেমন জানি শক্ত হয়ে গেল ওনার। কিছুক্ষণ থম মেরে চুপ করে বসে রইলেন উনি। কিগানও কোনও কথা বলল না আগ বাড়িয়ে। কী একটা চিন্তা করে কিছুটা থেমে

থেমে বেশ কিছুক্ষণ পর উত্তর দিল ফারুক মিঞা, "জি..."

এত সংক্ষেপে উত্তর কিগান নিজেও আশা করেনি। ও আবার বলে, "সেই বিষয়েই কিছু কথা ছিল ফারুকবাবু..."

"জি বলেন..."

কিগান গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে চা-টুকু শেষ করে, নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে বলা শুরু করল, "আপনারা গেলেন... গাছ কাটলেন। স্থানীয়রা আপত্তি করেছিল জানি। তবু কদম গাছটা কাটা হয়েছিল। তারপর সেদিন বেলা গড়িয়ে যাওয়ায়, আমছারউদ্দিনবাবুর বাড়িতেই আপনারা তিনজন রাতটুকু কাটিয়েছিলেন। ওখানেই খাওয়াদাওয়া সারলেন। ঘুমালেন। পরদিন সকালে উঠে দেখলেন আপনার বাকি দু-জন সঙ্গী মরে পড়ে আছে। তাই তো?"

"সবটাই তো আপনি জানেন। তাহলে আমার কাছে কী জানার জন্য এত দূর এলেন?" শান্ত অথচ রুক্ষ গলায় কথাটা বলল ফারুক মিঞা।

কিগান বলল, "আপনিও কি বিশ্বাস করেন আপনার সঙ্গীদের ওই গ্রামের লোকদেবী কদমতলী মেরে ফেলেছে?"

"তাছাড়া আর অন্যকিছু ভাববার কারণ আছে কি?"

"না-না, আমি সেটা বলছি না... কিন্তু ধরুন... অন্য কোনও কিছুও তো হয়ে থাকতে পারে।"

"দু-জন জোয়ান ছেলে... তখন কত আর বয়স হবে— কুড়ি-বাইশ বছর... রীতিমতো গায়েগতরে খাটতে পারত দু-জনই। সুস্থ স্বাভাবিক দুটো মানুষ, কাজ করে ফিরল... রাতে খাওয়াদাওয়া করল... ঘুমালাম একসঙ্গে... পরদিন উঠে দেখি নাই... সব শেষ! এটাকে কি আপনি স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে দেখেন?"

"কিন্তু..." কিগানের কথা শেষ করতে না-দিয়েই ফারুক মিঞা আবার বলে ওঠে, "সেদিন যদি গ্রামের লোকের কথা শুনতাম... কদমগাছটা না-কাটলে হয়তো..." শেষের কথাটুকু বলতে গিয়ে কেমন যেন গলাটা কেঁপে ওঠা ফারুক মিঞার।

কিগান কী একটা চিন্তা করে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করে, "ওদের লাশ দুটো কি ঘরের ভেতর পড়েছিল, না কি বাইরে?"

ফারুক মিঞা সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয়, "জি না... ঠিক যেখানে ঘুমিয়েছিল ওই অবস্থাতেই... আমি তো সকালে উঠে দেখি ওরা তখনও শুয়ে। আমি ভাবলাম ঘুমাচ্ছে। এদিকে বেলা গড়ায়... বেরোতে হবে। অনেকটা রাস্তা যেতে হবে। দেরি করলে চলে না। ডাকতে গিয়ে দেখি কোনও সাড়া দেয় না দু-জনে। শেষে নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে দেখি নিঃশ্বাস পড়ে না। তখন লোক ডাকাডাকি করে..." শেষ কথাটুকু আর শেষ করতে পারে না ফারুক মিঞা। থেমে যায় হঠাৎ করে। বাকি কথাটুকু কিগান নিজেই আন্দাজ করে নেয়।

কিগান জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, মারা যাওয়ার আগের দিন রাতে ওদের মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা দেখেছিলেন? কিংবা অসুস্থতা?"

"জি না..."

"ভালো করে মনে করুন তো। আমছারউদ্দিনবাবু বললেন, আপনি না-কি ওদের দু-জনের পায়ে মালিশ করার জন্য আয়ুর্বেদিক তেল নিয়ে গেছিলেন ওনার কাছ থেকে চেয়ে?"

কিছুক্ষণ চিন্তা করে উত্তর দেয় ফারুক মিঞা, "জি জি, ঠিক কথা... কিন্তু পায়ের ব্যথাকে অস্বাভাবিকতা কীভাবে বলি বলুন? সারাদিন খাটনির পর পায়ে ব্যথা হওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।"

"আপনারও হয়েছিল?"

"কী?"

"পায়ে ব্যথা?"

"জি না আমার হয়নি।"

"আপনি তেলটা এনে মালিশ করে দিলেন?"

"জি না... ওদের দিলাম... ওরাই নিজেরা নিয়ে মালিশ করেছিল। আসলে কাজ থেকে ফেরার পর থেকেই বলছিল পায়ে না-কি খুব ব্যথা করছে। খাওয়াদাওয়ার পর ব্যথাটা বাড়ে। আসলে সারাটা দিন খাটনি গেছিল। আমি আমছার সাহেবের কাছে গিয়ে মালিশের তেল চাই। আমছার সাহেব আমাকে ওই তেলটা দেয়। আমি এনে দেই ওদের। ওরা পায়ে মালিশ-টালিশ করে শুয়ে পড়ে। আর পরদিনই..."

"বুঝলাম... কিন্তু একটা খটকা আমার মাথা থেকে যাচ্ছে না

ফারুকবাবু...”

“কী?”

“সারাদিন গাছ কাটল হাত দিয়ে... অথচ দিনের শেষে হাতে ব্যথা না-হয়ে, পায়ে ব্যথা হল... এটা একটু অস্বাভাবিক না?”

কটমট করে তাকায় ফারুক মিঞা। তারপর ঝাঁঝালো গলায় উত্তর দেয়, “কী বলতে চাচ্ছেন আপনি? আপনি লোক সুবিধার নন... আপনি আসেন পারেন... আপনার সঙ্গে আর কোনও কথা নাই আমার।”

কিগান কী একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। তাকিয়ে দেখল ফারুক মিঞার মুখের দিকে। কী কঠোর রুক্ষ লাগছে এখন ওনার মুখটা। কিগান আর বিষয়টা নিয়ে বেশি ঘাটায় না। বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানাতে যাচ্ছিল, তার আগেই ফারুক মিঞা ওর মুখের ওপরই দরজা বন্ধ করে দেয়।

৯

কিগান একটা চেয়ারে বসে আছে। ওর সামনে বসে আছে নীলের মা। ভদ্রমহিলাকে দেখলেই বোঝা যায় কী একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে ওনার ভেতর দিয়ে। এই কয়দিনেই ওনার চোখ-মুখ শুকিয়ে গেছে। চোখের চাহনিতে একটা অসম্ভব চাপা অশান্তি। কিগান কথা শুরু করল, “আমি সবারবাড়ি গ্রামে গেছিলাম...”

“আচ্ছা...” ভদ্রমহিলা গলার স্বর কেমন যেন নিষ্প্রাণ। কী একটা অসম্ভব অস্থিরতা উনি ঢাকার চেষ্টা করছেন কিগানের কাছ থেকে।

কিগান আবার কথা শুরু করল, “দেখুন, আমি একটু ধাপে ধাপে এগোব। আপনাকে শান্ত হয়ে বসে শুনতে হবে। সেই জন্যই আজকে আপনাকে ডাকা এখানে।”

“হ্যাঁ বলুন...”

“আগে বলুন নীল কেমন আছে এখন?”

ভদ্রমহিলা কোনও উত্তর দিলেন না। ম্লান হাসলেন। তারপর নীচু গলায় বললেন, “বাড়িতে আছে।”

"এখনও ওরকম স্বপ্ন দেখছে কিছু?"

'হ্যাঁ'-সূচক ঘাড় নাড়ান ভদ্রমহিলা।

কিগান একটু থেমে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে শুরু করল, "আপনি সেদিন বললেন, আপনার বড়ো মামি মারা গেছেন গলায় ফাঁস দিয়ে। কিন্তু ওখানকার আশেপাশের মানুষদের কিন্তু আজও বিশ্বাস ওনার ওপর কদমতলী ভর করেছিল।"

"হ্যাঁ, কদমতলী সত্যি সত্যিই ভর করেছিল বড়োমামির ওপর। ওই অপ্রাকৃতস্থ অবস্থাতেই বড়োমামি গলায় ফাঁস দিয়ে মরে।"

"আপনি সেদিন এই কদমতলীর বিষয়টা কোনও কারণে আমার থেকে এড়িয়ে গেছেন। আমি জেনেছি এই ঘটনাটা ওই গ্রামে গিয়ে। তবে আমার একেবারেই সেটা মনে হয় না। কিন্তু আমি যখন প্রথম এটা শুনি, তখন আমার মনের মধ্যে প্রশ্ন এসেছিল, ঠিক কী কারণে লোকের মনে হয়েছিল ওনার ওপর কদমতলী ভর করেছিল? প্রত্যেকটা বিশ্বাসের পেছনেই একটা শক্তপোক্ত ব্যাখ্যা থাকে। সেটা অবৈজ্ঞানিক হলেও, যুক্তি একটা ঠিকই থাকবে। আমি এক্ষেত্রেও সেই যুক্তিটা খুঁজতে চাইছিলাম। আগে কদমতলীর বিষয়টায় বলি। ওই অঞ্চলের মানুষ এখনও এটাই বিশ্বাস করে ইন্দুবালা চক্রবর্তীর ওপর কদমতলী ভর করেছিল। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, এই কদমতলী নামে বহুকাল আগে ওই গ্রামে সত্যি সত্যিই একজন মানুষ ছিল। জলসূয়া নদীর পারে একটা কদম গাছের নীচে কদমতলী একটা ঝুপড়ি ঘরে থাকত। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় ওই বয়স্কা মহিলার নাম আদৌ কদমতলী ছিল না। অন্য কোনও একটা নাম নিশ্চয়ই ছিল, যেটা স্থানীয়রা জানত না। কদমগাছের তলায় একটা বুড়ির ঝুপড়ি আছে— এখান থেকেই স্থানীয়দের মুখে মুখে ঘুরতে ঘুরতে, ওই বুড়ির নাম হয়েছে কদমতলী। তো একবার আপনাদের সবারবাড়ি গ্রামে ডায়রিয়া হয়; আর ওই ডায়রিয়ার প্রকোপে কদমতলী মারা যায়। এবার তখনকার দিনে কারও ডায়রিয়া হলে আশেপাশের লোকজন তাঁকে একরকম ব্রাত্য করে রাখত। কেউ রোগীর কাছে যাওয়ার সাহস পেত না। বেশিরভাগক্ষেত্রেই চিকিৎসার অভাবে রোগী মারা যেত। রোগী মারা গেলেও কেউ ডায়রিয়ায় মরা রোগীর মৃতদেহ ধরার বা সৎকারের সাহস পেত না। পাছে রোগটা ওই রোগীর থেকে ওদের মধ্যেও ছড়ায়... এটাই ছিল ওদের ভয়। কদমতলী বুড়ি

ডায়রিয়ায় মরল। কিন্তু স্থানীয়রা কেউ-ই বুড়ির ওখানে গেল না... ডায়রিয়ায় মরা কদমতলী বুড়ির লাশ নিয়ে গিয়ে সেটাকে সৎকার করার সাহসও কেউ পেল না। ফলে লাশটা ওভাবেই পড়ে থাকল। এরপর ডায়েরিয়ার প্রকোপ কমল। কিন্তু যেহেতু কদমতলীর লাশের সৎকার করা হয়নি, তাই স্থানীয়দের মধ্যে বিশ্বাস জন্মায়— নিশ্চয়ই কদমতলী বুড়ির অতৃপ্ত আত্মা ওই এলাকায় ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে। সেই কারণে ভয়ে লোকজন কদমতলী বুড়ির ঘর যেখানে ছিল, ওখানে যাওয়ারও সাহস পেত না। ক্রমশ পাড়াগাঁয়ে লোকের মুখে মুখে কদমতলীকে নিয়ে নানারকম অতিলৌকিক ঘটনা চালু হল। কেউ এসে বলত কদমতলী ওকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে পূজা চেয়েছে; কেউ আবার বলত পূজা না-পেয়ে কদমতলী স্থানীয়দের অতিষ্ট করে মারছে। এভাবেই জনশ্রুতি ছড়াতে থাকে। পাড়াগাঁয়ে জনশ্রুতি ছড়াতে সময় লাগে না বেশি। ওই গ্রামের আশেপাশের লোকেদের অসুখবিসুখ কিংবা কোনোরকম ঝামেলা হলেই, ওরা সেটার দায় চাপিয়ে দিত মৃত কদমতলীর ওপর। এসবের মূলে একটাই সুপ্ত বিশ্বাস কাজ করছিল, সেটা হল, কদমতলী বুড়ির সৎকার শ্রাদ্ধ কিছুই করা হয়নি... তাই হয়তো তার অতৃপ্ত আত্মা এভাবে অতিষ্ট করছে। শেষে এই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই কদমতলীর পূজা চালু হল। জীবিত অবস্থায় যে-মানুষটার নাম পর্যন্ত জানত না স্থানীয় লোকজন... মৃত্যুর পর ভয়ভীতির কারণে তাকেই দেবায়িত করা হল।

এবার আসি আমছারউদ্দিনের কথায়। বহু বছর পর আমছারউদ্দিন কদমতলী বুড়ির ওই পড়ে থাকা জমিটা তো কিনে নিল। কিন্তু ততদিনে ওখানে কদমতলীর পূজা চালু হয়ে গেছে। বুড়ির ঘর লাগোয়া কদম গাছটার নীচেই বুড়িকে কল্পনা করে পূজা হতো। দেখতে গেলে সেটা ছিল আদতে বৃক্ষপূজার নামান্তর। এবার সেই আমছারউদ্দিন নিজের জমির কদমগাছ কাটতে চায়। কিন্তু ততদিনে স্থানীয়দের মধ্যে ততদিনে কদমতলীকে নিয়ে বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। ওরা মনে করে, কদমগাছটা কেটে ফেললে, পূজা বন্ধ হয়ে যাবে। পূজা বন্ধ হলে, কদমতলী বুড়ি তখন আবার ক্ষেপে গিয়ে গ্রামবাসীদের ওপর নানান অত্যাচার করা শুরু করবে। এই ভয়ে স্থানীয়রা এসে আমছারউদ্দিন আর ওর মিস্ত্রিদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। আমছারউদ্দিন কথা শোনে না। গাছটা কেটে ফেলা হয়। কাকতালীয়ভাবে সেই রাতেই তিনজনের মধ্যে দু-জন মিস্ত্রি ঘুমের মধ্যেই মারা যায়।

স্থানীয়দের মধ্যে রটে যায়, কদমতলী বুড়ির থান নষ্ট করায়, কদমতলী ক্ষেপে গিয়ে ওই দু-জন মিস্ত্রিকে মেরেছে...”

নীলের মা এটুকু শুনে, হঠাৎ করে কিগানের কথার মাঝখানেই বলেন, “হ্যাঁ, এটা তো আমরা সবাই জানি। কদমতলী বুড়িই তো গভীর রাতে এসে ওই মিস্ত্রি দু-জনকে মেরে রেখে গেছিল...”

“তাহলে আপনার মনে, এই প্রশ্নটা কেন জাগল না যে, জমিটা তো আমছারউদ্দিনের। ওই মিস্ত্রি তিনজনকে আমছারউদ্দিন ভাড়া করে নিয়ে এসেছিল বাইরে থেকে। তাহলে তো ক্ষতি হলে সেটা আমছারউদ্দিনের হওয়া উচিত। অথচ আমছারউদ্দিন এখনও দিব্যি বেঁচে আছে। আর মারতে হলে দু-জন মিস্ত্রিকে কেন মারবে কদমতলী? ওরা তিনজন মিস্ত্রি মিলেই ওই গাছটা কেটেছিল। সেক্ষেত্রে কদমতলী বুড়ির থান নষ্ট করার অপরাধে কদমতলী তিনজন মিস্ত্রিকেই মারল না কেন? তিনজন তো পাশাপাশি ঘুমাচ্ছিল। কদমতলী চাইলেই একসঙ্গে তিনজনকে মারতে পারত। অথচ কদমতলী দু-জনকে ঘুমের মধ্যে মেরে, একজন মিস্ত্রিকে রেহাই দিল। আপনি কী আমার খটকাটা বুঝতে পারছেন?”

কিগানের দিকে কেমন একটা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানান ভদ্রমহিলা!

কিগান আবার বলতে শুরু করে, “ঠিক এখান থেকেই আমার খটকাটা শুরু হয়। সবীল বর্মণের সঙ্গে কথা বলার পর, আমি আমছারউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করি। তার কাছ থেকে ফরিদপুরের সেই তৃতীয় মিস্ত্রিটার ঠিকানা নেই, যে সেদিন ভাগ্যক্রমে কদমতলীর হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল।”

“আপনি ফরিদপুর গেছিলেন?”

“হ্যাঁ”

“তারপর?”

“বলছি...”

নিজেকে কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে কিগান আবার বলা শুরু করে, “যে-মিস্ত্রিটা সেদিন কদমতলীর হাত থেকে বেঁচে ফিরেছিল, ওর নাম ফারুক। ফারুক আর আমছারউদ্দিন দু-জনেই কাছেই জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে দু-জন মিস্ত্রি মারা গেছিল, ওদের না-কি কাজ থেকে ফেরার পর খুব পা

ব্যথা করছিল। এবার আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে, এটা ভাবা স্বাভাবিক, সারাদিন খাটনির পর পা ব্যথা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ওরাও সেটাই ভেবেছিল। আমি তখন ফারুককে জিজ্ঞেস করি— ওরও সেদিন পা ব্যথা করছিল কি-না... ও জানায় ওর পায়ে কোনোরকম ব্যথা ছিল না। ওই দুইজন আমছারউদ্দিনের দেওয়া মালিশের তেল পায়ে মালিশ করে ঘুমিয়ে পড়ে। আর ঘুমের মধ্যেই শেষ। আমার খটকাটা এখানে লাগে... সারাদিন ওরা হাত দিয়ে গাছটা কাটার পর, হাতের বদলে শুধু পায়ে ব্যথা করল কেন? আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, হাতে বা শরীরের অন্যকোথাও ওদের সেদিন ব্যথা ছিল না। শুধু পায়ে ব্যথা করছিল। এখানেই আমার দ্বিতীয়বার খটকাটা লাগে।"

ভদ্রমহিলা কেমন জানি থম মেরে বসে কিগানের কথাগুলো শুনছিলেন। আমতা আমতা স্বরে বলেন, "তাহলে ওদের কদমতলী মারেনি? কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল ওই দু-জন মিস্ত্রির?"

"খুব সম্ভবত ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস... একটু সহজ করে বলছি আপনাকে। অনেকসময় মানুষের পায়ের পেশিতে গোল গোল রক্তপিণ্ড মতো জমা হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে সেভাবে কোনও ফারাক চোখে পড়ে না। অনেকক্ষেত্রেই ঠিকভাবে শনাক্তও করা যায় না ওই রক্তপিণ্ডগুলোকে। তবে এর ফলে অনেকক্ষেত্রেই পায়ে খুব ব্যথা হয়। ওই দু-জন মিস্ত্রিরও পায়ে ওইদিন রাতে খুব ব্যথা হচ্ছিল কাজ থেকে ফেরার পরই। অনেকক্ষেত্রেই এক্ষেত্রে পায়ে মালিশ করে। রক্তপিণ্ডগুলো অনেকসময় পায়ের পেশির ভেতর ওদের মূল অবস্থান থেকে সরে এসে রক্তের সঙ্গে আমাদের হৃদপিণ্ডের ডান প্রকোষ্ঠের পথে এগিয়ে গিয়ে, পৌঁছায় ফুসফুসে। ফুসফুসে পৌঁছে এই রক্তপিণ্ডগুলো ফুসফুসের ধমনি-শিরা— এসবের সঙ্গে আটকে যায়। ফলে অনেকক্ষেত্রেই ঘুমের মধ্যে এমনটা ঘটলে ফুসফুস সঙ্গে সঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দেয়; আর ফুসফুস কাজ না-করায় ঘুমের মধ্যেই সেই ব্যক্তি মারা যায়। এটাকেই ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস বলে। আমার মতে, ওই দু-জন মিস্ত্রিও এই ডিপভেইন থ্রম্বোসিস হয়ে মারা গেছিল। স্থানীয় লোকেরা আগের দিনের ওই কদমগাছ কাটা আর পরদিন সকালেই আমছারউদ্দিনের বাড়ি থেকে ওই দু-জনের লাশ উদ্ধার— এই দুটো ঘটনা দুইয়ে-দুইয়ে চার করে রটিয়ে দেয়— কদমতলীর প্রকোপে ওদের মৃত্যু হয়েছে। এরপর

কদমতলীর থান পরিবর্তন করে অন্য আরেক জায়গায় তৈরি করা হয়। একে কদমতলীর সৎকার হয়নি, স্থানীয়দের মধ্যে আগে থেকেই কদমতলীকে নিয়ে নানারকম জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল, তার ওপর এই ঘটনা... কদমতলীকে নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ভয়ভীতি আরো বাড়তে থাকে। এবার আসব আপনার বড়োমামির ঘটনায়।

আমি জানতে পেরেছি খুব কম বয়সে ইন্দুবালা চক্রবর্তী বিধবা হন। স্বামী মারা যাওয়ার বছর খানেক পর থেকেই সমস্যাটা শুরু হয়। ইন্দুবালা চক্রবর্তী একদিন কদমতলীর থানের ওদিকের এক পুকুর থেকে জল তুলতে গেছিল। তারপর থেকেই না-কি এরকম অতিলৌকিক ঘটনা ওনার সঙ্গে ঘটতে থাকে। গভীর রাতে ইন্দুবালার ঘর থেকে পুরুষ কণ্ঠস্বর পাওয়া যেত। অথচ দরজা খুললে দেখা যেত, ঘরে ইন্দুবালা ছাড়া আর কেউ নেই। ভরসন্ধেবেলা উনি একা একা বিড়বিড় করতেন; দেখে মনে হতো কারও সঙ্গে বুঝি উনি কথা বলছেন, অথচ ওনার আশেপাশে তখন কেউ ছিল না। তারপর একবার স্নান করতে করতে উলঙ্গ অবস্থায় ভেজা শরীরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় ছোটোছুটি করতে শুরু করেন। তখন ওনার বয়স কম। ওখানে শুনে যেটুকু জেনেছি, ইন্দুবালার সেদিন না-কি মনে হয়েছিল বাথরুমের ভেতর থেকে কেউ ওনার পিছু নিচ্ছে। তাই ওরকম অবস্থায় উনি বাথরুম খুলে বাইরে বেরিয়ে ছোটাছুটি করছিলেন। লোকজন রটিয়ে দেয় ওনার ওপর কদমতলী ভর করেছে। কেন? কারণ ক-দিন আগেই ইন্দুবালা কদমতলীর থানের ওদিকে পুকুরে জল ভরতে গেছিল— এই ঘটনাটাকেই ওরা দুইয়ে-দুইয়ে চার করে। তারপর ওনার বিকারগুলো আরো বাড়তে থাকে। ইন্দুবালার সমস্ত মুখে লাল লাল ছোপ ছোপ দেখা দেয়... টকটকে লাল চোখ। একা একাই বিড়বিড় করে। নিজে নিজেই হাসে... আবার পরক্ষণেই কাঁদতে শুরু করে। স্থানীয়দের থেকে শুনলাম— ওনাকে না-কি ঘরেই রাখাই যাচ্ছিল না। যতই টেনেটুনে ঘরে নিয়ে আসা হতো, ততই না-কি উনি চলে যেতে চাইতেন কদমতলীর থানের ওখানে। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, এই কদমতলীর থানের ওখানে যেতে চাইত— এটার প্রবণতাটাও ওনার মধ্যে তৈরি হয়েছিল স্থানীয়দের কথা শুনেই। কারণ প্রথম দিন থেকেই স্থানীয়রা রটিয়ে দিয়েছিল ইন্দুবালা চক্রবর্তীর ওপর কদমতলী ভর করেছে। এই একই কথা বার বার শুনতে

শুনতে, একটা সময় অসুস্থ ইন্দুবালা চক্রবর্তী সেটাই বিশ্বাস করতে শুরু করেন। ফলে ক্রমশ ওনার বিকারগুলোও বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে। আর কদমতলীর থানে যেতে চাওয়ার ব্যাপারটাও সেখান থেকেই শুরু হয় বলে আমার বিশ্বাস। তারপর হঠাৎ করে একদিন সকালে ইন্দুবালার বন্ধ ঘরের দরজা ভেঙে সবাই দেখল উনি গলায় দড়ি দিয়েছেন। গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তাররা জানাল সুইসাইড। কিন্তু বডির কোনও পোস্টমর্টেম হল না। কেন?”

কিগানের চোয়ালটা কথা বলতে বলতে শক্ত হয়ে গেছে। ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নীলের মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। কিগান দেখতে চাইছিল ওর মুখে কথাগুলো শোনার পর নীলের মায়ের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিছু পরিবর্তন হয় কি না?

নীলের মা কেমন একটা আড়ষ্ট হয়ে চেয়ারে বসে আছেন! ওনার চোখ দুটো চকচক করছে। সেই চাহনিতে কী যেন এক অপার বিস্ময় মাখা আছে! কিগানের হঠাৎ করে এমন একটা প্রশ্ন... এটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না নীলের মা। কেমন একটা থতমত হয়ে গেছেন ভদ্রমহিলা। তারপর নিজেকে সামলে নীচু স্বরে বললেন, “না আসলে... আমি ঠিক... মানে, ব্যাপারটা এতটা আগের... তাই...”

“তাই আপনি ভুলে গেছেন যে, এলাকার লোকজন ডেডবডিটাকে হাত দিতেই দেয়নি। কারণ, স্থানীয়রা আবার রটিয়ে দিয়েছিল— কদমতলীর প্রকোপে ইন্দুবালা মারা গেছেন। আর সেই ডেডবডি কেউ ছুঁলে তার ওপরেও কদমতলী ভর করতে পারে। তাই আর ওসব ঝামেলা না-করে, আপনারা বাইরের থেকে লোক ভাড়া করে এনে ডেডবডিটা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পুঁতে দিয়েছিলেন। এমনকি সৎকার বা দাহ কিছুই করেননি।”

কিগানের শেষ কথাগুলো শুনে চমকে উঠল নীলের মা। তারপর ভদ্রমহিলা পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণ সমস্ত ঘর জুড়ে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। কেউ কোনও কথা বলছে না। অবশেষে কিগানই আবার বলা শুরু করল, “আচ্ছা, এবার আমি মূল ঘটনায় আস্তে আস্তে ঢুকছি। কোথাও ভুল হলে শুধরে দেবেন। সেদিন যদি ইন্দুবালার ওপর কদমতলী ভর করেছে এই ধারণাটা ওনার এবং নিজেদের মাথায় না-ঢুকিয়ে আপনারা একজন ভালো সাইক্রিয়াইটিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ

করতেন, আমার মনে হয় আজকে নীলের মধ্যেও এই সমস্যাটা তৈরি হতো না!”

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে কিগানের কথাগুলো শুনছিলেন। ওর শেষ কথাটায় নিজের বিস্ময় চেপে রাখতে না-পেরে কিগানকে জিজ্ঞেস করলেন, “নীলের প্রবলেম আমার বড়ো মামির সঙ্গে রিলেটেড!!”

“হ্যাঁ...”

“আমাকে প্লিজ় পুরোটা খুলে বলুন। আমি শুনতে চাই। প্লিজ়...” কিগানের সামনে মুহূর্তে ভেঙে পড়লেন ভদ্রমহিলা।

কিগান বলা শুরু করল, “দেখুন, ইন্দুবালা অত্যন্ত অল্প বয়সে বিধবা হন। ওই সময়ে বিধবা হওয়া মানে অনেক অপমান শুনতে হতো লোকজনের মুখে। অপয়া, ডাইনি... কতো কিছুই হয়তো লোকজন ওনার আড়ালে বলাবলি করত... কিছু কথা নিশ্চয়ই ওনার কানেও আসত। এছাড়া দেখুন ওনার সন্তান ছিল না। অতএব একটা সময় ওনার মধ্যে একটা একাকীত্ব তৈরি হয়; আর সেই একাকীত্ব উনি খোলসা করে বাইরের কাউকে বলতে পারতেন না। কারণ সেই সময়টাই এরকম ছিল। একজন অল্পবয়সি বিধবা মহিলা বাইরের লোকজনের কাছে নিজের একাকীত্বের ব্যাপারে বলতে গেলে, বাইরের লোকগুলো, এমনকি ঘরের লোকজনও ওনাকে চরিত্রহীনা ভাববে। সেই তকমাটা স্বাভাবিকভাবেই ওনার কাছে খুব একটা সুখকর না। দীর্ঘদিন মনের মধ্যে সেই একাকীত্বটা চেপে রাখার ফলে ওনার ভেতর একটা মেন্টাল ডিসঅর্ডার দেখা দেয়। ওই যে রাত হলেই ওনার ঘরের ভেতর থেকে পুরুষ আর মহিলা দু'রকম গলায় আওয়াজ আসত, দুটোই ওনার নিজের গলা। গলা ভারী করে পুরুষের কণ্ঠস্বর বের করতেন... আর নারীর কণ্ঠস্বরটা ও ওনার নিজের সহজাত গলার আওয়াজ। উনি নিজের মনের মধ্যেই দুটো আলাদা মানুষ কল্পনা করে নিয়েছিলেন। ফলে ওনার মধ্যে একরকম স্প্লিট পারসোনালিটি ডিসঅর্ডার দেখা দেওয়া শুরু করল। সেই দু'রকম পারসোনালিটির মধ্যে একজন পুরুষ আর আরেকজন মহিলা। পুরুষ সত্তাটাকে সম্ভবত উনি কল্পনা করতেন নিজের স্বামী হিসেবে। আর মহিলা সত্তাটা উনি নিজে। আর পুরোটাই উনি করতেন অবচেতন মনে... সাবকনসাস মাইন্ডে। সচেতনভাবে জেনে-বুঝে ইচ্ছাকৃত কিছু করতেন না। রাতে যখন বাড়ির সবাই শুয়ে পড়ত, ওনার সাবকনসাস মাইন্ড দুটো

আলাদা সত্তা ওনার মনের মধ্যে তৈরি করত। ইন্দুবালার পুরুষ সত্তা, ওনার মহিলা সত্তার সঙ্গে সারারাত কথা বলত, গল্প করত। আর এই যে পাড়ার লোকজন বলত, উনি না-কি ভরসন্ধেবেলা একা একা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করতেন, অথচ আশেপাশে কেউ নেই, এটা আসলে একরকম অডিটরি হ্যালুসিনেশন। খুব সম্ভব ওনার মনে হতো, বা আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে উনি হ্যালুসিনেট করতেন, কেউ ওনার সঙ্গে কথা বলছে। ওই হ্যালুসিনেট করা অদৃশ্য ব্যক্তির গলার আওয়াজ সম্ভবত উনি শুনতে পেতেন। উনি হ্যালুসিনেট করা সেই গলার আওয়াজগুলোকেই উত্তর দিতেন বিড়বিড় করে। সেটা দেখে লোকজনের মনে হতো ওনার ওপর কদমতলী ভর করেছে। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, বাথরুমে স্নান করতে করতে বাইরে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসার ব্যাপারটা... উনি বলেছিলেন কেউ ওনার পিছু নিচ্ছে। তাই উনি পালিয়ে এসেছেন। এটা ওনার ডিলিউসন। আবার দেখুন, প্রথমেই বলেছি ওনার কোনও সন্তান ছিল না। এদিকে আপনার বিয়ের পর নীলের জন্ম হয়। আপনার শ্বশুড়বাড়ি আর বাপের বাড়ি পাশাপাশি। নীল ইন্দুবালার সঙ্গে ভীষণ অ্যাটাচড ছিল। নিজের ছেলের মতোই নীলকে উনি ভালোবাসতেন। কারণ নীলের মধ্যে সম্ভবত উনি নিজের না-হওয়া সন্তানকে খুঁজে পেতেন, বা খুঁজতেন। কিন্তু একটা সময় আপনারাও সপরিবারে সবারবাড়ি ছেড়ে শিলিগুড়ি শিফট করে যান। নীল কাছছাড়া হতেই সন্তানহীনা, কম বয়সে বিধবা ইন্দুবালা ভেতর ভেতর প্রচণ্ড একাকীত্বে ভুগতে থাকেন। ওনার মধ্যে ডিপ্রেশন তৈরি হয়। সেটাও একটা কারণ ওনার বিকারগুলোর। আর শেষে উনি গলায় ফাঁস দিয়ে সুইসাইড করেন। আমি নীলের সমস্যাটা আগেই সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাকে সবারবাড়ি গ্রামে যেতে হতো খোঁজখবর নেওয়ার জন্য। নীলের এই প্রবলেমের উৎসটা ইন্দুবালা দেবী।"

"মানে! কী বলতে চাইছেন আপনি?"

"মেডিক্যাল সায়েন্সের ভাষায় এই রোগটার নাম স্কিজোফ্রেনিয়া। অনেক সময় পরিবারের কারও স্কিজোফ্রেনিয়া থাকলে, পরবর্তী জেনারেশনের কারও আবার সেই রোগটা হতে পারে। সেই রুটটা জানার জন্যই ইন্দুবালার ব্যাপারে ইনফোগুলো দরকার ছিল আমার। এবার আপনি যদি জিজ্ঞেস

করেন, হঠাৎ ইন্দুবালা কেন? কারণ একমাত্র ইন্দুবালাকেই নীল স্বপ্নে দেখে। ইন্দুবালা যখন মারা যায় তখন নীলের ১৫ বছর বয়স। নীল দেখেছে ইন্দুবালার ডেডবডিটা কীভাবে সবাই এড়িয়ে যাচ্ছিল কদমতলী ভর করার যুক্তি দেখিয়ে। সেটাই ওর মনে কোথাও একটা গেঁথে ছিল। তাই ও যখনই স্বপ্নে ইন্দুবালাকে দেখে, প্রত্যেকবারই দেখেছে ইন্দুবালা অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছেন; কিন্তু নীল ওনার কাছে যেতে পারছে না। বাস্তব জীবনে তৈরি হওয়া সেই দূরত্বটাই ও স্বপ্নে দেখেছে। এমনকি আপনি বলেছিলেন আমাকে, ইন্দুবালার মারা যাওয়ার খবরটা পেয়ে নীল অজ্ঞান হয়ে গেছিল; এর থেকেই বোঝা যায় নীলের জীবনে ওনার প্রভাব কতটা বেশি ছিল।"

"আপনি কী বলতে চাইছেন নীলেরও ওই কী একটা নাম বললেন, ওই রোগটা হয়েছে?"

"স্কিজোফ্রেনিয়া... আই থিংক সো... আর সেটা এসেছে ইন্দুবালার কাছ থেকে। এই স্কিজোফ্রেনিয়ায় কমন সিম্পটম মেইনলি অডিটরি হ্যালুসিনেশন আর ডিলিউসন। আমি আপনাকে সহজভাবে বোঝাচ্ছি যতটা সম্ভব। অডিটরি হ্যালুসিনেশন হল, ধরুন, আপনার কানের কাছে আপনি কিছু শব্দ শুনছেন; যেমন হয়তো আপনার মনে হচ্ছে কেউ আপনার সঙ্গে কথা বলছে; কেউ আপনাকে কিছু করতে আদেশ করছে; আপনার চলাফেরা কেউ কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে; অথচ সেই মানুষটার কথা আপনি ছাড়া আর বাদবাকি কেউ-ই শুনতে পাচ্ছে না। এই অডিটরি হ্যালুসিনেশন তিনরকম। ফার্স্ট পার্সন অডিটরি হ্যালুসিনেশনের ক্ষেত্রে আপনার মনে হবে— আপনার কানের সামনে আপনারই আরেকটা সত্তা আপনাকে আদেশ দিচ্ছে কিছু করার জন্য... হয়তো বলছে "অমুকটা করো, তমুকটা করবে না..." আর আপনি সেটাই করছেন। থার্ড পার্সন অডিটরি হ্যালুসিনেশনের ক্ষেত্রে আপনার মনে হবে আপনাকে নিয়ে কেউ হয়তো আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে। অথচ আপনার সামনে কেউ নেই। আপনি জাস্ট ওদের কথাটা শুনতে পারছেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পারছেন না; আর আপনি বাদে ওই লোকগুলোর আলোচনা আর কেউ শুনতেও পারছে না। এবার আসি সেকেন্ড পার্সন অডিটরি হ্যালুসিনেশন, যেটা নীলের ক্ষেত্রে হয় কিংবা ইন্দুবালার হতো বলে আমার বিশ্বাস। এই ক্ষেত্রে পেসেন্টের মনে হয় কেউ একজন পেসেন্টের কানের কাছে কথা বলে পেসেন্টকে আদেশ করছে, পেসেন্টের

চলাফেরা কন্ট্রোল করছে— পেসেন্ট কী করবে, কী করবে না সেসব পেসেন্টকে বাতলে দিয়ে। এই ক্ষেত্রেও অন্য কেউ, মানে আপনি বা আমি কেউ সেই মানুষটাকে দেখতে বা শুনতে পাব না। শুধু সেই রোগীই ওই মানুষটার কথা শুনতে পারবে। যদিও সেটা পুরোটাই রোগীর মনগড়া। নীল বলে ওর স্বপ্নে কেউ ওর কানের কাছে অজানা ভাষায় কীসব বিড়বিড় করে বলে। এটা আসলে সেকেন্ড পার্সন অডিটরি হ্যালুসিনেশনের কারণে হয়। এটাকে আমরা মেডিক্যাল ভাষায় বলি "থট ইকো"। কারণ এক্ষেত্রে পেসেন্টের নিজের মনই সেই সাউন্ডগুলো তৈরি করছে। এবার আসি স্কিজোফ্রেনিয়ার আরেকটা সিম্পটমের ব্যাপারে। সেটা হল ডিলিউসন; মানে এমন কিছু যা আসলে সত্যি না; কিন্তু আপনি মনে-প্রাণে সেটাকে সত্যি ভাবছেন। ধরুন, একজন হাজবেন্ড ভাবছেন তার স্ত্রী তাকে ঠকাচ্ছে, বা তার স্ত্রীর আরেকটা সম্পর্ক আছে। সেটা হয়তো আসলে একেবারেই সত্যি না। কিন্তু ওই ভদ্রলোক সেটা শুধু ভাবছেনই না, নিজের মনের মধ্যে গেঁথে বসিয়ে রেখেছেন; আর সেটাই উনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করছেন। অনেকে দেখবেন বলে— ওনার আয়ু বেশি নেই, উনি না-কি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। অথচ টেস্ট করে দেখা যায় ওনার সবকিছু নরমাল। কিন্তু আপনি সেটা ওনাকে বোঝাতে পারবেন না। কারণ ওনার ডিলিউসন ওনাকে বুঝিয়েছে যে উনি সুস্থ নেই। আর সেই মিথ্যাটাকেই উনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে চলেছেন। নীলের ক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে কোর্ট মোড়ে। ওর মনে হয়েছিল কয়েকটা বীভৎস দেখতে প্রাণী নীলকে ঘিরে ধরেছে চারপাশ থেকে। অথচ সেটা সত্যি না। কিন্তু নীল সেটাকেই সত্যি ভেবে মনে-প্রাণে সেটাই বিশ্বাস করছে। ইন্দুবালার ক্ষেত্রেও বাথরুম থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে এসে ছোটাছুটি করার ব্যাপারটা ডিলিউসন ছাড়া আর কিছুই না। আরেকরকম ডিলিউসন হয়, যেখানে পেসেন্ট নিজেকে ভগবান বা ঐশ্বরীক ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। ওরা বিশ্বাস করে ওদের মধ্যে সুপার পাওয়ার আছে।"

কিগান ওর কথা শেষ করে একটু থামল। নীলের মায়ের চোখ ছলছল করছে। তবু নিজেকে উনি শক্ত রেখেছেন। কাঁপা গলায় উনি জিজ্ঞেস করলেন কিগানকে, "আর নীলের ঘরের দেওয়ালে, মেঝেতে লেড পেন্সিলে আঁকাগুলো?"

"একটা ঘটনা বলি আপনাকে। ১৯৭১ সালের ঘটনা। স্পেইনের

বেলমেজ় শহরের মারিয়া গোমেজ়ের বাসায়, মেঝেতে মাঝেমধ্যেই নানারকম মানুষ মুখ ফুটে উঠত আপনাআপনি। আবার সেগুলো আপনাআপনিই উধাও হয়ে যেত। এটা নিয়ে বেশ কয়েক বছর বেশ শোরগোল হল। প্যারানরমাল রিসার্চ যারা করেন তাদের দাবি জিনিসটা ভৌতিক। কিন্তু শেষে দেখা গেল বাড়ির মালকিন মারিয়া গোমেজ়ই ওই মানুষের মুখগুলো নিজের সাবকনসাস মাইন্ডে মেঝের ওপর আঁকতেন। আর কনসাস মাইন্ডে সেই আঁকাগুলোকেই উনি অতিলৌকিক কিছু মনে করতেন। আমার বিশ্বাস নীলের ব্যাপারটাও সেরকম। মেঝে বা দেওয়ালে ওই আঁকা বা লেখাগুলো, স্বপ্ন দেখার পর, নিজের সাবকনসাস মাইন্ডে নীল নিজেই আঁকে। আর কনসাস মাইন্ডে ও যখন সবটা ভুলে যায়, তখন সেটাকেই ভুতুড়ে ভেবে প্যানিক করে।"

"এটার কোনও ট্রিটমেন্ট?"

কিগান আশ্বস্ত করে ভদ্রমহিলাকে, "হ্যাঁ, অবশ্যই ট্রিটমেন্ট আছে। আপনি সেদিন বললেন নীলের জন্ম মাঘের শেষে। কারও জন্ম আর্লি স্প্রিং আর লেট উইন্টারের দিকে হলে, অনেক ক্ষেত্রে তার স্কিজ়োফ্রেনিয়া হওয়ার চান্স থাকে। তাই সেদিন আপনাকে আমি ওই নীলের জন্মের সময়টা জিজ্ঞেস করছিলাম। আর অনেকক্ষেত্রে স্কিজ়োফ্রেনিয়া অনেকদিন অবধি ট্রিটমেন্ট না-করিয়ে ফেলে রেখে দিলে, সেটা ক্যাটাটনিক স্কিজ়োফ্রেনিয়ায় টার্ন নেয়। এক্ষেত্রে রোগীর মধ্যে একটা জড়তা দেখা যায়। আমি ধরুন, ওকে ওর নাম জিজ্ঞেস করছি। ও হয়তো সেই নামটাই বার বার রিপিট করে যাচ্ছে। হয়তো পেসেন্টকে আমি একজায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে গেলাম; ও ঠায় একানাগারে ওই পশ্চারেই দাঁড়িয়ে থাকবে। কিংবা কোনও কথা বলার সময় গুছিয়ে কথা বলতে পারবে না। অসংলগ্ন একটা ব্যাপার দেখা যাবে কথার বাক্য গঠনে। ক্যাটাটনিক স্কিজ়োফ্রেনিয়া একটা ফ্যাটাল স্টেজ়। তবে এখন এত যোগব্যায়াম, মাইন্ড রিলাক্সিং ভিডিও বের হয়েছে যে ক্যাটাটনিক স্কিজ়োফ্রেনিয়াও কিউরেবল।"

"স্যার, নীলের কেসটাও কি ওই ক্যাটাটনিক স্কিজ়োফ্রেনিয়া?"

"আরে না না। নীলের প্রবলেমটা খুবই সামান্য। আপাতত আমি দুটো ওষুধ লিখে দিচ্ছি। ক্লোজ়াপিন আর বেক্সল। আশা করছি এতেই কাজ দেবে। আমি এক মাস পর আবার নীলকে দেখব। আর কোনও প্রবলেম হলে আমাকে জানাবেন।"

"আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"সিওর... করুন..."

"নীল কেন তাহলে স্বপ্নে দেখত, ওকে নরবলি দেওয়া হচ্ছে? এটাও কি ওই রোগটার কোনও কোনও সিম্পটম?"

"দেখুন, এরকম একজন পেসেন্ট ঠিক কী হ্যালুসিনেট করবে... বা ডিলিউশন তৈরি করবে নিজের মনের মধ্যে, এটা আমরা বাইরে থেকে বুঝতে পারব না। আগে ওষুধগুলো চলুক... দেখি তো কতটা প্রোগ্রেস হয়।"

নীলের মা আর কোনও কথা বাড়ালেন না। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, কয়েক সেকেন্ড কী একটা চিন্তা করলেন।

কিগান জিজ্ঞেস করলো, "কিছু বলবেন?"

"না না, আজ আসি..." কথা শেষ করে প্রেসস্ক্রিপশনটা হাতে করে নিয়ে ভদ্রমহিলা চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

১০

"তুই সিওর এটা স্কিজোফ্রেনিয়া?" ল্যাপটপে মনোযোগ দিয়ে কী একটা দেখতে দেখতে রিয়া কিগানকে প্রশ্নটা করল।

"তোর কোনও সন্দেহ আছে?"

"না সেটা না..." রিয়ার গলার স্বরে একটা চাপা সন্দেহ।

কিগান ব্যাপারটা ধরতে পারল। জিজ্ঞেস করল ও রিয়াকে, "কী হয়েছে বল তো। তুই তো এভাবে আমাকে কাউন্টার করিস না। খুলে বল একটু..."

"তোর মনে আছে নীল একটা স্বপ্ন দেখেছিল, যেখানে ওর গায়ে গাঢ় নীল রং মাখিয়ে কারা যেন ওকে একটা গভীর কুয়া মতো জায়গায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল; সামনে একটা হাতির মাথাওয়ালা দেবতার মূর্তি ছিল; আর সেই মূর্তিটা একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজেই নিজের মাথা কাটছিল। ওই মূর্তিটা হয়তো গণেশেরই কোনও একটা রূপ হবে বলে আমাদের ধারণা হয়েছিল। মনে আছে তোর?"

"হ্যাঁ, এটা তো কিছুদিন আগেরই কথা। মনে থাকবে না কেন? কেন বল তো? হঠাৎ করে এসব বলছিস?"

"হাতির মাথা... পারটিকুলার এই ব্যাপারটায় গণেশ বাদেও আরেকজন দেবতার কথা আমরা ওইদিন মিস করে গেছি।"

"গণেশ বাদে হাতির মাথাওয়ালা দেবতা? কে?" জিজ্ঞেস করে কিগান।

"চাক... আমি নেটে এতক্ষণ ধরে সেটাই দেখছিলাম। নীল স্বপ্নে ঠিক যা যা জিনিস দেখেছে, তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে এই চাক দেবতার আচার রীতি।"

"আচ্ছা? স্ট্রেঞ্জ! চাক কে? কোথাকার দেবতা?"

"মায়া সভ্যতার নাম শুনেছিস?"

"হ্যাঁ..."

"ওই মায়ানদের দেবতা ছিল চাক। মাথাটা হাতির। অনেকে মনে করে, এই চাক দেবতার হাতির মাথার গড়ন থেকেই পরবর্তীতে আমাদের দেশে গণেশের এই হাতির মাথার কনসেপ্টটা আসে। মায়া সভ্যতায় চাক ছিল বৃষ্টির দেবতা। গণেশের সঙ্গে চাকের আরো মিল দেখবি? দ্যাখ... মেক্সিকো চেম অঞ্চলে 'ওকান' নামের একটা উৎসব হতো। স্থানীয় ভাষায় 'ওকান' মানে 'গৃহপ্রবেশ'। এবার তুই নিশ্চয়ই জানিস আমাদের দেশেও গৃহপ্রবেশের সময় অনেকে গণেশের পূজা করে। মায়া, আজ়তেক বা ইনকা– এই সভ্যতাগুলোকে বলা হয় মেসোআমেরিকান সভ্যতা। এই সভ্যতায় নরবলি বা হিউম্যান স্যাক্রিফাইস ব্যাপারটার খুব রমরমা ছিল। ওরা মনে করত দেবতাকে রক্ত কিংবা নিজের দেহের অঙ্গ কেটে উৎসর্গ করলে দেবতা তুষ্ট হবেন আর আশীর্বাদ করবেন। এমনকি ওখানকার পূজারীরা পূজার সময় নিজের দেহ থেকে রক্ত বের করে বা জিভ কান এসব কেটে দেবতার সামনে উৎসর্গ করত। এমনকি যুদ্ধে বন্দিদের ধরে নিয়ে এসে দেবতার সামনে বলি দেওয়া হতো। অনেকক্ষেত্রে শিশুদেরও বলি দেওয়ার বা উৎসর্গ করার রীতি ছিল। নীল স্বপ্নে এক্স্যাক্টলি সেদিন কী কী দেখেছিল, তুই লিখে রেখেছিলি। আন একবার খাতাটা। আমি বলছি।"

কিগান রিয়াকে ওর নোট খাতাটা এনে দিল। রিয়া নেটে সার্চ করে করে খাতাটায় কিগানের লিখে রাখা পয়েন্ট আর ফুট নোটগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছে ইনফরমেশনগুলো। তারপর ল্যাপটপ থেকে চোখ সরিয়ে রিয়া কিগানকে বলল, "দ্যাখ, ওইদিনের স্বপ্নটায় নীল প্রথমে

দেখেছিল মানুষকে খুন করে ওর কলজে বের করে এনে, সেই কলজে আগুনে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। তাই তো? মায়ানদের মধ্যে এই রীতিটা ছিল। দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে এটা ওরা করত। দ্বিতীয় দ্যাখ, নীলের গায়ে গাঢ় নীল রং করে কারা নীলকে ধাক্কা মেরে একটা গভীর কুয়ায় ফেলে দিচ্ছে। সামনে হাতির মাথাওয়ালা দেবতা। মায়া সভ্যতায় বিশ্বাস করা হতো বৃষ্টির দেবতা চাককে সন্তুষ্ট করতে পারলে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হবে আর ওদের ক্ষেতিতে ভালো ফলন হবে। সেই সন্তুষ্ট করার রীতি হল এটা। এবার দেখ, হাতির মাথাওয়ালা দেবতাটা নিজেই নিজের গলা কাটছে। মায়ানদের লোকগাথায় এরকম একটা কাহিনি আছে। যেখানে দেখা যায়, মায়ানদের বায়ুর দেবতা কুকুলকানকে তুষ্ট করতে চাক নিজের মাথা কেটে সেই মাথাটা উৎসর্গ করছে। এমনকি শুনলে অবাক হবি, মায়া সভ্যতার আমলের একটা একটা স্থাপত্যে দেখা গেছে, মায়ানদের ছয়জন দেবতা তাদের নিজেদের মলের ওপর হাঁটতে হাঁটতে, নিজেদের যৌনাঙ্গ থেকে রক্ত ছিটাতে ছিটাতে এগিয়ে যাচ্ছে। মিল পাচ্ছিস এবার? নীলও কিন্তু স্বপ্নে এক্সাক্টলি এটাই দেখেছিল! মনে আছে তোর?"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ায় কিগান।

"আরেকটা মজার কথা শোন... ওইদিন স্বপ্নটা দেখার পর নীলের যখন ঘুম ভাঙে তখন ও দেখে সারা ঘরে লেড পেন্সিল দিয়ে POL লেখা আছে। শব্দটার মানে তুই জানতিস না। আমাদের কারোরই জানার কথা না। কারণ এটা আমাদের চেনা কোনও শব্দ না। এটা মায়ানদের শব্দ। মায়া সভ্যতায় POL কথার অর্থ মাথা। নীলের পারটিকুলার এই স্বপ্নটার সঙ্গে মায়া সভ্যতার মিল যে কতটা সেটা তুই বুঝতেই পারছিস।"

"হুম...পারছি।"

"এই জন্যই বলছিলাম আমি তোকে। নীলের রোগটা আমার ঠিক স্কিজোফ্রেনিয়া লাগছে না। কারণ..." কী একটা বলতে গিয়েও থেমে গিয়ে রিয়া কিগানকে হঠাৎ বলে, "দাঁড়া, এক কাজ করলে কেমন হয়? নীলের সব কয়টা স্বপ্ন তোর এই খাতায় নোট ডাউন করা আছে। এবার আমরা পর পর ওর স্বপ্নগুলোকে মিলিয়ে দেখি কী দাঁড়াচ্ছে? চল..."

কিগান এককথায় রাজি হয়ে যায়। আসলে রিয়ার এই পয়েন্টগুলো

কিগানকেও এখন ভাবাচ্ছে। ও ওর নোট খাতাটা খুলে বসে পড়ল। রিয়া ল্যাপটপটা খুলে বসল...

"এই দ্যাখ... নীলের প্রথম স্বপ্ন, যেখানে ওকে মাথায় বর্শা ঢুকিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। এরকম একটা চল মেসোপোটেমিয়া সভ্যতার যুগে ছিল। মেসোপোটেমিয়া সভ্যতা মানে ইরান-ইরাক সীমান্তবর্তী অঞ্চল, কুয়েত-সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলের কিছুটা, তুরস্কের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল।

কোনও মেসোপোটেমিয়ান রাজা মারা গেলে, পরকালে তাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তার কাছের কোনও যোদ্ধাকে মাথায় বর্শা ঢুকিয়ে খুন করা হতো। আর তারপর ওই যোদ্ধাদের লাশগুলো রাজার সঙ্গে একসঙ্গে কবর দেওয়া হতো।"

"স্ট্রেঞ্জ! ইন্টারেস্টিং!"

"এবার দ্বিতীয় স্বপ্নটা দেখ। নীলকে মুখে কাপড় পেঁচিয়ে দমবন্ধ করে খুন করা হচ্ছে। এই রীতিটার সঙ্গে প্রাচীনকালে ফিজির একটা রিচুয়ালের মিল পাওয়া যায়। প্রাচীন ফিজিতে কারও স্বামী মারা গেলে, ওর স্ত্রীকে, ওর নিজের ভাই দমবন্ধ করে খুন করত, পরকালে তার স্বামীর দেখভালের জন্য। মৃত স্বামীর স্ত্রীকে বলা হতো "থোথো" বা স্বামীর কবরের গালিচা। কী নৃশংস বাব্বাহ্!"

"আমি সত্যিই আগে এতটা ডিটেইলসে ভেবে দেখিনি। তারপর বল..."

"এবার দ্যাখ... নীল একটা স্বপ্নে দেখেছিল ওর বুক কেটে কলিজা বের করে, সেটা একজন চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। আর সেদিন কোর্ট মোড়ে যেদিন ও অজ্ঞান হয়ে গেছিল রাস্তার মধ্যে, সেদিনের ওর হ্যালুসিনেশনটা মনে আছে তোর? ও দেখেছিল কেউ একজন ওর গায়ের থেকে চামড়া ছিঁড়ে নিয়ে নিজের গায়ে পেঁচিয়ে নিয়েছে। আরে যেটার সঙ্গে ওই গজন্তক শিবের অনেকটা মিল আছে..."

"হ্যাঁ... ওটা শিবের গজাসুরের বধের ঘটনা না?"

"না... মায়া সভ্যতা ছাড়া আরেকটা মেসোআমেরিকান সভ্যতা হল আজ়তেক সভ্যতা। এই আজ়তেক সভ্যতার সময়ে এই দু'রকম হিউম্যান স্যাক্রিফাইসের চল ছিল। আজ়তেকদের একজন দেবতা ছিল ইপে তোতেক। বলা হতো উনি হলেন শস্যের দেবতা। ওনার আইকনোগ্রাফিটা

বললেই বুঝতে পারবি। ওনার হাতে একটা ধারালো অস্ত্র। ওই অস্ত্রটায় কাঁচা রক্ত লেগে থাকে। টকটকে লাল চামড়া। আর সেই লাল চামড়ার ওপর হলুদ রঙের একটা পোশাকমতো পরা। সেটা হল আসলে মানুষের দেহের চামড়া। আজ়তেকদের লোককথায় আছে যে, এই ইপে তোতেক সমগ্র বিশ্বের খাদ্য সংস্থানের উদ্দেশ্যে নিজের দেহের চামড়া কেটে ফেলেছিল। সেই থেকে আজ়তেকদের মধ্যে একটা অদ্ভুত রীতির চল হয় এই ইপে তোতেক-কে সন্তুষ্ট করতে। তখনকার দিনে যুদ্ধবন্দিদের ওরা ধরে ধরে এনে বলি দিত দেবতার সামনে। কীভাবে নরবলি দিত শুনলে অবাক হয়ে যাবি। বন্দিদের বুক চিরে কলজে বের করে এনে সেটা প্রধান পুরোহিত যে, সে চিবিয়ে চিবিয়ে খেত। আর একটা প্রথার চল ছিল, যেখানে বন্দিদের শরীরের চামড়া ছিঁড়েখুঁড়ে প্রধান পুরোহিত ইপে তোতেকের উদ্দেশ্যে সেটা নিজের গায়ে টানা কুড়িদিন জড়িয়ে রাখত। নীল এই দুটো জিনিসই হ্যালুসিনেট করেছিল। আর নীল স্বপ্নে যে বাঘের চামড়া গায়ে জড়ানো আর শিকারি পাখির মতো দেখতে মানুষগুলোর কথা বলেছে, ওরা আজ়তেকদের আমলের জাগুয়ার যোদ্ধা আর ঈগল যোদ্ধা। যে-ধারালো অস্ত্রটা নীল বার বার স্বপ্নে দেখে, সেটাও ওই মেসোআমেরিকান আমলের একটা অস্ত্র। নাম MACUAHUITL... কাঠের চ্যাপ্টা তলোয়ারের চারদিকে আগ্নেয় শিলা ওবসিডিয়ান দিয়ে ধারালো ব্লেডমতো বানানো। মনে করা হয়, এই যুদ্ধ বন্দিদের নরবলি দেওয়ার আগে ওদের নিয়ে একরকম রিচুয়াল পালন করা হতো। বন্দিদের কোমরে শেকল পরিয়ে, সেই শেকলটার আরেকটা প্রান্ত বাঁধা হতো বড়ো একটা পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে। যাতে সেই বন্দি বেশি নাড়াচাড়া করতে না-পারে। ওদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হতো MACUAHUITL অস্ত্রটা। কিন্তু পার্থক্য হল, বন্দিদের হাতের অস্ত্রটায় ওবসিডিয়ান পাথরের ব্লেডের জায়গায় বসানো থাকত পালক। আর বন্দিদের চারপাশ থেকে আক্রমণ করত জাগুয়ার আর ঈগল যোদ্ধারা। ওদের হাতে আসল MACUAHUITL অস্ত্র। সেটা দিয়ে ওরা বন্দির গায়ে ইচ্ছেমতো আঘাত করে ক্ষতবিক্ষত করে দিত। তারপর সবার শেষে হতো নরবলি ইপে তোতেকের উদ্দেশ্যে। নীলের স্বপ্নের ওই স্টেপ পিরামিডটা, যেটা ধাপে ধাপে উঠে গেছে, ওটা আসলে মিশরীয় পিরামিড না। ওটা আজ়তেকদের স্টেপ পিরামিড।"

"এরপরে, কোর্ট মোড়ে অজ্ঞান অবস্থায় নীল দেখে ওকে কারা যেন একটা নির্জন পাহাড়ে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে রেখে গেছে। সামনে অনেকগুলো শিশুর মমিফায়েড লাশ।"

"হ্যাঁ... এই রীতিটাও ওই মেসোআমেরিকান যুগের ইনকা সভ্যতায় চালু ছিল। এই রিচুয়ালটার নাম ছিল "কাপাকোচা"। ইনকা সভ্যতার আমলে কোনও দলপতি মারা গেলে বা ধর দেশে ভয়ংকর কোনও মহামারি হল— সেসব ক্ষেত্রে ওখানকার ৬ থেকে ১৫ বছর বয়সি শিশুদের বেছে বেছে নিয়ে, ওদের দেবতার সামনে উৎসর্গ করা হতো। আর সেই স্যাক্রিফাইসের আগে ওদের ভালো-মন্দ খাইয়ে, যত্ন-টত্ন করে রাখা হতো। যেমন ধর অ্যানিম্যাল প্রোটিন, মেইজ়— এসব ভালো ভালো খাবার খাওয়ানো হতো। অনেক দামি দামি গয়নাগাটি উপহার দেওয়া হতো। তারপর এসব মিটে গেলে, প্রধান পুরোহিত ওই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে যেত উঁচু কোনও পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে ওদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে রাখা হতো। আর ওই পাহাড়ি অঞ্চলে, প্রচণ্ড ঠান্ডায় দম বন্ধ হয়ে বাচ্চাগুলো মারা যেত। ১৯৯৫ সালে মাউন্ট আম্পাটোতে খননকাজ চালানোর সময়ে এরকম বেশকিছু বাচ্চার মমিফায়েড লাশ পাওয়া গেছিল। ওদের সবার হাত-পা আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। সাফোকেশন, অথবা, প্রচণ্ড ঠান্ডায় মারা গেছে বলে ধারণা করা হয়।"

"স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ..."

"এবার বল স্কিজ়োফ্রেনিয়া তো বুঝলাম; কিন্তু নীল ছেলেটা হঠাৎ করে এই ধরনের স্বপ্নই-বা দেখবে কেন? স্কিজ়োফ্রেনিয়া একরকম হ্যালুসিনেশন আর ডিলিউসন তৈরি করে। কিন্তু এখানে দ্যাখ, তুই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিস, নীলের প্রত্যেকটা স্বপ্নের সঙ্গে কোনো-না-কোনো সভ্যতার জনজাতির মধ্যে প্রচলিত কোনো-না-কোনো লোকাচার জড়িত আছে। সেটা কিন্তু কোনও ডিলিউসন বা হ্যালুসিনেশন হতে পারে না। তুই বলেছিলিস নীল আদৌ কোনোদিন এরকম লোকাচার নিয়ে কোথাও পড়েওনি আর কোথাও দেখেওনি। তাহলে ও প্রত্যেকটা স্বপ্নে, প্রত্যেকটা লোকাচার এতটা নিখুঁত নির্ভুল আর বিস্তারিতভাবে কীভাবে দেখছে কিগান?"

"তুই কী বলতে চাইছিস, ক্লিয়ারলি বল তো আমাকে... নীল জাতিস্মর?"

"ভেবে দেখ কিগান, একটা ছেলে বার বার স্বপ্নে দেখছে ওকে নরবলি

দেওয়া হচ্ছে। তুই এই কেসটাকে মনোবিজ্ঞানের বাইরে এসে দ্যাখ। একটা ছেলে, যে কি-না বিভিন্ন সভ্যতার বিভিন্ন সময়কালে বার বার জন্ম নিচ্ছে, আর বার বারই তাকে কোনো-না-কোনো দেবতার সামনে বলি দেওয়া হচ্ছে। আবার জন্ম নিচ্ছে সেই ছেলেটা, অন্য কোনও সভ্যতায়, অন্য কোনও যুগে, আবার ওকে ধরে নিয়ে এসে বলি দেওয়া হচ্ছে। আর সেই সমস্ত পূর্বজন্মের স্মৃতিগুলো নীল পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সে এসে হঠাৎ করে স্বপ্নের মধ্যে চোখের সামনে দেখছে। কেন? কিছু তো একটা কারণ থাকবে... তোর মনে হয় না কিগান, এই স্বপ্নগুলো মারফৎ ওর সাবকনসাস মাইন্ড আমাদের কিছু বলতে চায়? কিংবা কেউ ওর সাবকনসাস মাইন্ডে এসব ঘটনা স্বপ্নের মধ্যে তৈরি করে ওকে কিছু দেখাতে চাইছে?"

"কেউ মানে? কে?"

"আই ডোন্ট নো কিগান... আমি জানি না! আমি শুধু সম্ভাবনাগুলো তোর সামনে তুলে ধরছি, এইটুকুই..."

কেমন একটা মুষড়ে পড়ে কিগান, "আমি বুঝতে পারছি না রিয়া... আমার সত্যি সত্যি এখন কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না। আমি জানি না আমার কী বলা উচিত। দ্যাখ, তোর কথা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। তোর কথা বিশ্বাস করার পেছনে একটা শক্তপোক্ত ভিত্তিও আছে। তুই যে লজিক দেখাচ্ছিস সেটা ধরে এগোতে গেলে, নীলের এই রোগটা স্কিজোফ্রেনিয়া না। বরং অন্যকিছু। সেটা কী আমি জানি না! আগে কখনও এরকম কেস আমি হ্যান্ডেল করিনি। কিন্তু সেটা বিজ্ঞানসম্মত না। আর তোর কথা বিশ্বাস করলে, আমার যুক্তি বা লজিককে দমিয়ে রাখা হয়। ব্যাপারটা পরস্পরবিরোধী। আমি জানি না, আমার এক্ষেত্রে কী বলা উচিত, বা কী করা উচিত।"

১১

নীলের ঘরের দরজাটা আধা ভেজানো। ভেতরটা অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে। একটা হালকা লাল আলো সমস্ত ঘর জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ম্লান আলোয় ঘরটাকে দেখলে একটা অপার্থিব ভাব ফুটে ওঠে মনের ভেতর। রাতে হঠাৎ কেন জানি ঘুম ভেঙে গেছিল নীলের মায়ের। ওর বাবা

দিনকয়েকের জন্য শিলিগুড়ির বাইরে গেছেন। বালিশের পাশে মোবাইলটা ছিল। অন করে টাইম দেখেন। রাত আড়াইটা তখন। আবার ঘুমিয়েই পড়ছিলেন। হঠাৎ ভদ্রমহিলার কানে একটা অস্ফুট আওয়াজ আসতেই সজাগ হয়ে ওঠেন উনি। এত রাতে কীসের আওয়াজ? কেউ মনে হচ্ছে ফিসফিস করে একনাগাড়ে কিছু একটা কথা বলছে। কান খাড়া করেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু স্পষ্টভাবে কিছুই শুনতে পান না। মাথার ওপাশেই জানলা। রাস্তা থেকে আওয়াজ আসছে না কি? অনেক সময় মাতাল-টাতাল মাল খেয়ে হল্লা-চিল্লা করে। সেইসবই হবে কিছু একটা। হাত দিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরেটা একবার দেখে নেন উনি। কোথায় কেউ? কাউকেই দেখা যাচ্ছে না বাইরে। রাস্তাঘাট শুনশান। স্ট্রিট লাইটগুলো মিটিমিট করে জ্বলছে। ল্যাম্পপোস্টের গায়ে ঠেস দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে গোটা কয়েক কুকুর ঘুমিয়ে আছে। এই জানলা দিয়ে প্রায় সামনের মোড় অবধি দেখা যায়। পুরো রাস্তাটাই ফাঁকা... খাঁ খাঁ করছে।

আবার শুয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন ভদ্রমহিলা। আবার সেই ফিসফিসানি আওয়াজটা। নীলের ঘর থেকে আসছে না শব্দটা? কান খাড়া করলেন ভদ্রমহিলা। হ্যাঁ, নীলের ঘর থেকেই তো। কিগানের ওষুধগুলো খেয়ে তো ভালোই ছিল এতদিন নীল। ওসব স্বপ্ন-টপ্নও দেখেনি আর। তাহলে আজকে আওয়াজ কীসের? এতরাতে জেগে জেগে কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলছে না-কি নীল?

কিন্তু এতরাত জেগে তো ফোন-টোনের হ্যাবিট নেই ওর। আর তাছাড়া উনি শোয়ার আগে নিজের চোখেই দেখে এসেছেন নীল অঘোরে ঘুমাচ্ছে। নীল আগেই শুয়ে পড়ে বরাবর। তাহলে কি আবার কোনও প্রবলেম হল ওর, ঘুমের মধ্যে? নীলের মা বিছানা থেকে নেমে আসেন। দরজা ঠেলে ড্রয়িং রুমে আসতেই লক্ষ করেন ব্যাপারটা। নীলের ঘরের দরজাটা খোলা। আধা ভেজানো অবস্থায়। কিন্তু উনি স্পষ্ট দেখেছিলেন নীলের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। তাহলে? নীল কি মাঝে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়েছিল? ভদ্রমহিলা নীলের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। আর তখনই আরো একবার শুনলেন, নীলের ঘরের ভেতর থেকে সেই অস্পষ্ট গলার আওয়াজটা। কেউ মনে হচ্ছে ফিসফিস করে একনাগাড়ে কী একটা পাঠ করছে। ভদ্রমহিলা নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন ঘরটার কাছে। দরজা ঠেলে

উঁকি দিলেন ভেতরে। আর ঘরের ভেতর উঁকি দেওয়ামাত্রই শিউরে উঠলেন ভয়ে। মুহূর্তে যেন ওনার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা চোরা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল! যা দেখছেন, সেটা নিজের চোখে বিশ্বাস করা কঠিন। ভদ্রমহিলা দেখছেন, দরজার দিকে পিঠ করে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় নীল, অদ্ভুত সব ভঙ্গিমায় নাচ করছে। সমস্ত ঘরটা আলো-আঁধারি। ঘরের লাল আলোটা নীলের শরীরে এসে পড়েছে। ওকে সাক্ষাৎ অশরীরী লাগছে দেখতে। ভদ্রমহিলার ভেতরে যেন একটা ঝড় বয়ে চলেছে। তা-ও নিজের উত্তেজনা চেপে উনি সমস্তটা লক্ষ করছেন। ঘর জুড়ে কেমন একটা ধোঁয়া ধোঁয়া চারপাশে। এত ধোঁয়া কোথা থেকে এল? আর সেই ধোঁয়ার মধ্যে থেকে একটা সোঁদা মতো গন্ধ ভেসে আসছে। নীলের সামনে একটা লাল শালু কাপড়ের বেদি মতো করা। আর সেই বেদীর ওপর একটা মূর্তির আদলের মতোন কী একটা রাখা আছে। আর সেটার সামনেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে অদ্ভুত সমস্ত ভঙ্গিমায় অনবরত নেচে চলেছে নীল। আর মুখ দিয়ে মন্ত্রপাঠের মতো সুর করে করে উচ্চারণ করছে একটা স্তোত্রগান, "ওঁ ক্ষ্রেঞৗং ঘেঝাঁ জেদ্রাঁ সঃ।"। সেই মন্ত্রপাঠ সমস্ত ঘরের কোনায় কোনায় যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে আবার ফিরে ফিরে আসছে, "ওঁ ক্ষ্রেঞৗং ঘেঝাঁ জেদ্রাঁ সঃ... "ওঁ ক্ষ্রেঞৗং ঘেঝাঁ জেদ্রাঁ সঃ।"

কিন্তু সেই মন্ত্রপাঠের ভাষাটা ভদ্রমহিলা নিজেও বুঝতে পারলেন না। এই ভাষা নীলই-বা শিখল কী করে? আর নীলের সামনে ওটা কী রাখা বেদির ওপর? নীলের ঘরে আগে তো এসব কিছু দেখেননি উনি। নীলের কোনও দিকে হুশ নেই। ভদ্রমহিলার উপস্থিতিও ও টের পাচ্ছে না। একনাগাড়ে দরজার দিকে পিঠ করে, সম্মোহিতের মতো নেচে চলেছে নীল ওই বেদির ওপর রাখা জিনিসটার সামনে!

১২

পরের দিন চায়ের টেবিলে নীলের মা আগ বাড়িয়ে গতকাল রাতের ওই অশ্লীল ব্যাপারটার কথা কিছু জিজ্ঞেস করেননি নীলকে। মনে মনে ঠিক করেছেন এক-দু'দিনের মধ্যে কিগানের কাছে একটা অ্যাপোয়েন্টমেন্ট নিয়ে, ওকে সব বলবেন। কিন্তু তার আগে যেটা দরকার সেটা হল, ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখা। নীল বাসায় থাকলে সেটা সম্ভব না। নীল যখন বাইরে

বেরোবে তখনই কাজটা করতে হবে। সমস্ত তল্লাশিটা চালাতে হবে নীলের অজান্তেই। আবার নীলকে সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করাটাও ঠিক হবে না। এতে নীল সত্যি সত্যি কিছু লুকোলে, সেই ব্যাপারে ও এরপর থেকে আরো বেশি সচেতন হয়ে যাবে। এতে আখেরে ওর নিজেরই ক্ষতি। নীলকে টেবিলে ব্রেকফাস্ট দিতে গিয়ে, ওর মা লক্ষ করলেন একটা ব্যাপার। নীলের চোখ দুটো টকটকে লাল। যেন চোখের ভেতর চাপ চাপ রক্ত জমে আছে। চোখের মণিটা আলাদা করে ভালো মতো দেখা যাচ্ছে না। বরং বেশ কিছুটা ফ্যাকাসে মতো ভাসা ভাসা দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ করে দেখলে শিউরে উঠতে হয় ভয়ে। নীলের মায়ের ভেতর ভেতর একটা ভয় কাজ করছিল। কাল রাতের ওই দৃশ্যটার পর কিছুই স্বাভাবিক লাগছে না ওনার। তার ওপর আজকে সকালে নীলের চোখ দুটো এত লাল কেন? ভেতর ভেতর নিজের কৌতূহল আর চাপতে পারছিলেন না ভদ্রমহিলা। নীল চুপচাপ ব্রেকফাস্ট করছিল। ব্রেকফাস্ট করছিল বললে একটু ভুল বলা হয় হয়তো। যতটা না খাচ্ছিল, তার চেয়ে বেশি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এদিক-ওদিক ফেলছিল প্লেটের মধ্যে। কোনও মতে যেন খাবারগুলো মুখে ঢোকাচ্ছে। ভালো করে চাবাচ্ছেও না খাবারটা। নীলের মায়ের ভেতর ভেতর অসম্ভব চিন্তা হচ্ছিল। শেষে উনি আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না। নীলকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর চোখ দুটো এত লাল কেন রে? ইনফেকশন কিছু হয়েছে না কি? ডাক্তারের কাছে চল বিকেলে..."

আপনমনে মাথা নীচু করে, গুনগুন করে কী একটা গানের সুর ভাজছিল। মায়ের কথাটা শুনে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল হঠাৎ। তারপর পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে, আমতা আমতা স্বরে উত্তর দেয়, "কী? কই?... না তো! কিছু না। সকালে চোখ ডলেছিলাম। সেইজন্যই হয়তো। না না, ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার নেই কিছু..."

"তুই কি পাগল হয়েছিস? একবার চোখ দুটো আয়নায় দেখ। অসম্ভব লাল হয়েছে!"

"বললাম তো মা, ওটা কিছু না... চিন্তা কোরো না।"

"তোর শরীর ঠিক আছে তো নীল?"

"হ্যাঁ... কী বলছ এসব হঠাৎ করে? খারাপ থাকবে কেন শরীর? কী

হয়েছে বলো তো তোমার?”

“না না কিছু না... ঠিক আছে। খা তুই। ভালো করে খাচ্ছিসও না...”

“ঠিক খিদে নেই মা...”

নীলের মা জানেন যে, আঙুল দিয়ে চোখ ডললে, চোখ এতটা লাল হয় না। তবু মুখে কিছু বললেন না। কোনোমতে ব্রেকফাস্টটা শেষ করে, গায়ে একটা জামা গলিয়ে, বেরোচ্ছিল নীল। ভদ্রমহিলা পেছন থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, “বেরোচ্ছিস না কি? কোথায় যাচ্ছিস?”

ভদ্রমহিলা আগে কোনোদিন নীলকে এরকম জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করেননি। কিন্তু আজকে কী একটা হয়েছে ওনার। কাল রাতের ওইসব দৃশ্য দেখার পর উনি মন থেকে আর নীলকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। ভেতর ভেতর নিজের সঙ্গেই ওনার একটা দ্বন্দ্ব চলছে। উনি বুঝতে পারছেন নীলের ওষুধে কোনও কাজ হচ্ছে না। নীল চূড়ান্তরকম মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থ। কিগানের সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথা বলাটা দরকার ওনার। কিগানকে জানানো দরকার সমস্ত ঘটনাটা।

নীল বেরোতে বেরোতে মায়ের ডাক শুনে ফিরে এসে উত্তর দেয়, “কাজ আছে। দেরি হবে ফিরতে। তুমি খেয়ে নিয়ো দুপুরে...”

নীল বাইরে বেড়িয়ে যেতেই, আর একমুহূর্তও সময় নষ্ট করলেন না ভদ্রমহিলা। দরজা লক করে সোজা নীলের ঘরে ঢুকলেন। কাল রাতে বিছানার পাশেই বেদিটা রাখা ছিল। আর তার ওপর কী একটা জিনিস! কোনও মূর্তি না কি অন্য কিছু? কিন্তু কিছু তো একটা রাখা ছিল এই ব্যাপারে উনি নিশ্চিত। তন্নতন্ন করে খুঁজেও নীলের ঘর থেকে ওরকম কোনও বেদি বা মূর্তি টাইপের কিছুই পেলেন না ভদ্রমহিলা। তাহলে কি কাল রাতে ভুল দেখেছেন উনি? সেটাও-বা কীভাবে সম্ভব? ওনার স্পষ্ট মনে আছে এখনও সমস্তটা। কিন্তু আজ সকালে কিছুই নেই কাল রাতের ওসব জিনিসপত্র! যেন সব জিনিসপত্রগুলো কর্পূরের মতো রাতারাতি উবে গিয়ে বাতাসে মিশে গেছে! এরপর নীলের বালিশের নীচের তোষকটা তুললেই ভদ্রমহিলা দেখতে পেলেন, তোষকের নীচে কোনও পুরোনো পুঁথির একটা ম্যাড়ম্যাড়ে ছেঁড়া পাতা। পাতাটা হলদে হয়ে গেছে। কাগজের কোনাগুলো ছেঁড়া। কাগজটার মধ্যে গোটা গোটা কালো কালির হরফে কীসব যেন লেখা

আছে। কাগজটার ওপরে তিনটে লাল টিপ মতো দেওয়া। কোনও স্তোত্র বা শ্লোক লেখা আছে কি এখানে? কয়েকটা লেখা ঘোলাটে হয়ে গেছে। বাদবাকিগুলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কাগজটায় লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করেও পড়তে পারলেন না ভদ্রমহিলা। কী ভাষায় লেখা এটা? লেখাটার মানেই-বা কী? গতকাল রাতে নীল অদ্ভুত একটা ভাষায় কীসব মন্ত্র পাঠ করতে করতে উলঙ্গ হয়ে নাচছিল। তাহলে কি কাল রাতে ও এই কাগজের লেখাটাই পাঠ করছিল? কিন্তু এই ভাষা নীল শিখল কখন? কে ওকে এই ভাষাটা শেখাল? ভদ্রমহিলা নিজেই কাগজে লেখা হরফগুলোর অর্থ বুঝতে পারছেন না। আর তাছাড়া এরকম কোনও কাগজ তো আগে এই বাসায় কখনও দেখেননি উনি। এটা কীসের কাগজ? কোনও পুরোনো বইয়ের ছেঁড়া পাতা কি? সেটাই যদি হয়, তাহলে এটা কোন বইয়ের পাতা? নীলের কাছেই-বা এটা এল কীভাবে এই কাগজের টুকরোটা? অনেক প্রশ্ন ভদ্রমহিলার মাথায় ঘোরাঘুরি করছে। কিন্তু শূন্যে হাতরে হাতরেও কোনও যুক্তিযুক্ত উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না উনি।

১৩

"সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে?" খাতায় লিখতে লিখতে কিগান জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ... সামনে কিছু একটা ছিল; কিন্তু আমি ঠিকমতো লক্ষ করিনি সেটা কী... একটা বেদির ওপর বসানো ছিল জিনিসটা। সম্ভবত একটা মূর্তি... হয়তো... ওরকমই কিছু একটা লাগছিল দেখতে... আমি ঠিক ভালো করে লক্ষ করিনি। পরদিন নীল যখন বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে, আমি ওর ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজলাম; বেদি বা ওই মূর্তি জাতীয় কিচ্ছু খুঁজে পাইনি নীলের ঘর থেকে" উত্তর দিলেন নীলের মা।

"আচ্ছা... মূর্তি মতো জিনিসটার সাইজ কীররকম ছিল কিছু মনে আছে?"

"মাঝারি সাইজের..."

"হুম..." কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে কী একটা ভাবল কিগান। নীলের মায়ের মুখ থেকে সমস্তটা ও খুব মন দিয়ে শুনেছে। কিন্তু কী বলবে বুঝতে পারছে না। একে তো সেদিন রিয়ার যুক্তিটা ফেলে দেওয়ার মতো না। তার ওপর

আজকে নীলের মা যেসব ঘটনার কথা বলছেন, সেটা স্কিজোফ্রেনিয়ার সঙ্গে কতটা যায়, এতে কিগানের সন্দেহ হচ্ছে এখন। স্কিজোফ্রেনিয়া হলে অন্তত কিছুটা হলেও ওষুধে কাজ দেওয়া উচিত ছিল। ওষুধ কি পালটে দেখবে একবার? সেটাও ঠিক করে বুঝতে পারছে না কিগান। নীলের প্রবলেমটা দিনকে দিন আরো কঠিন হয়ে উঠছে ওর কাছে। কিগান যত চেষ্টা করছে সমস্যার গভীরে ঢুকতে, তত বিষয়টা আরো বেশি করে জটিল হয়ে উঠছে।

সেদিন নীলের মা রাতে নীলকে ওই অবস্থায় দেখার পর, ওর ঘর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও, ওই ছেঁড়া কাগজের লেখাটা ছাড়া আর কিছুই সেরকম খুঁজে পাননি। নীলকেও উনি সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করেননি। তবে ওইদিনের পর থেকে নীলের মধ্যেকার পরিবর্তনটা উনি বেশ ভালোমতো বুঝতে পারছেন। রাতবেরাতে নীলের ঘর থেকে ওরকম ফিসফিসানি মন্ত্রপাঠের আওয়াজ ভেসে আসে। কোনো-কোনোদিন ঘরে উঁকি দিয়ে ওর মা দেখেছেন, ঠিক প্রথম দিনের মতোই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় নেচে চলেছে একটা লাল শালু কাপড়ে মোড়ানো বেদি আর তার ওপরে রাখা একটা মূর্তি জাতীয় কিছুর সামনে। সমস্ত ঘরে ঘোলাটে লাল আলো। কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া সমস্ত ঘরে ছড়ানো। সকালে উঠে দেখা যায় নীলের চোখ দুটো টকটকে লাল। এখন তো নীল সেরকম কথাও বলে না। সারাক্ষণ ঘরের মধ্যেই থাকে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। খাওয়ার সময় বাইরে খেতে আসে। বেশি কথা বলে না। মাথা নীচু করে যেটুকু খাওয়ার খেয়ে, উঠে ঘরে ঢুকে যায়। খায় কম, আর খাবার নষ্ট করে বেশি। কিছু জিজ্ঞেস করলেও ঠিকঠাক উত্তর দেয় না। কেমন একটা জড়ানো গলায় অসংলগ্ন ভঙ্গিতে উত্তর দেয়। এক-আধদিন নীলের মা লুকিয়ে দেখেছেন, নীল ঘরের ভেতর সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। যখন বাইরে খেতে আসে, তখনও জামাকাপড়ের ঠিক থাকে না। অনেক সময় হয়তো স্যান্ডো গেঞ্জি পরেছে, কিন্তু নীচে প্যান্ট পরতে ভুলে গেছে। নীলের মা বকা দিতেও ভয় পান নিজের ছেলেকে। শান্ত স্বরে এক-দুবার বলেন। নীল নিজেই ঘরে ঢুকে প্যান্ট পরে আসে।

কিছুক্ষণ থেমে, কী একটা চিন্তা করে কিগান উত্তর দেয়, "আপনারা আগে কোচবিহারে থাকতেন তাই না?"

"হ্যাঁ..."

"ওখানকার হুদুম দেও পূজার ব্যাপারে আপনি শুনেছেন?"

ভদ্রমহিলার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, নীল কেন, উনি নিজেও ওরকম কোনও পূজার নাম আগে শোনেননি।

কিগান ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে বলল, "দেখুন এটা আপনাকে আমি একটু আগেই বললাম। নীলের প্রত্যেকটা হ্যালুসিনেশন বা স্বপ্নের সঙ্গে একটা করে প্রাচীন আচার-রীতি বা লৌকিক কোনও প্রথার মিল আছে। সেক্ষেত্রে নীলের এই ব্যাপারটাকে ঠিক হ্যালুসিনেশন বলা যায় না..."

"তাহলে? ওর ঠিক হয়েছেটা কী?"

"সত্যি বলতে, আমি নিজেও এখনও ঠিক করে বুঝতে পারছি না। তবে বোঝার চেষ্টা করছি। আসামের সীমান্তবর্তী গোয়ালপাড়া, ধুবড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, বিহারের পূর্ণিয়া, এমনকি বাংলাদেশের রংপুরেও এই হুদুম দেও ঠাকুরের পূজার চল আছে গ্রামের দিকে। হুদুম দেও হল ওই অঞ্চলের বৃষ্টির দেবতা। কোথাও কখনও বৃষ্টি কম হলে, ফসলের ক্ষতি হয়; ফলে ফলন কম হয় ওই বছর। তখন ওইসব অঞ্চলের গ্রামের বউরা এই হুদুম দেওর পূজা করে। সাধারণত গোবর দিয়ে মূর্তি বানিয়ে, কিংবা ওই কলাপাতা বা বাঁশ গাছ মাটিতে পুঁতে সেটাকে হুদুম দেও ঠাকুর কল্পনা করে পূজাটা করে। এই হুদুম দেও ঠাকুরকে কল্পনা করা হয় সম্পূর্ণ উলঙ্গ হিসেবে। ওই পূজায় গ্রামের বউরা এলো চুলে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ওই ঠাকুরের থানের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচ এবং গান করে। এই গানটাই হল ঠাকুরের মন্ত্র। রংপুরে পুরষরাও গরু খেদাবার লাঠি নিয়ে বৃত্তাকারে নেচে নেচে মাটিতে খোঁচা মারে ওই লাঠিটা দিয়ে। এটাকে ওরা পেন্টি নাচ বলে। এছাড়া "কালবিবেক" নামের একটা বইয়ে হোলির সময়ে, আর চৈত্র মাসে "কাম মহোৎসব" বলে একটা উৎসবের নাম পাওয়া যায়, যেখানে ওই অঞ্চলের সবাই অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিতে নাচ গান করত। আপনি বলছেন নীল কোনও একটা মূর্তি জাতীয় কিছুর সামনে উলঙ্গ হয়ে নেচে নেচে মন্ত্র পড়ে। সেক্ষেত্রে খুব কাছাকাছি এই লোকাচারটার কথাই মনে এল। কিন্তু এর সঙ্গে নীলের ওই উলঙ্গ নাচের সম্পর্ক থাকার কথা না। কারণ হুদুম দেও পূজায় একমাত্র বাড়ির বউরাই অংশগ্রহণ করে। সেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ... আর এখানে নীল নিজে একজন পুরুষ। আর নীলের এই উলঙ্গ হয়ে নাচ

করতে করতে মন্ত্রপাঠটা বাদ দিলে হুদুম দেওর সঙ্গে আর কোনও মিল দেখতেও পাচ্ছি না। সেক্ষেত্রে এই লোকাচারের সঙ্গে একটামাত্র মিলের ভিত্তিতে নীলের কেসটার কানেকশনটা করা উচিত না। সেটা করছিও না” নিজের কথা শেষ করে আবার একটু থামল কিগান। কী একটা চিন্তা করে, ওর ডেস্ক থেকে একটা পুরোনো খাতা বের করে এনে, কী একটা খুঁজতে শুরু করল। তারপর নীলের মা-কে কিগান বলল, “হ্যাঁ পেয়েছি... একটা অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো ট্রাই নিচ্ছি। মনে করে দেখুন তো, আমি যে লাইনগুলো বলছি; আপনি বলবেন, এরকম কিছু নীলের মুখে শুনেছিলেন কি-না উলঙ্গ হয়ে নাচ করার সময়ে?... আমি পড়ছি, শুনুন...” এই বলে কিগান খাতার একটা কাগজ থেকে রিডিং পড়া শুরু করল, “হিলহিলাছে কোমরটা মোর / শির শিরাছে গাও / কোনঠে কোনা গেলে এলা / হুদুমার দেখা পাও / পাটানি খান পিড়ছে খসিয়া / আউল হইচে মোর খোপাটা / হুদুম দেখা দেও গো আসিয়া...”

কিগানের পড়া শেষ হলে ভদ্রমহিলা কিছুটা অবাক হয়ে উত্তর দিলেন, “না এরকম কিছু না। ওই ভাষাটা কেমন জানি। আমি আগে কখনও ওই ভাষাটা শুনিনি। আপনি যেটা পড়লেন, সেটা তো সম্ভবত রাজবংশী ভাষা...”

“এক্সাক্টলি... হুদুম দেও পূজার গান। আমি আসলে দেখতে চাইছিলাম কানেকশন কিছু আছে না-কি... যদিও নব্বই শতাংশ নিশ্চিত ছিলাম কানেকশন পাব না। তবুও...”

“না না এরকম কিছু না। বললাম তো, ওই ভাষাটা অদ্ভুত। আমি আগে কখনও শুনি ওই ভাষা... এমনকি আগে কখনও কাউকে ওই ভাষায় কথাও বলতে দেখিনি...”

“আচ্ছা বুঝলাম। নীলের বিছানার তোষকের নীচ থেকে যে কাগজের টুকরোটা পেয়েছেন, ওটার ছবি আছে কোনো?”

মাথা নাড়ান ভদ্রমহিলা, “না... ছবি তো তোলা হয়নি...”

“আচ্ছা ইটস ওকে...” কথাটা বলেই কী একটা চিন্তা করে কিগান বলে, “আচ্ছা ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আমি একদিন আপনার বাড়িতে আসতে চাই। আমি একটু সামনে থেকে দেখতে চাই ব্যাপারটা। নীলকে আগে থেকে কিছু জানানোর দরকার নেই। আমি পরশু যাব সকাল এগারটার

দিকে... আর আমি ক্লোজ়াপিনটা চেঞ্জ করে রিসপেরিডন লিখে দিচ্ছি। আপাতত এটাই চলুক। ও বাই দ্য ওয়ে, আমার সঙ্গে আরেকজন থাকতে পারে। প্রবলেম নেই তো?"

"না না প্রবলেম কীসের?"

"গ্রেট!... আচ্ছা, আরেকটা কথা, যেদিন আপনার বাড়িতে যাব, সেদিন ওই অদ্ভুত ভাষায় লেখা ছেড়া কাগজের টুকরোটাও দেখব। ওটা কাছে রাখবেন..."

ভদ্রমহিলা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান।

কিগান চাইছিল রিয়াকে সঙ্গে করে একবার নিয়ে যাবে নীলের বাড়িতে। রিয়ারও দেখা উচিৎ ব্যাপারটা। নীলের মায়ের কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হয় কিগান।

১৪

কলিংবেল বাজতেই দরজা খুললেন নীলের মা। বাইরে কিগান আর রিয়া দাঁড়িয়ে। কিগান আগেই ভদ্রমহিলাকে জানিয়েছিল ওরা আজকে আসবে। নীলের মা বেশ খাতিরযত্ন করে ওদের ভেতরে নিয়ে এলেন।

নীলদের বাড়ির ড্রয়িং রুমটা বেশ পরিপাটি। ঘরের মাঝখানে কাচ সেট করা চা-গাছের টেবিল; আর সেটা ঘিরে তিনটা সোফা সাজানো। এক পাশে দুটো সিঙ্গল সোফা পাশাপাশি রাখা; আর আরেকপাশে লম্বাটে আরেকটা সোফা। কিগান আর রিয়া সিঙ্গেল সোফা দুটোয় দু-জনে বসল।

"নীল নেই?" সোফায় বসতে বসতে কিগান জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ... ডাকছি। আপনারা বসুন।" নীলের মা কিগানদের বসতে দিয়ে নীলকে ডাকতে গেলেন। নীলকে ভদ্রমহিলা ডাকামাত্রই ঘরের ভেতর থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ আসল। কিগান আর রিয়া দু-জনেই সেটা শুনল; দু-জন দু-জনের দিকে একটা শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল; কিন্তু কেউ কোনও মন্তব্য করল না। ভদ্রমহিলা নিজেও একটু অপ্রস্তুত এই ঘটনায়। একটা অস্বস্তিকর চাহনিতে উনি কিগানের দিকে তাকালেন।

আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ করে নীল বেরিয়ে এল ঘর থেকে; আর নীলকে দেখামাত্র রিয়া লজ্জায় লাল হয়ে গেল। কিগান আর নীলের মা

দু-জনের কেউও-ই প্রস্তুত ছিল না এরকম কিছু একটা ঘটনার জন্য। নীল ওদের সামনে দাঁড়িয়ে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে। চোখ দুটো অসম্ভব লাল। যেন রক্ত ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সেই চাহনিতে কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। কেমন একটা নিস্তেজ নিষ্প্রভ। গলার নীচের কলার বোন, বুকের হাড় স্পষ্ট দেখা যায়। এই ক-দিনে শরীর অসম্ভব ভেঙেছে ওর। ঠোঁটের কোণ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই নীলের। একনজরে নীলকে দেখলে মনে হয় ছেলেটা ওর নিজের ইচ্ছায় কিছু করছে না; বরং ওকে বাইরে থেকে অন্য কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে। নীল এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। কিন্তু সোফায় বসল না। নীলের মায়ের চোখে চাপা লজ্জা। বাইরের লোকের সামনে এভাবে উলঙ্গ অবস্থায় ছেলে বেরিয়ে এসেছে। কিছু বলতেও উনি সাহস পাচ্ছেন না নীলকে। পাছে হিতে বিপরীত না-হয়ে যায়। আজকাল উনি নীলকে একটু সামলে চলেন।

"কেমন আছ নীল?" স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করল কিগান।

নীল কোনও উত্তর দিল না। এমনকি কিগানের দিকে ঠিক করে তাকিয়েও দেখল না। নীল ঠিক কোন দিকে দেখছে সেটা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। কিগান আগের মতোই শান্ত গলায় আবার ওকে জিজ্ঞেস করল। এবার নীল অস্পষ্ট গলায় ভাঙা ভাঙা স্বরে উত্তর দিল, "নীল কেমন আছ?... নীল কেমন আছ... নী...ল...কেমন.... আ...ছ?"

কিগানের জিজ্ঞেস করা কথাটাই ও বার বার রিপিট করছে নিজের মুখে। কিগানের এবার একটু সন্দেহ হল। নীলের এরকম আচরণ করার কথা না। ও একবার ঘরের বাকি দু-জনের দিকে তাকাল। ওরা দুইজনও নীলের দিকে কেমন একটা অপ্রস্তুত ভয় ভয় চোখে তাকিয়ে আছে। কিগান আবার ওকে জিজ্ঞেস করলো, "এখন কেমন আছো নীল?"

আবারও সেই অপ্রকৃতিস্থভাবেই উত্তরটা এল, "কেমন... আছ... নী... ল? নী... ল..." তারপর একটু থেমে থেমে ভাঙা গলায় বলল, "ভালো... ভালো আছি... ভালো আছি... ভালো আছি..."

এবারো, একই কথা বার বার ও রিপিট করছে। কিগান বিড়বিড় করল নিজের মনে, "ক্যাটাটনিক স্কিজোফ্রেনিয়া... কিন্তু এটা হওয়ার কোনও চান্সই ছিল না। ওষুধ চলছিল..."

কী একটা ভেবে কিগান নীলের মা-কে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ওষুধের কোর্সটা ঠিকঠাক চলছে তো?"

"হ্যাঁ... আপনি যেভাবে বলেছেন।" আমতা আমতা স্বরে উত্তর দেন ভদ্রমহিলা।

কিগান একবার রিয়ার দিকে তাকাল। রিয়ার মুখ ভাবলেশহীন। ও নিজেও এখনও ঠিক করে কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। অদ্ভুত একটা আচরণ করছে নীল। কেমন জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। হাত-পা নাড়াচ্ছে না। নিজে মাঝে মাঝে একজায়গায় দাঁড়িয়ে হালকা এপাশ-ওপাশ দুলছে। সেই দোলার মধ্যেও একটা তাল আছে। মুখ দিয়ে এখনও অনবরত লালা চুইয়ে পড়ছে।

নীলের মা কিগানকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী বুঝছেন?"

কিগান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ নীল নিজে থেকে বলে উঠলো, "কু...কু..."

কিগান আর রিয়া তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে আছে নীলের দিকে। বোঝার চেষ্টা করছে নীল কী বলতে চাইছে।

"কু কী নীল? কী বলছ? ঠিক করে বলো..." শান্ত স্বরে কিগান জিজ্ঞেস করে নীলকে।

নীলের সেইদিকে হুশ নেই। ও একমনে বলে চলেছে, "কু... কু... অন্ধকার... ভীষণ অন্ধকার এখানে। ভীষণ... ওই তো আলো... একটা ঘর... অন্ধকারে হালকা হালকা মন্দিরের চূড়াটা দেখা যাচ্ছে। একটা ঘর..."

কিগান বুঝল নীল আবার হ্যালুসিনেট করছে। ও জিজ্ঞেস করল নীলকে, "কীসের মন্দির নীল? কোন চূড়া?"

"চূড়া... মন্দির... ওখানে কারা? কী করছে? একটা বড়ো হাঁড়ি মতো আগুনের ওপর। কিছু একটা রান্না হচ্ছে। বড়ো বড়ো লাঠি দিয়ে জোরে জোরে নাড়ছে সবাই মিলে হাঁড়িটার ভেতর..."

"ওরা কারা নীল? একটু গুছিয়ে বলো..."

"মাংস... কাঁচা কাঁচা মাংস..."

"কীসের মাংস? কী বলছ তুমি? আমাকে ক্লিয়ারলি বলো নীল। না-হলে আমি কীভাবে তোমার হেল্প করব বলো?"

"আমাকে ওরা দেখে ফেলেছে! না...! না...! ছেড়ে দাও...! আমার লাগছে! আহ্...! আমার লাগছে। আমি সহ্য করতে পারছি না!"

"নীল কে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? কী দেখছ তুমি বলো! শান্ত হয়ে বলো! এটা সত্যি না! হ্যালুসিনেশন!"

"কাঠের একটা ফ্রেম। আমাকে ঝুলিয়ে পেটাচ্ছে ওরা। আহ্! প্লিজ়... প্লিজ়....আহ্! আ...মা...র লাগছে! ব্যথা করছে। আহহহ্! পেট কেটে স...ব!..."

"পেট কেটে কী? কোন কাঠের ফ্রেম নীল?"

"কাঁচা কাঁচা মানুষের মাংস! কাঁচা কাঁচা... মাংস খাব!..."

রিয়ার কী একটা খটকা লাগে। কিগানকে কাছে ডেকে ওর কানের কাছে ফিসফিস করে রিয়া বলে, "হাওয়াই!"

"মানে?"

"বহু আগে হাওয়াইতে এরকম একটা রিচুয়াল চালু ছিল। 'কু' নামের একজন দেবতার সামনে মন্দিরে বন্দিদের ধরে এনে কাঠের ফ্রেমে উলটো করে ঝুলিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে ওদের মারা হতো। তারপর পেট কেটে নাড়িভুড়ি সব বের করে এনে, ওদের কাঁচা মাংস খাওয়ার চল ছিল পুরোহিত আর গোষ্ঠীপতিদের মধ্যে। এই রিচুয়ালটার নামক ছিল 'হেইয়াউ'... নীল এখানে সেটাই হয়তো হ্যালুসিনেট করছে..."

কিগান এবার চিৎকার করে একরকম ধমকে উঠল নীলকে, "নীল... আমার কথা মন দিয়ে শোনো! তুমি যা যা দেখছ সবটাই মিথ্যা। হ্যালুসিনেশন। প্লিজ় তুমি শান্ত হও! লিসেন টু মি কেয়ারফুলি! আমি তোমাকে সাহায্য করতেই এখানে এসেছি। তোমাকে সাহায্য করতে দাও আমাকে! লেট মি হেল্প ইউ নীল!"

হঠাৎ নীলের চোখদুটো ধবধবে সাদা হয়ে গেল। যেন মুহূর্তে রক্তশূন্য হয়ে গেছে চোখের ভেতরটা। চোখের মণি অবধি দেখা যাচ্ছে না। তারপর সবাইকে চমকে দিয়ে নীল একলাফে কাচের টেবিলটার ওপর উঠে বসে কিগানের কলার চেপে ধরল। এটার জন্য কিগান নিজেও তৈরি ছিল না। নিজেকে সামলাতে পারল না ও। কিগানের কলার চেপে ওকে পেছনের দিকে ঠেলে ধরেছে নীল।

"কী করছ নীল? কুল ডাউন! শান্ত হও!"

দাঁত খিচিয়ে এবার বিশ্রীভাবে উত্তর দিল নীল, "চুপ হারামজাদা! একবার আমাকে গিলে খেয়ে শিক্ষা হয়নি? কতবার গিলবি আমাকে হারামজাদা?"

কিগান লক্ষ করল নীলের ঠোঁটের কোণে একটা ক্রূর হাসির রেখা ধীরে ধীরে প্রকট হচ্ছে। "বার বার জন্ম নিচ্ছি...! বার বার পালিয়ে পালিয়ে বেরাচ্ছি! আর বার বার তোরা আমাকে ধরে ধরে এনে বলি দিচ্ছিস! আমাকে বাঁচতে দিবি না তোরা? এত খিদা তোদের?"

আমতা আমতা স্বরে কিগান নীলকে বলে, "কী বলছ নীল? কীসব উলটোপালটা বলছ? লেট মি হেল্প ইউ নীল। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না! এগুলো কিচ্ছু সত্যি না। তোমার হ্যালুসিনেশন আর ডিলিউসন এগুলো! ট্রাস্ট মি নীল!"

"চুপ!" ধমকে কিগানকে থামিয়ে দেয় নীল। কিগান লক্ষ করল নীলের গলার স্বর পালটে গেছে। আগের মতো নেই। এটা নীলের সহজাত গলার স্বর না। তাহলে কি স্প্লিট পারসোনালিটি ডিসঅর্ডার? বিষয়টা ঠিক করে ধরতে পারছে না কিগান।

আবার ধমকে উঠল নীল, "বার বার মারার চেয়ে একবারেই শেষ করে ফেল না আমাকে। নে... চেখে দেখ! দেখবি না-কি চেখে? কাঁচা কাঁচা মাংস!"

রিয়া পাশ থেকে বিড়বিড় করছে। এই আশঙ্কাটাই ও করছিল। ওগুলো নিছক স্বপ্ন বা হ্যালুসিনেশন না। ওগুলো নীলের অতীত... ওর আগের সমস্ত জন্মের পরিণতি নীল কোনও একটা অলৌকিক ক্ষমতা বলে দেখতে পাচ্ছে। কেউ ওকে ওর আগের সমস্ত জন্ম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আসছিল এতদিন। কিন্তু কে?

নীল কিগানকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলছে, "কী, কী ভেবেছিলি? গিলে খাবি আমাকে? পারবি না! আর পারবি না। এখন আমার সঙ্গে ও আছে।"

"কে নীল? কে আছে তোমার সঙ্গে?" আমতা আমতা গলায় আবার জিজ্ঞেস করে কিগান।

কিগানের প্রশ্নটা শুনে খিলখিল করে হেসে ওঠে নীল। যেন কোনও

মজার কথা শুনেছে। তালি বাজিয়ে বাজিয়ে দুলে দুলে হাসছে নীল। আর তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে একলাফে টেবিল থেকে নেমে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল ও। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘরের ভেতর থেকে হাতে করে নিয়ে বেরোল একটা মাঝারি মাপের মূর্তি। মূর্তিটাকে একঝলক দেখলে শিউরে উঠতে হয়। কী ভয়ংকর দেখতে। এই মূর্তি নীল পেল কোথায়? মূর্তিটা দেখতে প্রাচীন ধাঁচের। কোনও দেবতার মূর্তি মনে হচ্ছে না। একঝলক দেখলে ওটাকে কোনও অপদেবতার মূর্তি বলে মনে হয়।

মূর্তিটাকে জড়িয়ে ধরা অবস্থায় চিবিয়ে চিবিয়ে নীল বলতে শুরু করল আবার, "দ্যাখ শালা... গিলবি আমাকে? গেল দেখি কত হিম্মত তোদের!"

"এই মূর্তি কোথায় পেলে তুমি নীল? এরকম মূর্তি তো তোমার কাছে থাকার কথা না নীল..." কিগান জিজ্ঞেস করল ওকে।

"চুপ হারামজাদা! খুন করে দেব! 'দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎ পদ্যতে ধ্রুবম!" কিছু বুঝেছিস? ঘণ্টা বুঝেছিস! ইষ্টদেবতার আলাদা মূর্তি হয় না রে। দেবতার শরীর তৈরি হয় বীজমন্ত্র উচ্চারণ করলে। মন্ত্র-জপ করে তৈরি করতে হয় দেবতার রূপ। ইনি আমার সেই ইষ্টদেবতা! বীজমন্ত্রের সাহায্যে আমি ওঁর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছি। মূর্তি বানিয়েছি। এই... এই নিজের হাতে!..."

"কোথায় পেলে সেই বীজমন্ত্রটা তুমি? কেউ তোমাকে শিখিয়েছে সেটা?" কিগান ধীর গলায় জিজ্ঞেস করে নীলকে।

"আমার ইষ্টই পূজক হিসেবে আমাকে বেছে নিয়েছেন। আমাকে উনিই সব শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছেন। প্রথম একদিন বাজার থেকে ফেরার সময় কাগজটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। কী লেখা ছিল ওতে প্রথমে কিছুই বুঝিনি। উদ্ভট সব অক্ষর... উচ্চারণ করে পড়তেই পারিনি লেখাটা। তারপর ধীরে ধীরে... প্রতিদিন রাতে একটু একটু করে স্বপ্নের মধ্যে আমাকে আমার ইষ্টদেবতা শিখিয়ে দিয়ে গেছে কাগজে লেখা বীজমন্ত্রটা... সেই বীজমন্ত্রে আমি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছি আমার দেবতার।"

কিগান বা নীলের মায়ের কারোরই বুঝতে বাকি রইল না, নীলের তোষকের নীচে পাওয়া কাগজে ওই লেখাগুলো আসলে এই মূর্তিটার বীজমন্ত্র। আর দিনের পর দিন গভীর রাতে নীল ওভাবে উলঙ্গ হয়ে, নেচে

নেচে অজানা ভাষায় এই বীজমন্ত্রই পাঠ করত! সাধারণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে কথাগুলো বিশ্বাস করা যায় না। অথচ নীলের এই অস্থির অবস্থা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে কিগানরা। সেটাকেও-বা কীভাবে অস্বীকার করে ওরা!

নীল বলে চলেছে, "আমার রুচিই আমার ইষ্টের রুচি... যা যস্যাভিমতা পুংসঃ সা হি তসৈব দেবতা!" মানসপূজা... আমার ইষ্টের জন্মস্থান আমার শরীর। ইষ্টের রূপ দেখতে চাইলে মনের ভেতর দেখো... 'সর্বাসু বাহ্যপূজাসু অন্তঃপূজা বিধীয়তে, অন্তঃপূজা মহেশানি বাহ্যকোটিফলং লভেৎ!"... চিনি খুটে খুটে খাবে... অথচ চিনি হতে বললেই শালা ভয়ে মরে!" কথা শেষ করে আবার সেই বিকট স্বরে খিলখিল করে হেসে উঠল নীল।

কিগান আর রিয়ার মুখে কোনও কথা নেই। ওরা তিনজনই শূন্য দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে নীলের এসব কীর্তিকলাপ দেখছে। অথচ কিগানের এই অবস্থায় ঠিক কী করা উচিত সেটাই ও ঠিক করে বুঝে উঠতে পারছে না।

চিবিয়ে চিবিয়ে আবার নীল কিগানের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে, "আমার ইষ্টই আমি। আমিই আমার ইষ্ট। আমরা এক। আমার খাদ্যই আমার ইষ্টের খাদ্য... আমার ইষ্টের খাদ্যই আমার খাদ্য! সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তুনি দৈবত, যদাত্মনি প্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পয়েৎ! আমার ইষ্ট মানুষের কাঁচা কাঁচা মাংস খেতে চায়। আমারও তাই মানুষের মাংসের খিদা। মেটাবি আমার খিদা? আমাকে তো যুগে যুগে গিলে খেয়েছিস তোরা! বাঁচতে দিসনি! এবার আমার খিদা পেয়েছে। আমার খিদা মেটা!"

কথাটা বলতে বলতে নীল ক্রূর দৃষ্টিতে রিয়ার দিকে তাকাল। সেই চাহনি কোনও সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের না। সেই চোখের ভেতর জমাট নৃশংসতা... সেই দৃষ্টিতে বহু যুগের জমানো খিদা।

রিয়া ওভাবে নীলকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেল। ওর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আগাম একটা আশঙ্কা ও টের পাচ্ছে। কিন্তু সেই আশঙ্কার ব্যাপকতা ও তখনও টের পায়নি। হঠাৎ নীল এক লাফে রিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল। হাত দুটো দিয়ে ওর সামনের সোফার হাতল দুটো শক্ত করে ধরে ঝুঁকে পড়ল রিয়ার

সামনে। রিয়া পেছনের দিকে সরতে গেল, কিন্তু নাড়াচাড়া বিশেষ করতে পারছে না। ওর ঠিক মুখের সামনে নীলের মুখটা। ঠোঁটের কোণা দিয়ে লোল গড়িয়ে পড়ছে। চোখ দুটো ধবধবে সাদা; কোনও মণি নেই চোখের ভেতর। মুখে একটা অপ্রকৃতিস্থ নৃশংস হাসি। রিয়া কিগানের দিকে ইশারায় তাকায়। কিগান হাত দিয়ে ইশারা করে ওকে শান্ত থাকতে বলে। তারপর কিগান নিজেই নীলকে ধমকে বলে, "নীল! তুমি শান্ত হও! এখানে কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করবে না! তুমি এখানে সেফ! লেট মি হেল্প ইউ নীল! প্লিজ়! ফর গডস সেক!"

নীল একদৃষ্টিতে রিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। কিগানের কথার কোনও উত্তরই দিল না ও। যেন কিগানের কথাগুলো ওর কানেই ঢোকেনি। নীলের মুখের লালা চুইয়ে পড়ছে রিয়ার জিন্সের ওপর। ঘেন্নায় গা ঘিনঘিন করছে রিয়ার। গা ঘিনঘিন করে উঠছে ওর। কিন্তু রিয়া নিরুপায়... নাড়াচাড়াও করতে পারছে না। কিগানও এখন মনে মনে আফশোস করছে রিয়াকে এসবের মধ্যে জড়ানোর জন্য। ও নিজেও অসহায় হয়ে পড়েছে ভেতর ভেতর। কিন্তু এখন অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। এখন কিগান নিরুপায়। হঠাৎ নীল রিয়ার কাঁধ লক্ষ করে বিশাল একটা হাঁ-করে কামড় বসাল। নীলের দাঁতের দাগ গাঢ় হয়ে গেঁথে গেল রিয়ার শার্ট ভেদ করে। মনে হল যেন রিয়ার কাঁধ থেকে নীল দাঁত দিয়ে কামড়ে মাংস খুবলে আনল। মুহূর্তে রক্তে ভিজে গেল রিয়ার শার্ট; আর যন্ত্রণায় তারস্বরে চিৎকার করে উঠল রিয়া। দু-হাত দিয়ে গাঁয়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে নীলকে পেছনের দিকে সরানোর চেষ্টা করছে ও। কিন্তু ওকে সরানো যাচ্ছে না। নীল রিয়ার কাঁধে আরো গাঢ় কামড় বসিয়ে যেন রক্ত চুষে নিচ্ছে। নীলের চুলের মুঠি ধরে পেছনের দিকে ওকে ঠেলে সরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে রিয়া। আর একমুহূর্তও অপেক্ষা না-করে কিগান নীলকে পেছন থেকে ধরে নিয়ে ঝটকা মেরে সরাতে গেল। কিন্তু নীলের সমস্ত শরীর যেন পাথর হয়ে গেছে। সেই শরীরে এখন শুধু কাঁচা মাংসের খিদা। এক চুলও নড়ানো যাচ্ছে না ওর শরীরটা। নীলের মা জড়োসড়ো হয়ে সোফায় বসে আছেন। ওনার নিজের শরীরেও কোনও সাড় নেই। ঘটনার ভয়াবহতায় উনি নিজেও আতঙ্কিত। স্বাভাবিক অবস্থায় উনি এখন নেই। প্যানিক অ্যাটাক বোধহয়। নীল এবার একঝটকায় কিগানকে পেছনের দিকে জোরে ঠ্যালা মারল; আর কিগান

ছিটকে কিছুটা দূরে গিয়ে পড়ল। নীলের গায়ে কী অসম্ভব জোর! এই জোর স্বাভাবিক নয়... বরং, অমানুষিক। কোনও সাধারণ মানুষের শরীরে এরকম জোর থাকার কথা না। কিগান তাল সামলে নিয়ে আবার ছুটে গিয়ে নীলকে পেছনের দিকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করল। রিয়া নীলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে সামনের দিক থেকে। কিন্তু কিছুতেই নীলকে সরানো যাচ্ছে না ওখান থেকে। নীল আবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "খিদা পেয়েছে খুব! কাঁচা কাঁচা মাংসের খিদা! কচি মাংসের খিদা! ডবকা শরীর তোর! আমার খিদা মেটাবি না তুই? আয়... আমার খিদা মেটা। এখনও শরীরটা ঢেকে রেখেছিস কেন? খোল এসব! আয়... কাছে আয়... তোর নদর ডবকা শরীরটা দেখে খুব লোভ হচ্ছে জানিস... খিদা পেয়েছে ভীষণ... আজকে তোকে কাঁচা কাঁচা খাব!" কথাটা বলে আবার খিলখিল করে অপ্রকৃতিস্থ হাসিটা হেসে উঠল ও। এবার আর একমুহূর্তও দেরি করল না কিগান। রিয়ার কাঁধের ওই জায়গায় কামড়ের দাগ বসে গেছে শার্টের ওপর দিয়ে। কিগান দেখল কিছুটা রক্তও বেরিয়েছে জায়গাটা দিয়ে। যা করার এখনই করতে হবে কিগান জানে। ও নিজের হাত-ব্যাগ থেকে একটা ইনজেকশন বের করল। সিরিঞ্জের মধ্যে আগে থেকেই ওষুধ ভরানো ছিল। এখানে আসার আগে কিছু একটা সন্দেহ করেই কিগান ওর বন্ধু অভীকের কাছ থেকে এটা নিয়ে এসেছে। হালকা ডোজের অজ্ঞান করার ওষুধ ইনজেকশনে ভরা আছে। অভীক বাই প্রফেশন অ্যানাস্থেটিস্ট।

কিগান আর একমুহূর্ত দেরি না-করে ইনজেকশনটা বিঁধিয়ে দিল নীলের পিঠ লক্ষ করে। সূচের অনুভূতি টের পেতেই মুহূর্তে রিয়াকে ছেড়ে পেছনে ফিরে তাকায় নীল। কী বীভৎস সেই চাহনি! কী এক হিংস্রতা লুকিয়ে আছে এই দৃষ্টিতে। কিগান অবস্থা বুঝে দু-পা পিছিয়ে আসে। ও বুঝতে পারছিল না ওষুধটা কাজ করছে কি-না। ওষুধটা যদি ঠিকঠাক কাজ না-করে... এসব প্রশ্ন মাথার ভেতর জট পাকাতে থাকে কিগানের। কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে ও। কিগানের সারা শরীরে ব্যথা করছে। ঠিক করে দাঁড়াতে পারছে না। রিয়া পেছন থেকে চিৎকার করছে, "কিগান তুই এখান থেকে সরে আয়! ও তোকে ছাড়বে না..."

আর ঠিক তক্ষুনি নীল কিগানের দিকে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে আসতে গেল; ঠিক স্বাভাবিকভাবে হাঁটছে না ও। কেমন একটা নাচের ভঙ্গিমায় দু-

দিকে হেলে-দুলে নীল এগিয়ে আসছে কিগানের দিকে, "শালা... চালাকি? হারামজাদা... চালাকি বের ক...রে....দে...ব.... হা...রা...ম...জা..." কথাটা কেমন জানি জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে নীলের। কিগান বুঝতে পারল এটা ইনজেকশনের এফেক্ট। ওষুধটা কাজ দিচ্ছে তার মানে। নীল কিগানের দিকে ক্ষিপ্রগতিতে এগোনোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু ঠিক করে হাঁটতে পারছে না। কেমন একটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। হাত-পা কেমন যেন জড়িয়ে যাচ্ছে ওর। দেখে মনে হচ্ছে ব্যালেন্স পাচ্ছে না। চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। চোখের সাদাটে ভাব কেটে ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছে। আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে মণি দুটো; আর তারপরই হুমড়ি খেয়ে মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল নীল। মুহূর্তে হাত-পা নাড়াচাড়া বন্ধ হয়ে গেল ওর। শুধু মেঝের ওপর ভারী ভারী নিশ্বাস পড়ছে নীলের। জ্ঞান নেই। রিয়া ভয় ভয় চোখে কিগানের দিকে তাকালো, "ও কী..."

"কিচ্ছু না... অজ্ঞান হওয়ার ওষুধ ইনজেক্ট করেছি। লো ডোজের। ঘুমাচ্ছে। ভয়ের কিছু নেই। এবার যা-করার তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের। এই মূর্তিটা আর পারলে ওর ঘর থেকে ওই ছেঁড়া কাগজের টুকরোটা থানায় সাবমিট করতে হবে; আর নীলকে রিহাবে রাখার একটা ব্যাবস্থা করতে হবে।"

এরপর নীলের মা-কে মাথায় ঘাড়ে-কপালে জলের ছিটা দিয়ে শান্ত করল কিগান। ভদ্রমহিলা এখন কিছুটা আত্মস্থ হয়েছেন। নিজেকে সামলে উঠেছেন অল্প অল্প। নড়েচড়ে বসেছেন সোফার ওপর। সামনের মেঝেতে নীল উবু হয়ে শুয়ে গভীর ঘুমাচ্ছে।

কিগান ভদ্রমহিলাকে কিছুটা শান্ত করে বলল, "দেখুন, নীল অসুস্থ। ওকে সুস্থ করতে হলে মা হিসেবে আপনাকেই কাজটা করতে হবে। আপনি থানায় কল করুন। এই মূর্তি বা কাগজে লেখা মন্ত্র, এগুলো যাই হোক, যেখানকারই হোক না কেন, সবকিছু নিয়ে আমাদের থানায় জমা করা উচিত। আর নীলকে সুস্থ করতে হলে, ওকে রিহাবে রাখতে হবে। এখানে থাকলে ও আরো অসুস্থ হয়ে পড়বে।"

ভদ্রমহিলা আমতা আমতা স্বরে ভাঙা গলায় বললেন, "আমি জানি মা হিসেবে কাজটা কঠিন, কিন্তু আই হ্যাভ টু ডু দিস... আমার ছেলের ভালোর জন্য এটা করতে হবে আমাকে।"

কিগান লক্ষ করল কথাটা বলতে বলতে ভদ্রমহিলার চোখ ভিজে গেছে এক অপার মাতৃত্বে।

নীলের ঘরে খোঁজাখুঁজি করতেই কাগজের টুকরোটা পাওয়া গেল। ম্যাড়ম্যাড়ে একটা কাগজের ছেড়া অংশ। ঠিক কাগজ কি-না সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। ওটার ওপর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, "ওঁ ক্ষ্রৌং ঘ্রৌঁ জ্রৌঁ সঃ।"

লেখাটা ঠিক কী, অনেক চেষ্টা করেও উচ্চারণ করে পড়তে পারল না কিগান। শুধু লক্ষ করল, লেখাটা আর যাই হোক, অনেকগুলো যুক্ত অক্ষর যোগ করে তৈরি এক একটা শব্দ। কী ভাষায় লেখা এটা? আর কালিটাও-বা কীসের? পেনের কালি তো মনে হচ্ছে না। আবার ছাপার অক্ষরের মতো কিছুটা দেখতে লাগলেও, ঠিক ছাপার অক্ষর না ওগুলো। তাহলে? লেখাটা দেখতে অনেকটা বাংলা হরফের মতো লাগছে, বিশেষ করে মন্ত্রটার কিছু অক্ষরের মধ্যের টানগুলো। কিন্তু ওগুলোকে ঠিক বাংলা বলা যায় না। একমনে বীজমন্ত্রটা দেখছিল কিগান। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কী একটা জিনিস খোঁজার চেষ্টা করছিল শব্দগুলোর মধ্যে থেকে। ও লক্ষ করেনি ততক্ষণে রিয়াও পাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে লেখাটা দেখছিল। লেখাটা পড়তে পড়তে রিয়ার কী একটা খটকা লাগল। মনে মনে কী একটা জিনিস মেলানোর চেষ্টা করছিল ও। হঠাৎ রিয়া খুশিতে গদগদ হয়ে কিগানকে চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে, "পেয়েছি!"

কিগান মনোযোগ দিয়ে লেখাটা দেখছিল। রিয়ার হঠাৎ করে চিৎকারে ঘাবড়ে গিয়ে পাশ ফিরে তাকায়, "আস্তে... কী পেয়েছিস তুই?"

রিয়া যতটা সম্ভব নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলা শুরু করে, "ধরতে পারিসনি তুই! কাগজের লেখাটায় যে ভাষা ব্যাবহার করা হয়েছে সেটা আসলে কামরূপ প্রাকৃত। পাল রাজাদের শাসনকালে এই অঞ্চলে কামরূপ প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার ছিল। তুই মূর্তিটার আইকনোগ্রাফি আর স্টেলার গঠনটা ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবি এই মূর্তিটাও পাল যুগের।"

"পাগল না কি? পাল যুগের মূর্তি হলে সেটা মিউজ়িয়ামে থাকবে। নীলের কাছে উড়ে এসে জুড়ে বসবে কীভাবে?" কিগান চমকে ওঠে রিয়ার কথা শুনে।

রিয়া বলে, "যেটা বলছি চুপচাপ শোন। আমাকে একটা কাগজ দে।"

কিগান পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ আর পেন বের করে রিয়াকে দেয়। রিয়া ওই কাগজে লেখা বীজমন্ত্রটা দেখে দেখে হাতের কাগজটায় কী কী সব যেন লেখে। লেখা শেষ করে রিয়া কিগানের দিকে কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "এই বীজমন্ত্রটা কামরূপ প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলায় ভেঙে লিখলে, এই কয়েকটা অক্ষর আসে— ক... ও... ঞ... ঝ... ঘ... জ... আর, দ... নীল তোকে এই অক্ষরগুলোর কথাই বলেছিল। ও প্রত্যেকটা স্বপ্নে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই কয়েকটা অক্ষরই দেখত; আর এই কয়েকটা অক্ষর জুড়েই কামরূপ প্রাকৃত ভাষায় তৈরি করা হয়েছে এই বীজমন্ত্রটা। তাহলে কি কেউ সত্যি সত্যিই নীলের স্বপ্নের মধ্যে এসে ওকে এই মন্ত্রটা শিখিয়ে দিয়ে গেছিল?"

কিগান রিয়ার ডিডাকশন দেখে চমকে যায়! চোখ দুটো চকচক করে উঠেও মুহূর্তে কেমন যেন মুষড়ে পড়ে কিগান, "কিন্তু মেডিক্যাল সায়েন্স কি এসব গল্পে বিশ্বাস করবে? মেডিক্যাল সায়েন্স চাইবে প্রমাণ। সেই প্রমাণ বা ব্যাখ্যা কোনোটাই আমাদের হাতে নেই রিয়া!"

১৫

উর্বাক্ষু নিজের চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিল। আজকে ওর এমনিতেই বিশেষ কাজকর্ম নেই থানায়। তার ওপর শরীরটাও ম্যাজম্যাজ করছে কেন জানি। জ্বরটর আসবে না-কি বোঝা যাচ্ছে না। তবে সেটা আসলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। গত দুইদিন যে হারে বৃষ্টিতে ভেজা হয়েছে ওর; তার ওপর সমস্ত জল গায়ে শুকিয়েছে।

উর্বাক্ষু ভাবছিল একটু ফাঁক পেলেই ডিউটি থেকে ডুব মারবে আজকে। আজকেও বাইরেটা মেঘলা মতোন। কিছুক্ষণ আগে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। যে হারে পশ্চিম দিকের আকাশটা কালো হয়ে এসেছে। খুব শিগগিরই আরেক পশলা নামবে। হঠাৎ উর্বাক্ষু লক্ষ করল একটা লোক থানায় ঢুকেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে, সোজা উর্বাক্ষুর টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে। গায়ে ঢোলা মতোন রং-ওঠা পাঞ্জাবি আর সাদা পায়জামা। পায়জামাটার পায়ের দিকটা গোটানো। রাস্তায় জায়গায় জায়গায় জল জমে আছে। তাই

হয়তো গুটিয়ে নিয়েছেন। পাঞ্জাবির পকেট থেকে উঁকিঝুকি মারছে কয়েকটা ভাঁজ করা কাগজ। বয়স আন্দাজ করা কঠিন। তবে দেখলে মাঝবয়সি বলেই মনে হয়। মাথা কামানো। মুখের চামড়ায় বলিরেখা। চোখগুলো কোটরে ঢোকানো। মাঝারি উচ্চতা, চেহারা কঙ্কালসার। ভদ্রলোক সোজা এসে সটান উর্বাক্ষুর সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। উর্বাক্ষু লোকটার এরকম ব্যাবহার দেখে একটু অবাক হল। সাধারণ লোকের মধ্যে এরকম ঔদ্ধত্য থাকে না। কিন্তু লোকটা কোনও পারমিশন নেওয়ার প্রয়োজনটুকুও মনে করল না? চেয়ারে সোজা হয়ে বসল উর্বাক্ষু। গম্ভীর হয়ে বলল, "কী চাই?"

লোকটা মার্জিত ভাষায় বলল, "একটা কমপ্লেইন লেখাতে চাই..."

"কী ব্যাপারে কমপ্লেইন?"

"চুরি..."

"কী চুরি?"

"শালবাড়ি হাটে গেছিলাম। ফেরার সময় দাগাপুর যাওয়ার আগে, গরুটাকে দাঁড় করিয়ে একটু হালকা হতে গেছিলাম ঝোপের ধারে। এসে দেখি গরু নাই।"

"আচ্ছা... নাম বলুন...", উর্বাক্ষু একটা নোটপ্যাড বের করে কমপ্লেইন লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করল।

লোকটা কোনও উত্তর দিল না।

একটু অবাক হল উর্বাক্ষু। আবার জিজ্ঞেস করলো ওই লোকটাকে, "আরে, নাম বলুন... নাম কী?"

লোকটা এবারেও কোনও উত্তর দিল না; বরং লোকটা উর্বাক্ষুকে একটা শান্ত নজরে আপাদমস্তক দেখছে। উর্বাক্ষু সেটা লক্ষ করল। আবার জিজ্ঞেস করল ও, "কী দেখছেন? নাম বলুন... নাম জিজ্ঞেস করছি তো..."

লোকটা এবার শান্ত গলায় উত্তর দিলো, "যে ফাঁড়া বছর দুয়েক আগে কাটিয়ে এসেছেন। সেই ফাঁড়া আবার ফিরবে... খুব শিগগিরই ফিরবে। সাবধানে থাকবেন উর্বাক্ষু।"

চমকে উঠল উর্বাক্ষু। লোকটা এভাবে হঠাৎ বলল কেন? কোন ফাঁড়া? দু-বছর আগে তো অনেক ফাঁড়াই গেছে। পুলিশের চাকরিতে প্রতিদিনই রিস্ক... প্রাণ হাতে নিয়ে বেরোতে হয়। কোন ফাঁড়া আবার ফিরবে? মনে

করার চেষ্টা করে উর্বাক্ষু।

লোকটার চোখ চকচক করছে একটা চাপা উত্তেজনায়। ঠোঁটের কোণে একটা হালকা রহস্যময় হাসির দাগ।

উর্বাক্ষু একটু আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করে, "কী হাবিজাবি বলছেন? যে কাজের জন্য এসেছেন, সেটা বলুন। আপনার নাম না-বললে আমি কমপ্লেইনটা লজ করব কীভাবে?"

"এবার আবার একই ভুল করলে, কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারবে না উর্বাক্ষু। খুব কাছে সেই ফাঁড়া। এবার বাঁচা-মরা সবটা আপনার নিজের হাতে।"

উর্বাক্ষু আর নিজের কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। ভদ্রলোককে বেশ ধমকের সুরে বলল, "আপনি ভদ্রমতো বলবেন কী ফাঁড়া আছে আমার? আপনি বোধহয় এসব বলতেই এসেছেন এখানে। তাই ঝেড়ে কাশুন।"

লোকটা হেসে উত্তর দিলো, "দু-বছর আগের আপনার ঠিক কোন কোন ঘটনাটা মনে পড়ছে? ভাবুন... ভাবুন..."

উর্বাক্ষু ভাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঠিক করে মনে করতে পারে না। দু-বছর অনেক আগের কথা। প্রতিদিন লাইফে কত কিছু ঘটে। দু-বছর আগের একটা ঘটনা মনে থাকার কথা না উর্বাক্ষুর।

"কিচ্ছু মনে পড়ছে না?" লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল উর্বাক্ষুকে।

আর এর পরমুহূর্তেই উর্বাক্ষুর মনে পড়ে গেল সেই রাতের ঘটনাটা। হ্যাঁ, দুই বছরই বটে। খেয়াল ছিল না উর্বাক্ষুর দু-বছর কেটে গেছে এরই মধ্যে। সেই রাতে উর্বাক্ষুর বাসায়, বিরুপাক্ষ ভট্টাচার্য এসেছিল। মূর্তিটা থেকে বেরিয়ে এসেছিল একটা ধুম্র শয়তান। কী বীভৎস সেই স্মৃতি। উর্বাক্ষু ঠিক ভুলে যায়নি। কাজের চাপে ব্যাপারটা মনে চাপা পড়েছিল। হঠাৎ মনে পড়তেই আবার ও শিউরে উঠল ভেতর ভেতর। দুই বছর কেটে গেছে। অথচ এতটুকু ফিকে হয়নি ঘটনাটা।

"আপনার মনে পড়েছে। আপনার মুখ দেখে বুঝতে পারছি..." লোকটার কথায় সম্বিত ফেরে উর্বাক্ষু।

"আপনি কে? আপনি এখানে গরু চুরির কমপ্লেইন লেখাতে আসেননি। এসেছেন আমাকে সাবধান করতে। কিন্তু কেন? আপনি আমাকে চেনেন না;

আমিও আপনাকে চিনি না। তাহলে কীভাবে বুঝলেন আমার ফাঁড়া আছে? আর তাছাড়া ওই মূর্তি থাংকা আমি সব নষ্ট করে ফেলেছি দুই বছর আগেই। তাহলে সেই মূর্তি, সেই শয়তান আবার কীভাবে ফিরে আসবে আমার ক্ষতি করতে?"

"আমি দেখতে পাই মাঝেমধ্যে কিছু কিছু জিনিস। আপনি আমাকে চেনেন না। আমি আপনাকে চিনি। কীভাবে চিনি আমি নিজেই জানি না সেটা। তবে আপনাকে চেনা চেনা লাগে আমার। সেদিন দেখলাম আপনার ফাঁড়া আছে সামনে। তাই আপনাকে সাবধান করতে আসলাম..."

"আপনি জানেন ওটা কীসের মূর্তি ছিল? আজ অবধি ওই একটাই প্রশ্ন আমাকে তাড়া করে বেরায়। ওটা আসলে কার মূর্তি? ওই বীভৎস অবয়ব কোনও দেবতা হতে পারে না। অথচ মূর্তিটা পূজা করা হতো। কেন? ও কে? আপনি সত্যিই জানলে আমাকে বলুন... আমি জানতে চাই ব্যাপারটা। আপনি বলুন প্লিজ়..."

লোকটা ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানায় উর্বাক্ষুকে, "জানি... জানি... বলব... তার আগে আপনার একটা ভুল ধারণা আমি কাটাই। শয়তান না... ইক্ষুবিষা! ইক্ষুবিষার কোনও বিনাশ নেই। ওকে ধ্বংস করা যায় না। করা গেলে বহু বছর আগে সনকাই সেটা করত। পারেনি। ইক্ষুবিষা বার বার বিভিন্ন রূপে ফিরে এসেছে।"

"কে সনকা? আমাকে প্লিজ় সবটা খুলে বলুন।"

লোকটা ধাতস্থ হওয়ার জন্য একটু সময় নিল। উর্বাক্ষু দু-চোখে একরাশ কৌতূহল নিয়ে লোকটাকে দেখছে। লোকটার মধ্যে অদ্ভুত একটা প্রশান্ত ভাব আছে। লোকটা শান্ত স্বরে উর্বাক্ষুকে জিজ্ঞেস করল, "একটু জল... খাব..."

উর্বাক্ষু একজন কনস্টেবলকে বলতেই সে এক গ্লাস জল লোকটার সামনে দিয়ে গেল। লোকটা গ্লাসটা তুলে ঢকঢক করে এক নিশ্বাসে গ্লাসের সমস্ত জল শেষ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "আহ্, খুব তেষ্টা পেয়েছিল..."

"আরেক গ্লাস দিতে বলব...?"

"না না... ঠিক আছে। আচ্ছা তন্ত্রের ব্যাপারে আপনার জ্ঞান কতটা

আছে?”

“খুব বেশি নেই। তবু... আচ্ছা যাই হোক আপনি বলুন...”

লোকটা গলা খাঁকড়িয়ে বলা শুরু করল, “সময়টা দশম শতাব্দী। ঠিক যে-সময় পাল যুগ প্রায় শেষের দিকে। সেন যুগের উত্থান তখনও হয়নি। এই সময়কালটা আপনাকে বোঝাতে গেলে, এর আগের ইতিহাসটা একটু আপনাকে বলা দরকার। এতে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে। এই দেশে তন্ত্র কীভাবে এসেছে সেটা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। হরপ্পার আগেও মেহেরগড়ে লিঙ্গ-যোনি পূজার খোঁজ পাওয়া গেছে। সে আলাদা ব্যাপার। অনেকের মতে, এদেশে তন্ত্র এসেছে উত্তর-পশ্চিমের পারসিক পুরোহিত সম্প্রদায় মগীদের হাত ধরে। এখানে ভারতে তন্ত্র সব জায়গায় সমানভাবে বিস্তারলাভ করতে পারল না। কারণ বৈদিক ধর্ম। এই বৈদিক ধর্মের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না-পেরে, তন্ত্র বিস্তার লাভ করল পূর্বাঞ্চলে। কারণ সেখানে অপেক্ষাকৃত কম বৈদিক ধর্মের প্রভাব ছিল। পরে এই তন্ত্র দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। হিন্দু তন্ত্র আর বৌদ্ধ তন্ত্র। স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারছেন বৌদ্ধবিহারগুলোতে বৌদ্ধ তন্ত্র প্রধানত বিস্তার পেয়েছিল। তবে সেটাও বেশদিন টিকল না। কারণ, ওদের আভ্যন্তরীণ দলাদলির কারণে বৌদ্ধ তন্ত্র দুটো দলের মধ্যে ভাগ হয়ে গেল। একদল হীনযান নামে দক্ষিণাপথ হয়ে শ্রীলঙ্কার দিকে চলে গেল। আর অন্য দলটা মহাযান নামে পূর্ব দিকে পাড়ি দিল। এই মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অন্তিম পরিণতি হল বজ্রযান। মূলত অনেকের বিশ্বাস এই বজ্রযান চন্দ্রদ্বীপ অর্থাৎ অধুনা বাংলাদেশের বাখরগঞ্জ বা বরিশাল থেকে বিস্তারলাভ করা শুরু হয়। কারও মতে বজ্রযানের জন্ম বাংলায়। দুটো মতই আদতে এক। কারণ তখন বাংলা ভাগ হয়নি আজকের মতো। বাংলা থেকে বজ্রযান ছড়িয়ে পড়ল বিহারের পূর্বাঞ্চল, আসাম আর উড়িষ্যায়। তখনকার যুগের ভিত্তিতে বলতে গেলে তন্ত্রের বিস্তার ঘটল অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ আর প্রাগজ্যোতিষপুরে। এই প্রসঙ্গে একটা শ্লোকও আছে, “গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা, মৈথিলৈঃ প্রবলীকৃত, ক্কচিৎ কচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জুরে প্রলয়ং গতা।” তো যাই হোক, এই পূর্বাঞ্চলে গড়ে উঠেছিল চারটি তন্ত্রপিঠ—পূর্ণগিরি, উড্ডীয়ান, কামাখ্যা আর শ্রীহট্ট। আর পশ্চিমে ছিল তন্ত্রপীঠ জলন্ধর। এই পাঁচ পিঠে রমরমিয়ে চলত তন্ত্রের আচার-বিচার; তা সে হিন্দু তন্ত্র হোক বা বৌদ্ধ তন্ত্র। এদের মধ্যে কামাখ্যা, শ্রীহট্ট আর জলন্ধর তো

চেনেন। আর উড্ডীয়ন কারও মতে প্রাচীন উজ্জয়িনী; আবার কারও মতে অধুনা বিহারের মুঙ্গের জেলার উরেন। এদের মধ্যে পূর্ণগিরি কোথায় ছিল সেটা কেউ জানে না। কোনও পুরাণ গ্রন্থ বা তখনকার কোনও লিপিতেই এই পূর্ণগিরি কোথায় ছিল সে-ব্যাপারে কিছু বলা নেই। কিন্তু কারও কারও মতে আবার কামাখ্যার এপাশে আসামের যেটুকু অংশ গেছে, সেখান থেকে শুরু করে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার শিলিগুড়ি এই ভূখণ্ডের মধ্যে কোনও একটা জায়গায় ছিল পূর্ণগিরি তন্ত্রপীঠ। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিল এই পূর্ণগিরির মানুষ। আপনি হয়তো জানেন পাল-সেন যুগে বাংলার তন্ত্রের ব্যাপক প্রসার হয়। সেই সময় রাজা ত্যাগসিংহর মৃত্যুর পর, তাঁর কোনও উত্তরাধিকার না-থাকার কারণে, ওই কামরূপ অঞ্চলের রাজা হন ব্রহ্মপাল; আর ব্রহ্মপালের পর সিংহাসনে বসেন রত্নপাল। এই সময়ে ব্যাপকহারে তান্ত্রিক দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি শুরু হয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিল সেই মূর্তি কারিগর। বৌদ্ধ তন্ত্রের দেব-দেবীর ছবি নিশ্চয়ই দেখেছেন। নির্মাণ আর কারুকাজে এককথায় অনবদ্য। যে-সময়ের কথা বলছি, ওই সময়ে হিন্দু আর বৌদ্ধ তন্ত্রের মধ্যে চলছিল একটা অসম্ভব ঠান্ডা যুদ্ধ। এদিকে বৌদ্ধতন্ত্রের মূর্তি নির্মাণে এই চাকচিক্য সাধারণ মানুষকে বৌদ্ধবিহারের দিকে বেশি টানতে শুরু করল। আবার কিছুদিন পর দেখা যেত সেই মানুষগুলোই বৌদ্ধ মঠ ছেড়ে মন্দিরে ভিড় করছে। এরকম চলতেই থাকত। তার পাশাপাশি চলত নতুন নতুন দেব-দেবীর রূপ কল্পনা। এই ব্যাপারে মন্দির আর বৌদ্ধ বিহারগুলোর মধ্যে রীতিমতো একটা প্রতিযোগিতা চলত। বৌদ্ধ তন্ত্রে যিনি দেবী মারিচি, তিনিই আবার হিন্দুদের সূর্য দেবতা। যারা তখনকার দিনে নিয়মিত একইসঙ্গে মন্দির আর বৌদ্ধবিহারে যাতায়াত করত, তারা এই মিলটা ভালো মতো বুঝতে পারত। একই দেব-দেবী, অথচ দু-জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ। একটা সময়ে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে ক্ষমতাশালী বৌদ্ধ রাজা না-থাকার কারণে বজ্রযান প্রসারে ভাঁটা পড়ে। এদিকে তৎকালীন বণিকগোষ্ঠীরা দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতে লাগল। ওরা এই বৌদ্ধবিহার আর মন্দির— দুই জায়গাতেই আনাগোনা করত; দুই জায়গাতেই লোক দেখানোর জন্য ধূপ জ্বালত। শেষে ওরাও একটা সময় পর মন্দিরের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সেটা অন্য কথা। আসল কথায় আসি এবার। আমাদের পূর্বপুরুষরা তখনকার দিনে এই সমস্ত বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করত।

এটাই ওদের প্রধান ব্যবসা ছিল। আমাদের ওই গোষ্ঠীর মধ্যে একজন ছিল, ওর নাম ছিল ভদ্রেশ্বর। ওই লোকটা ছোটো থেকেই ভীষণ অদ্ভুত ছিল। ঠিক স্বাভাবিক আর চার-পাঁচজন মানুষের মতো ওর মানসিকতা ছিল না। আমদের পূর্বপুরুষরা যেখানে দেব-দেবীর নানারকম মূর্তি তৈরি করত; সেখানে ওই লোকটা ছোটো থেকেই শুধু বিকৃত বীভৎস সব মূর্তি তৈরি করত। অদ্ভুত ভয়ংকর দেখতে সব মুখ, ব্যতিক্রমী সব আদল। দেখলে ভক্তি তো আসতই না, উলটে গা শিউরে উঠত। স্পষ্ট বোঝাই যেত ওগুলো আর যাই হোক, কোনও দেব-দেবীর অবয়ব হতে পারে না। ভদ্রেশ্বরের বাবা ছিল তান্ত্রিক। লোকটা তন্ত্রপিঠে উৎকৃষ্ট কোনও সাধনা করত না। বরং ওই নিম্নমানের তন্ত্রসাধনা, যেগুলো সাধারণত মানুষের ক্ষতি করতে কাজে লাগে, ওগুলো নিয়ে চর্চা করত, কেউ কেউ আবার বলত ভদ্রেশ্বরের বাবার না-কি অন্য জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।”

“অন্য জগৎ মানে?” জিজ্ঞেস করে উর্বাক্ষু।

“আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেদের বিশ্বাস অনুযায়ী, আমাদের এই চেনা জগতের বাইরেও আরেকটা অন্ধকার জগত আছে। সেই জগতে সাধারণ কোনও মানুষ যেতে পারে না; কিংবা সাধারণ কোনও মানুষের পক্ষে সেই জগতের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। আমাদের জগৎ আর ওই অন্ধকার জগতের মধ্যে সৃষ্টির আদিকাল থেকে একটা অদৃশ্য সীমারেখা বেঁধে দিয়েছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তারা। যাতে দুই জগতের মধ্যে কোনোভাবেই যোগাযোগ সম্ভব না-হয়। আপনারা বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে হাইপারস্পেস বলেন। একমাত্র কিছু বিশেষ গুহ্য তন্ত্রসাধনার দ্বারাই সেই জগতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব। তবে সেটারও বেশ কিছু কুফল আছে। কারণ একবার কেউ ওইসমস্ত গুহ্য সাধনার দ্বারা যদি ওই অন্ধকার জগতের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে, তাহলে তার পরিণতি ভয়ংকর। কারণ ওই জগতে নাকি অদ্ভুত সমস্ত প্রাণীদের বসবাস। ওরা না-কি আকারহীন, অবয়বহীন... ওদের কোনোভাবেই দেবতা বলা যায় না। আলাদা করে কোনও অপদেবতা বা উপদেবতার গোত্রেও ফেলা যায়না ওদের। আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেদের বিশ্বাস ওই জগতের সঙ্গে একবার কেউ যোগাযোগের চেষ্টা করলে, সেই অন্ধকার জগতের অধিষ্ঠাতা প্রথমেই সেই মানুষটার শরীরের দখল নেওয়ার চেষ্টা করে। প্রথমে মাথায়... ধীরে ধীরে সমস্ত শরীরে...

ক্রমশ মানুষটার চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি, নিজেদের দখলে আনার চেষ্টা করে। সবশেষে পুরোপুরি দখল করে নেয় মানুষটার শরীর। তখন মানুষটার আত্মা নিজের শরীরেই নিজে পরজীবীর মতো বেঁচে থাকে। ভদ্রেশ্বরের বাবার ক্ষেত্রেও সম্ভবত সেটাই হয়েছিল। আমরা ওর মধ্যে সেই পরিবর্তনটা বুঝতে পারছিলাম।

এইসব কারণে আমাদের গোষ্ঠী থেকে ওদের পরিবারকে বের করেও দেওয়া হয়েছিল একবার। পরে অবশ্য ফিরিয়ে আনা হয়। তখন ভদ্রেশ্বর ছোটো। ওর ওই অদ্ভুত স্বভাবের জন্য সমবয়সি কেউ ওর সঙ্গে মিশতে চাইত না। ও নিজেও কারও সঙ্গে মিশত না। তন্ত্রের মূল কথা কী জানেন? তন্ত্র বলে, 'পূজা কোটি সমম স্তোত্রম, স্তোত্রকোটি সম জপঃ, জপকোটি সমম ধ্যানম, ধ্যানকোটি সমো লয়ঃ।' মানে, কোটি পূজা আসলে একটা স্তোত্রের সমান। কোটি স্তোত্রপাঠ আসলে একটি জপের সমতূল্য। কোটি-জপ সমতূল্য একবার ধ্যানের। আর কোটি বার ধ্যান একবার সমাধির সমান। অর্থাৎ বাহ্যিক আড়ম্বরের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল মন থেকে প্রার্থনা। বীজমন্ত্রে দেব-দেবীর রূপ মনের মধ্যে তৈরি করা। বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে দেব-দেবীর যে রূপ আমাদের মনের ভেতর ফুঁটে উঠত, এই রূপ কল্পনা করেই আমরা মূর্তি গড়তাম। সেই মূর্তি মারফত পূজা ছড়িয়ে পড়ত একটা বিরাট সংখ্যক জনগণের মধ্যে। কিন্তু একটা ভদ্রেশ্বরের বাবার ক্ষেত্রে ঘটল অন্যরকম একটা ঘটনা। ওই অন্ধকার জগতের প্রাণীগুলো ততদিনে ভদ্রেশ্বরের বাবার বোধবুদ্ধি চিন্তাশক্তি গিলে খেতে শুরু করেছিল। ওরাই ভদ্রেশ্বরের বাবাকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নিল একটা অদ্ভুত বীজমন্ত্র, "ওঁ ক্ষ্রোং ঘেঝাঁ জ্রেদ্রাঁ সঃ।" জাগতিক কোনও মানুষের পক্ষে এই মন্ত্র উচ্চারণ করা সম্ভব না। হাজার চেষ্টা করলেও পারবে না সে এই মন্ত্র নিজে মুখে উচ্চারণ করে পড়তে। একমাত্র ওই অন্ধকার জগতের অধিষ্ঠাতার প্রকোপ যার ওপর পড়বে, সেই পূজকই শুধু সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে পড়তে পাড়বে। এই বীজমন্ত্রে পূজা করলে, মনের মধ্যে কোনও দেবতার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে না; পরিবর্তে মনের মধ্যে ফুটে উঠবে ওই অন্ধকার জগতের অধিষ্ঠাতার একটা পূর্ণাঙ্গ প্রতিমূর্তি। আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করত সেই অন্ধকার জগতের অধিষ্ঠাতার নাম ইক্ষুবিষা! কিন্তু ইক্ষুবিষা আসলে কে, সেটা কেউ জানে না... শুধু জানি সে কোনও দেবতা নয়...

অপদেবতা কিংবা উপদেবতাও নয়... আগেই বলেছি আমাদের লোকবিশ্বাস অনুযায়ী এই ইক্ষুবিষা মূলত আকারহীন অবয়বহীন। অনেকটা জলের মতো। বলা হতো, এই ইক্ষুবিষা না-কি জীবিত এবং মৃত এই দুই অবস্থার মাঝামাঝি একটা অবস্থায় থাকে। তাই ইক্ষুবিষাকে পূর্ণাঙ্গ আকার দিতে গেলে, সবচেয়ে আগে দরকার তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা। এই গোটা প্রক্রিয়াটা অত্যন্ত জটিল এবং বিপদজনক। শুনুন বলছি... প্রথমে বীজমন্ত্র পাঠ করে পূজকের মনের মধ্যে ইক্ষুবিষার প্রতিচ্ছবি প্রথম ফুটে উঠবে। মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া ইক্ষুবিষার আলাদা করে কোনো শক্তি নেই। অতএব এই শক্তিহীন আকারহীন ইক্ষুবিষাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হলে, দরকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং শক্তি প্রতিষ্ঠা করা। পূজকের মনে যে প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে, সেই আদলেই মূর্তি তৈরি হবে... পূজকের ইচ্ছা অনুযায়ী ইক্ষুবিষার শক্তি প্রতিষ্ঠা হবে। আর সেটাই হবে ইক্ষুবিষার পূর্ণাঙ্গ রূপ। আকারহীন অবয়বহীন শক্তিহীন অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে, নতুন যে আকার রূপ আর শক্তি ইক্ষুবিষা পাবে, সেই মূর্তিকল্পেই যুগের পর যুগ ইক্ষুবিষাকে কল্পনা করা হবে। আর ভদ্রেশ্বরের বাবা সেই চেষ্টাই করছিল।

ইক্ষুবিষার ওই বীজমন্ত্র ভদ্রেশ্বরের বাবা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল সমস্ত গোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যে। কারণ যত মানুষের মধ্যে এই বীজমন্ত্র ছড়িয়ে পড়বে... তাদের মধ্যে থেকেই ইক্ষুবিষা খুঁজে নেবে নিজের পূজকদের। সেই পূজকরাই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে ইক্ষুবিষার। কিন্তু তার সেই চেষ্টা সফল হল না। ভদ্রেশ্বরের পরিবারকে আবার গোষ্ঠীচ্যুত করা হল। সাধনায় ভাটা পড়ায়, সাময়িকভাবে ইক্ষুবিষার ওই অন্ধকার জগতের সঙ্গেও ভদ্রেশ্বরের বাবার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অনেক বছর সব ঠিকঠাক চলেছিল। ভদ্রেশ্বর একটা সময় বড়ো হল; আর ওর বাবার কাছ থেকে ভদ্রেশ্বর ওই বীজমন্ত্র এবং বীজমন্ত্রের সাধনা পদ্ধতি শিখে নিলো। তারপর ভদ্রেশ্বর একটা জঘন্য কাজ করে বসল। যদিও ওর মাথা কোনোকালেই সুস্থ স্বাভাবিক বোধবুদ্ধিসম্পন্ন ছিল না। ভদ্রেশ্বর ওর বাবার বানানো সেই গুপ্ত বীজমন্ত্র পাঠ করে আবার ওই অন্ধকার জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলো। বহুবছর পর ও আবার ফিরিয়ে আনল ইক্ষুবিষাকে। নিজের আত্মার সঙ্গে ইক্ষুবিষার পরমাত্মা মিশিয়ে অর্ধ-জীবিত অর্ধ-মৃত অবয়বহীন ইক্ষুবিষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলো। ভদ্রেশ্বর ইক্ষুবিষার মধ্যে একই সঙ্গে বৌদ্ধ তন্ত্রের

হেরুক, বজ্রপাণী, যমান্তক আর দেবী মারিচির শক্তি প্রতিষ্ঠা করে। তাই ইক্ষুবিষার মূর্তির অবয়বে আপনি একই সঙ্গে এই চারজন বৌদ্ধ দেব-দেবীর আদল দেখতে পাবেন। ভাবছেন হয়তো দেবতাদের মূর্তির আদলে ভদ্রেশ্বর কীভাবে অন্ধকার জগতের অধিষ্ঠাতার মূর্তি বানাল; বলছি। আপনি মানেন নিশ্চয়ই, সমস্ত শুভ শক্তির একটা করে সমান অথচ বিপরীত অপশক্তি আছে। এখানে ভদ্রেশ্বর সেটাই করেছিল। ও সেই সমস্ত দেব-দেবীর সমান অথচ বিপরীত শক্তিধারী অপশক্তি দিয়ে শক্তি এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ইক্ষুবিষার জন্ম দিয়েছিল; আর ইক্ষুবিষাকে অবিনশ্বর বানাতে গিয়ে, ভদ্রেশ্বর ওই ইক্ষুবিষার প্রাণকে তিনটে অংশে ভাগ করে তিনটে জিনিসের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিল। প্রথমে, ভদ্রেশ্বর নিজের রক্তের সঙ্গে কিছু গুহ্য বস্তু মিশিয়ে একটা বৌদ্ধ থাংকার মধ্যে এঁকে ফেলেছিল ইক্ষুবিষার একটা প্রতিচ্ছবি। তারপর ওই থাংকার মধ্যে ভদ্রেশ্বর ইক্ষুবিষার প্রাণের একটা ছোটো অংশ প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরপর ওর বানানো ইক্ষুবিষার মূর্তিটায় ও ইক্ষুবিষার প্রাণের আরেকটা অংশ প্রতিষ্ঠা করল। আর সবার শেষে, ইক্ষুবিষার শেষ প্রাণের অংশটা প্রতিষ্ঠা করেছিল, ভদ্রেশ্বরের বাবার বানানো সেই গুপ্ত বীজমন্ত্রটার মধ্যে। কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুঁথিটা নষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক... মূর্তিটাও নষ্ট হতে পারে। কিন্তু, মন্ত্রটা যাতে আমৃত্যু থেকে যায় ও সেরকমই একটা ব্যবস্থা করল। অলৌকিকভাবে পুঁথিটা বহুযুগ আগে হারিয়ে গেলেও, সময়ে সময়ে সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে এই অভিশপ্ত বীজমন্ত্রের পুনর্নির্মাণ হয়ে এসেছে। অদ্ভুতভাবে যতবার মন্ত্রটার বিনির্মাণ হয়েছে, ততবার, সেই মন্ত্রের ভাষা, এমনকি লেখার গড়ন, আকার, মাত্রা সব অপরিবর্তিত থেকেছে। কীভাবে সেটা আমরা কেউ জানি না।

যাই হোক... তো এই কারণগুলোর জন্য যে কেউ চাইলেই সেই ইক্ষুবিষাকে ধ্বংস করতে বা মেরে ফেলতে পারবে না। কারণ ওই ইক্ষুবিষাকে শেষ করার এই এক উপায়। ওই থাংকা, ওই মন্ত্র আর মূর্তি ধ্বংস করে ফেলতে হবে। কিন্তু মূর্তি আর থাংকা বার বার কেউ না কেউ ধ্বংস করলেও, সেই বীজমন্ত্র বারে বারে ফিরে এসেছে; সেই বীজমন্ত্র নিজেই নিজের পূজক খুঁজে নিয়ে, নিজেকে ইষ্ট বানিয়েছে পূজকের; পুজকের আত্মার সঙ্গে ওই ইক্ষুবিষার পরমাত্মা মিলেমিশে এক হয় গেছে। তাই, ওই বীজমন্ত্রের বিনাশ নেই; আর সেই বীজমন্ত্রের মধ্য দিয়েই মানুষটার

শরীরে দখল নেবে ইক্ষুবিষা। তারপর ও ওই মানুষটার চিন্তা-বুদ্ধি সব করায়ত্ত করে, তার মনে নানারকম ভ্রম সৃষ্টি করে, ওকে দিয়ে বীভৎস বিকৃত সমস্ত কাজ করিয়ে নেবে; আর সব শেষে বীজমন্ত্র পাঠ করিয়ে, আবার তৈরি করিয়ে নেবে সেই থাংকা আর মূর্তিটা। ফলে সবশেষে ইক্ষুবিষার প্রাণ আবার তিনটা অংশে ভাগ হয়ে ওই থাংকা মূর্তি আর বীজমন্ত্র— এই তিন জায়গায় জমা হয়ে থাকবে আমৃত্যু। ওর ভয় ছিল, পাছে গোষ্ঠীর লোকেরা ওর এই কীর্তিকলাপ জেনে যায়, আর ওর সমস্ত ছক বানচাল করে দেয়। কিন্তু সেসব কিছুই হল না। ভদ্রেশ্বরের মনে একটা ক্ষোভ বরাবরই ছিল; কারণ ওদের পরিবারকে গোষ্ঠীচ্যুত করা হয়েছিল। বদলা নিতে ভদ্রেশ্বর আশেপাশের গ্রাম থেকে বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের ধরে এনে এনে ওই ইক্ষুবিষার সামনে বলি দিত। আমাদের লোকবিশ্বাস অনুযায়ী ইক্ষুবিষার খাদ্য নাকি তাজা লাশ আর টাটকা কাঁচা রক্ত। এছাড়া ইক্ষুবিষা তুষ্ট হতো অবাধ যৌনতায়। গ্রামের মেয়ে-বউদের ধরে এনে, ইক্ষুবিষাকে তুষ্ট করতে চলত বলপূর্বক অবাধ বিকৃত যৌনাচার। মনে করা হতো যৌনমিলনের সময় পূজকের শরীরে ইক্ষুবিষা ভর করে, প্রকারন্তরে, পূজকের মাধ্যমে সে নিজে ওর পূজায় উৎসর্গিত মেয়ে-বউদের সঙ্গে মিলিত হতো। আর ভদ্রেশ্বরের এই সাধনার ফলে গ্রামে গ্রামে মরক দেখা দেয়। আর সেই কোপ আমাদের গোষ্ঠীর ওপরও পড়ে। একের পর এক মারা যেতে লাগল। মাঝে মাঝেই গ্রাম থেকে উধাও হয়ে যেতো ছেলে-মেয়ে-বউরা। পরদিন কোনও প্রত্যন্ত এলাকায় ওদের মাথা কাটা উলঙ্গ লাশ পড়ে থাকতে দেখা যেত। ভদ্রেশ্বর এই বিকৃত নৃশংস সাধনা সবসময় বনের মধ্যে কোনো-না-কোনো গুহায় করত। সব সময় এক জায়গায় সাধনা করত না। ফলে সহজে ওকে ধরাও যেত না। কিন্তু সেই কঠিন কাজটাই করতে এগোল আমাদের এক পূর্বপুরুষ সনকা। ও ভদ্রেশ্বরকে আটকাতে যায়। ভদ্রেশ্বরকে ও মেরে ফেলে। কিন্তু ইক্ষুবিষার হাতে সনকা নিজেও মারা যায়। পরদিন আমরা বনের মধ্যে একটা গুহার মুখে ওর শতচ্ছিন্ন লাশ খুঁজে পেয়েছিলাম। বিশ্বাস করবেন না, আমরা যখন সনকার লাশটা পাই, তখন দেখি, ওর শরীরের ওপরের চামড়া একদম স্বাভাবিক। কিন্তু শরীরের ভেতরের অংশ দগদগে পোড়া। ইক্ষুবিষা কাউকে খুন করলে এভাবেই মারে।”

মুহূর্তে উর্বাক্ষুর মনে পড়ে গেল ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিংয়ের সামনে পড়ে থাকা লাশটার কথা। সেটারও শরীরের ওপরের অংশ স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু দেহের ভেতরের অংশগুলো ছিল দগদগে পোড়া। দেখে মনে হচ্ছিল, কেউ যেন লোকটার দেহের ভেতর থেকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

উর্বাক্ষুর সামনে বসা লোকটা বলে চলেছে, "এরপর সেই পুঁথি, ইক্ষুবিষার মূর্তিটার কিংবা থাংকাটার খোঁজ আমরা কেউ পাইনি। অনেক খুঁজেছিলাম বুঝলেন... দু-বছর আগে আপনি সেই থাংকা আর মূর্তিটা নষ্ট করেছেন। কিন্তু সেই বীজমন্ত্র? নষ্ট করতে পারেননি। সেই বীজমন্ত্রে আবার জন্ম নিয়েছে ইক্ষুবিষা। সে নতুন একজন পূজককে খুঁজে, তার মনে নানারকম ভ্রম তৈরি করে, তাঁকে দিয়ে নিজের মূর্তি গড়িয়েছে আবার। ইক্ষুবিষার খিদা খুব ভয়ংকর। কাঁচা মাংসের খিদা; ইক্ষুবিষা নরবলি চায়। তাজা রক্তে পুষ্ট হতে চায়। কিন্তু ও এখনও ওই থাংকাটা তৈরি করতে পারেনি। কারণ থাংকা বানানোর জন্য ওর পূজকের শরীরের রক্ত চাই। সেই রক্ত যথেচ্ছ পরিমাণ না-পেলে থাংকা তৈরি করতে পারবে না ও। আপনি খুব শিগগিরই ইক্ষুবিষার মুখোমুখি হবেন আবার। আর এবার মুখোমুখি হলে সেই বীজমন্ত্রের কাগজটা আপনি নষ্ট করবেন না। নষ্ট করলে আপনা থেকে সেটার পুনর্নির্মাণ হবে। ভদ্রেশ্বরের বীজমন্ত্রের এমনই মায়া। বরং সেই মন্ত্র লেখা কাগজ আপনি একটা বাক্সে বন্ধ করে এমন কোথাও ফেলে দেবেন, যেখান থেকে সেটা উদ্ধারের কোনও সুযোগ নেই। আর হ্যাঁ, মূর্তিটা ভেঙে ফেলবেন। খুব শীগগিরই দেখা হবে আপনার সঙ্গে ইক্ষুবিষার। খুব সাবধান। অনেকরকম ভ্রম হতে পারে মনে। ভ্রমের কবলে পড়বেন না। একবার ইক্ষুবিষার মায়ায় জড়িয়ে পড়লেই কিন্তু মৃত্যু।"

"কিন্তু র্যাষনডাম যে-কোনো লোককে ধরে নিশ্চয়ই ওই বীজমন্ত্র ইক্ষুবিষার পূজক বানাতে পারে না। কিংবা হঠাৎ করে ইক্ষুবিষা যার তার ইষ্টও হয়ে যেতে পারে না!" উর্বাক্ষু জিজ্ঞেস করল লোকটাকে।

লোকটা একটু থেমে থেমে উত্তরটা দিল, "না তা পারে না। আপনি ঠিকই ধরেছেন। ভদ্রেশ্বরের জন্ম সময় অনুসারে ওর তুলা রাশি বিশাখা নক্ষত্র ছিল। আগেই বলেছি ভদ্রেশ্বর নিজের আত্মার সঙ্গে ইক্ষুবিষার পরমাত্মা মিশিয়ে দিয়েছিল। ফলে ওই ইক্ষুবিষা ভদ্রেশ্বরের মৃত্যুর পর সেই সমস্ত লোককেই নিজের পূজক বানানোর কিংবা কবজায় আনতে চেষ্টা

করবে, যাদের ভদ্রেশ্বরের মতোই তুলা রাশি আর বিশাখা নক্ষত্রে জন্ম। খোঁজ নিয়ে দেখবেন বছর দুয়েক আগে ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিংয়ের ওখানে যে-লাশটার সঙ্গে আপনারা প্রথম ওই ইক্ষুবিষার মূর্তিটা আবিষ্কার করেছিলেন, ওই লোকটারও তুলা রাশি বিশাখা নক্ষত্রে জন্ম। ওই বীজমন্ত্র এভাবেই নিজে নিজে তুলা রাশি বিশাখা নক্ষত্রে জন্ম লোকেদের খুঁজে তাদের নিজের পূজক বানানোর চেষ্টা করে, নিজে হয়ে যাবে ওদের ইষ্ট। এভাবে ওদের ওপর ভর করে, ওদের মধ্যে নানারকম ভ্রম তৈরি করে, ওদের মাথা শেষ করে দেবে। ইক্ষুবিষার বীজমন্ত্র ওর ভক্তকে দিয়ে নিজের থাংকা, মূর্তি তৈরি করতে পারলেই নিজের প্রাণের তিনটা অংশ আবার এক করতে পারবে; আর তারপর ইক্ষুবিষা ওই ভক্তকে দিয়ে কোনও নারী শরীর উৎসর্গ করাবে। প্রথমে ওই মূর্তি আর থাংকার সামনে যে-নারীকে উৎসর্গ করা হবে, তার সঙ্গে ওই পূজকের সঙ্গম হবে। পূজকের আত্মার সঙ্গে ইক্ষুবিষার পরমাত্মা মিশে আদতে ইক্ষুবিষাই পূজকের মাধ্যমে মেয়েটার সঙ্গে মিলিত হবে। তারপর ভক্তকে দিয়ে ইক্ষুবিষার সামনে মেয়েটাকে বলি দেওয়াবে। সেটা হলেই কাজ শেষ। তারপর ওই পূজককে ইক্ষুবিষা মেরে ফেলে, নতুন পূজকের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে। আবার খুঁজবে কোনও তুলা রাশি বিশাখা নক্ষত্রের লোককে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মাঝে বাধা পেলে, মানে, কেউ যদি বীজমন্ত্র দিয়ে মূর্তি আর থাংকা তৈরি থেকে শুরু করে শেষে বলি উৎসর্গ— এরমধ্যে মূর্তি বা থাংকাটা নষ্ট করে দেয়, তাহলে ইক্ষুবিষা আর ওই ভক্তকে মেরে ফেলতে পারবে না। বরং, ওই বীজমন্ত্র সেই ভক্তের ওপর থেকে নিজের নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নিয়ে, আবার খোঁজ কোরে বেড়াবে কোনও তুলা রাশি বিশাখা নক্ষত্রের লোকের।”

নিজের কথা শেষ করে ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে হনহন করে হেঁটে থানা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। একমুহূর্তও আর দাঁড়াল না। উর্বাক্ষু কী একটা বলতে যাচ্ছিল ওনাকে পেছনে ডেকে; কিন্তু সেই অবকাশটাই পাওয়া গেল না! উর্বাক্ষুর তখনও ঘোর কাটেনি। একমনে লোকটার কথা শুনছিল ও। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে উর্বাক্ষুকে অবগত করতে লোকটা এসেছিল। লোকটা ওর শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু লোকটা কে? কোথায় থাকে? আর তাছাড়া উর্বাক্ষুকেই-বা লোকটা চিনল কীভাবে? দু-বছর আগের ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিংয়ের সামনে পাওয়া লাশটার ব্যাপারেই-বা এতকিছু জানল কীভাবে এই লোকটা? আর

তাছাড়া সনকা নামের যে-লোকটার কথা ভদ্রলোক বলছিল, সেটা বলতে গিয়ে ভদ্রলোক বলল ওরা না-কি সনকার লাশ খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু ভদ্রেশ্বর কিংবা সনকার ঘটনাটা তো বহুকাল আগের। এই ভদ্রলোক যদি সনকা বা ভদ্রেশ্বরের সমসাময়িক হয়, সেক্ষেত্রে তো লোকটার বয়স হাজারের ওপর দাঁড়ায়। সে কীভাবে সম্ভব? লোকটাকে দেখেও তো অত বয়স চোখে লাগল না। অনেকগুলো প্রশ্ন মাথায় ঘুরছে উর্বাক্ষুর। কিন্তু সেসব কিছুই তো জানা হল না ওর। উর্বাক্ষু ভাবছিল লোকটার পিছু নিয়ে দেখবে লোকটা কোথায় যায়। হয়তো কোনও ঠিকানা বা কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও যেতে পারে। সেরকমই একটা প্ল্যান করছিল ও মনে মনে। আর তখনই হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। উর্বাক্ষুই রিসিভ করল ফোনটা।

"হ্যালো... হ্যাঁ... লোকেশনটা কোথায়? এখনই আসছি..."

১৬

কলিংবেলটা বাজতেই কিগান দরজা খুলে দিল। বাইরে উর্বাক্ষু দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে দু-জন কনস্টেবল। উর্বাক্ষুকে ড্রয়িং রুমে নিয়ে এসে কিগান নিজের পরিচয় দিয়ে, ওর কাছে সমস্ত ঘটনাটা বর্ণনা করল। সামনের কাচের টেবলটার ওপর রাখা ছিল মূর্তিটা। মূর্তিটার নাম উর্বাক্ষু জানে; ইক্ষুবিষা! মূর্তিটার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল উর্বাক্ষু। অবিকল দু-বছর আগের দেখা সেই মূর্তিটার মতো দেখতে। থানার ওই লোকটার কথাটা মনে পড়ে গেল উর্বাক্ষুর। লোকটা মিথ্যা কিছু বলেনি ওকে। অবিকল সেই চোখ, মুখের আদল, লকলকে জিভ, বীভৎস গড়ন, মাথার ওপর পাঁচটা নরমুণ্ড, শবের ওপরের নৃত্যরত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে মূর্তিটা। একঝলক ওটার দিকে দেখলেই শিউরে উঠতে হয়। কাগজে লেখা বীজমন্ত্রটাও কিগান উর্বাক্ষুকে দেখাল। পুরোনো ম্যাড়ম্যাড়ে কাগজে অদ্ভুত একটা ভাষায় মন্ত্রটা লেখা— "ওঁ কেঐং ঘেঝাঁ জেদ্রাঁ সঃ" এটা কি আদৌ কাগজ? হাত দিয়ে ধরলে কেমন জানি অন্যরকম লাগে। ঠিক কাগজ কাগজ মনে হয় না। বরং মনে হয়, এমন একটা জিনিস দিয়ে এটা বানানো, যেটা বহুকাল আগে ব্যবহার হতো, তারপর অনেক বছর হল এর ব্যবহার উঠে গেছে। কিন্তু মন্ত্রের ভাষাটা উর্বাক্ষু কিছুটা ধারণা করতে পারল। এটা যদি সত্যি সত্যিই

সেই পূর্ণাগিরির ইক্ষুবিষার বীজমন্ত্র হয়, তাহলে সেটা অবশ্যই কামরূপ প্রাকৃত ভাষায় লেখা। আর ইক্ষুবিষা নিজে থেকে না-চাইলে, সাধারণ চোখে মন্ত্রটা পড়া সম্ভব না। কারণ জাগতিক কোনও মানুষের পক্ষে এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করাই সম্ভব নয়। মূর্তিটা বাড়ির বাইরে নিয়ে এসে, আর একমুহূর্তও সময় নষ্ট না-করে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলল উর্বাক্ষু। বীজমন্ত্র লেখা কাগজের টুকরোটা ভাঁজ করে একটা প্ল্যাস্টিকের প্যাকেটে ঢুকিয়ে কনস্টেবলের হাতে দিয়ে উর্বাক্ষু ওকে বলল, "এটাকে থানায় আজকের রাতটুকুর জন্য জমা রাখো। কাল আমি থানায় ঢুকে এটার ব্যাবস্থা করব। তার আগে এটা যেন কেউ হাত না-দেয়। আর এই প্যাকেটটা যে লকারে রাখবে, সেটার চাবিটা সামলে রাখবে।"

কনস্টেবল বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করল না উর্বাক্ষুকে। ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে চলে যাচ্ছিল। পেছন থেকে ওকে আবার উর্বাক্ষু ডেকে বলল, "শোনো, আজকে আমি আর থানায় ঢুকব না। আমাকে আমার বাড়ির গলিটার সামনে নামিয়ে দিয়ো থানায় যাওয়ার সময়ে। শরীরটা বিশেষ ভালো লাগছে না।"

দ্বিতীয়বার সম্মতি জানিয়ে কনস্টেবল দাঁড় করানো পুলিশ জিপটার দিকে এগিয়ে গেল।

নীল এখনও অসংলগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে। ওর অবস্থা বিশেষ ভালো না। নীলকে রিহাবে পাঠানোর ব্যাবস্থা করে, সমস্ত কাজ মিটিয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল উর্বাক্ষুর।

১৭

সন্ধে থেকেই বেশ একটা শীত শীত করছিল ওর। তার ওপর সকাল থেকেই শরীরটা ম্যাজম্যাজ, দুর্বল। মুখে সেরকম রুচিও নেই। তবু কিছু তো মুখে দিতে হবে। উর্বাক্ষু নিজেরটা নিজেই করে নেয় বরাবর। কিন্তু আজকে রান্না করতে একদমই ইচ্ছা করছে না। ওর ইচ্ছা করছে চাদর জড়িয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকতে। তবু একরকম জোর করেই রান্নাঘরে ঢুকল ও। চটজলদি বানানো যায় এমন কোনও খাবার বানাতে হবে। ম্যাগির দুটো প্যাকেট ছিল ঘরে। সেটাই উর্বাক্ষু সসপ্যানে চড়িয়ে সেদ্ধ করে খেল। জ্বরের

গায়ে গরম গরম স্যুপি স্যুপি করে বানানো ম্যাগি বেশ ভালো লাগছে মুখে। ডিনার করে শোয়ার আগে একটা প্যারাসিটামল খেয়ে শুয়ে পড়ল উর্বাক্ষু। আজকে আর বেশি রাত জাগতে ভালো লাগছে না ওর। বরং চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকতেই আরাম লাগছে বেশি।

ঘুমের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল উর্বাক্ষু।

একটা বিশাল শস্যক্ষেত। ওর মধ্যে থেকে সোনালি ফসলগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের গায়ে রোদ এসে পড়েছে; আর সেই রোদের আলোয় ফসলের ক্ষেতটাকে দেখতে আরো সুন্দর লাগছে। উর্বাক্ষু সেই ক্ষেতের সরু আলপথ দিয়ে আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জায়গাটা ওর যেন বহু বছরের চেনা। কিছুটা এগোতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল উর্বাক্ষু। চোখের সামনে যা দেখল, তাতে মুহূর্তে একটা চিনচিনে চাপা অস্তিত্ব ওর শিরদাঁড়া বেয়ে ওপরে উঠে গেল। উর্বাক্ষু দেখল ওর সামনে ফসলের ক্ষেতের মধ্যেই কাঠ দিয়ে বানানো উঁচু উঁচু কতগুলো উলঙ্গ নারীর অবয়ব; আর ক্ষেতের মাঝের আলপথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে কতগুলো উলঙ্গ মেয়ে। কত বয়স হবে ওদের? বড়োজোর আঠেরো-কুড়ি... মেয়েগুলোর প্রত্যেকের শরীরের গঠন মোটামুটি একইরকম। ঝুলে পরা সুডৌল স্তন, হালকা মেদ জমা খোলা শরীর, পেটের দিকটা বেশ খানিকটা উঁচুমতো— সম্ভবত অন্তঃসত্ত্বা, উস্কখুস্ক খোলা চুল কাঁধ বেয়ে নেমে মধ্য পিঠ ছুঁয়েছে। ওরা সবাই দেখতেও কেমন যেন একইরকম। একজনের মুখের আদলের সঙ্গে আরেকজনের মুখের আদলের আশ্চর্যরকম মিল। উর্বাক্ষু অবাক হয়ে মেয়েগুলোকে দেখছে। কেমন চেনা চেনা লাগছে ওদের। কিন্তু কোথায় দেখেছে সেটা মনে করতে পারছে না। মেয়েগুলোর অবশ্য উর্বাক্ষুর দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। মাথা নীচু করে আপন মনে আলপথ ধরে হেঁটে চলেছে ওরা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ওই মেয়েগুলোর চালচলন দেখার পর, আবার আলপথ বরাবর সামনের দিকে এগোতে লাগল উর্বাক্ষু। রোদের তেজ যেন ক্রমশ চরা হচ্ছে। বেলা বাড়ছে বোধহয়। কিছুটা এগোতেই আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল উর্বাক্ষু। ওর সামনে একটা খোলা গোল মতোন জায়গা, আর সেটার চারপাশে শস্যক্ষেত। সেই গোলমতো জায়গাটাতেও হয়তো আগে ফসল ফলত। এখন কেউ বোধহয় এখানে ফসল কেটে, মাটি ফেলে, জায়গাটা এরকমভাবে তৈরি করে নিয়েছে। জায়গাটার মাঝ বরাবর

কাঠ দিয়ে একটা বেদিমতো করা। বেদিটার মাঝখানে একটা রক্ত মাখা হাড়িকাঠ। বেদিটাকে ঘিরে আছে কয়েকজন পুরুষ মানুষ, আর বেদিটার ওপর হাঁটু মুড়ে উবু করে বসিয়ে রাখা হয়েছে একটা উলঙ্গ মেয়েকে। মেয়েটার গলাটা হাড়িকাঠের ওপর রাখা। মেয়েটার মুখটা দেখার চেষ্টা করে উর্বাক্ষু। কিন্তু দেখতে পারল না। মেয়েটার মুখ চুলে ঢাকা পড়েছে। কেমন একটা 'কু' ডাকতে লাগল ওর মনে। ভেতর ভেতর কেমন একটা বোধ হতে লাগল উর্বাক্ষুর, সামনের মেয়েটা ওর বহু জন্মের চেনা কেউ। উর্বাক্ষু সামনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করে। কিন্তু এগোতে পারে না। কী একটা অদৃশ্য শক্তি যেন ওকে পেছন থেকে টেনে রেখেছে। এপাশ-ওপাশ তাকায় উর্বাক্ষু। কিছু দূরের আলপথ ধরে হেঁটে চলা উলঙ্গ মেয়েগুলো আরো দূরে যেতে যেতে, ক্রমশ ছোটো হতে হতে যেন শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। উর্বাক্ষুকে ভেতর ভেতর গিলে খাচ্ছে একটা চোরা ভয়। উর্বাক্ষু বুঝতে পারছে মেয়েটার চরম বিপদ; অথচ ও সামনের দিকে এক পা-ও এগোতে পারছে না। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করার চেষ্টা করে উর্বাক্ষু। কিন্তু গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছে না ওর। কেউ যেন ম্যাজিকের মতো নিমেষে ওর গলার আওয়াজ কেড়ে নিয়েছে। হঠাৎ উর্বাক্ষু লক্ষ করল, সামনের লোকগুলোর মধ্যে থেকে একজন বেদিটার ওপর উঠে গেল। লোকটাকে দেখে বয়স আন্দাজ করা যায় না। দীর্ঘ দেহ, শরীরের ওপরের অংশটা খোলা, পরনে একটা কোঁচানো ধুতিমতো পোশাক, একমুখ দাড়িগোঁফ, আর কাঁধ অবধি ঝাঁকড়া চুল। লোকটার হাতে একটা ধারালো অস্ত্র। লোকটা বেদিটায় উঠে দাঁড়িয়ে, মেয়েটার গলা লক্ষ করে হাতের ধারালো অস্ত্রটা দিয়ে সজোরে কোপ বসাল; আর মুহূর্তে মেয়েটার গলাটা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল!! আর সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ থেকে ভেসে আসল সমবেত জয়ধ্বনি, "ও থেওস না মাসে হি ক্যালা... ও থেওস না মাসে হি ক্যালা...!"

চোখের সামনে এরকম একটা ঘটনা ঘটতে দেখে আতঙ্কে ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছিল উর্বাক্ষুর সমস্ত শরীর। কিন্তু সামনের লোকগুলোর মধ্যে যেন একটা উৎসবের আমেজ। বেদিটা থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ে ক্ষেতের মাটিতে মিশছে। আশপাশের ক্ষেতের মাটি রক্তে ভিজে গেছে। আর ওই বেদিটার চারপাশে গোল করে বিচিত্র ভঙ্গিমায় ওরা নাচানাচি করছে; আর অদ্ভুত একটা ভাষায় সুর করে চিৎকার করে গান করছে, "ওহি অ্যালেস ক্যাকেস

স্টিগমেস / তোরা মোনো ক্যালা প্র্যাগমাতা থা সিম্বুন / থা এরথি ভ্রোহি / ই ক্যালিএরগিয়া থাফসিহি / ও থেওস না এভলোয়গি...”

এই ভাষা আর সুর দুটোই উর্বাক্ষুর কাছে অজানা। অথচ সুরটার মধ্যে ক্রমশ যেন তলিয়ে যাচ্ছিল ও। ওর গানটা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল এই সুর যেন বহুকাল আগেই পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। অথচ...

হঠাৎ উর্বাক্ষু লক্ষ করল ওর সামনের দৃষ্টিটা কেমন ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। আশপাশটা পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে না। ক্রমশ চোখের সামনে সবকিছু আবছা হয়ে যাচ্ছে, আর এর সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে উর্বাক্ষু।

রাত তখন ক-টা বাজে খেয়াল নেই। ধরফর করে ঘুম ভেঙে উঠে বসল উর্বাক্ষু। জ্বর এখন ঘাম দিয়ে সেরে গেছে। সমস্ত শরীর ঘামে জবজবে ভেজা। ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছে উর্বাক্ষু। চোখের চাহনিতে একটা অস্থিরতা। ওরকম একটা স্বপ্ন থেকে হঠাৎ করে বেরোতে একটু সময় লাগল ওর। চোখের সামনে নিজের বেডরুমটা দেখে, কিছুটা আশ্বস্ত হল উর্বাক্ষু। কিন্তু স্বপ্নটা কিছুতেই মাথা থেকে যাচ্ছে না ওর। সাধারণত ঘুম ভাঙার পর স্বপ্নের রেশ বেশিক্ষণ থাকে না; তা সেটা যত বাজে স্বপ্নই হোক না কেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এই স্বপ্নটা উর্বাক্ষুর মাথায় জাকিয়ে বসে আছে। চাপা একটা অস্বস্তি হচ্ছে উর্বাক্ষুর স্বপ্নটা মনে করে। যতই ভাবছে স্বপ্নটা আর মনে করবে না, তত বেশি বেশি মনে পড়ছে। একমুহূর্তের জন্য ঠান্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করে উর্বাক্ষু। এরকম একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখার কারণ কী? খারাপ স্বপ্ন ও আগেও দেখেছে। কিন্তু এরকম একটা অদ্ভুত নৃশংস স্বপ্ন উর্বাক্ষু আগে কখনও দেখেনি। স্বপ্নটা পর পর আরেকবার সাজিয়ে নিয়ে ভাবার চেষ্টা করে উর্বাক্ষু। শস্যক্ষেত, আলপথ দিয়ে হেঁটে চলা কতগুলো উলঙ্গ অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে; ফসলক্ষেতে বেদি বানিয়ে উলঙ্গ একটা মেয়েকে বলি দেওয়া হচ্ছে। কেমন একটা চেনা চেনা লাগল ঘটনাগুলো উর্বাক্ষুর। এরকম একটা কিছু ও আগে কোথায় দেখেছে? না কি কোনও বইতে পড়া? বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। উর্বাক্ষুর মনে পরে গেল। গতবছর হিস্ট্রি চ্যানেল না-কি বিবিসি-র একটা ডকুমেন্টারিতে এরকম একটা রিচুয়ালের ব্যাপারে শুনেছিল উর্বাক্ষু। প্রাচীন গ্রিস-রোম এসব দেশে আগেকার দিনে ক্ষেতের ফলন বাড়ানোর জন্য উলঙ্গ মেয়েদের এনে, শস্যক্ষেতে বলি দেওয়া হতো।

এমনকি অন্তঃসত্ত্বা উলঙ্গ মেয়েদের ধরে এনে, ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে হাঁটানো হতো। কাঠ দিয়ে উলঙ্গ মেয়েদের শরীরের অবয়ব বানিয়ে ফসলের ক্ষেতে লাগানো হতো। আগেকার দিনে ওসব দেশে ধারণা করা হতো যে, এই রিচুয়ালগুলো পালন করলে জমিতে ফলন বাড়বে।

কিন্তু একবছর আগের দেখা একটা ডকুমেন্টারি হঠাৎ আজকে এভাবে স্বপ্নে দেখার মানেটা কী? হাজার ভেবেও সেই উত্তরটা খুঁজে পেল না উর্বাক্ষু। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল ও। পড়নের টি-শার্টটা ঘামে ভিজে চিপকে আছে গায়ে।

জামাটা চেঞ্জ করার জন্য বিছানা থেকে উঠে, লাইট জ্বালিয়ে, আলমারিটা খুলল উর্বাক্ষু। আলমারি খুলতেই সাইড থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ নীচে পড়ল। কীসের কাগজ এটা? উর্বাক্ষু নীচু হয়ে মেঝের ওপর থেকে কাগজটা উঠিয়ে ভাঁজ খুলে দেখে। কাগজটা ওর জন্ম কুষ্ঠি। সেই কোনকালে ওর এক দূর সম্পর্কের দাদু বানিয়ে দিয়েছিল। এতদিন আলমারির মধ্যে কাপড়-জামার ফাঁকে চাপা পড়েছিল। কাগজটা খুলে পড়তে গিয়েই খটকা লাগে উর্বাক্ষুর। কাগজের ওপরে ওর নামে, জন্ম সাল, তারিখ, তিথি, নক্ষত্র সব পর পর লেখা আছে। আর সেই কলামটায় নজর পড়তেই চমক লাগে ওর। কাগজে স্পষ্ট ওর জন্ম সালের নীচে লেখা, "তুলা রাশি, বিশাখা নক্ষত্র"।

মুহূর্তে থানার ওই লোকটার কথা মনে পড়ে যায় উর্বাক্ষুর। ভেতর ভেতর একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। একটা চোরা ভয় যেন বুকে চাপ দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ কুষ্ঠিটার দিকে থতমতভাবে তাকিয়ে থেকে, ওটাকে ভাঁজ করে আলমারিতে জামাকাপড়ের ভাঁজে ঢুকিয়ে রাখল উর্বাক্ষু। মনে মনে ঠিক করল আর এক মুহূর্তও নষ্ট করার অবকাশ নেই। কাল সকালে থানায় গিয়েই ওই বীজমন্ত্রটা লোকটার কথামতো একটা বাক্সে বন্ধ করে এমন জায়গায় ওটাকে লুকিয়ে ফেলতে হবে, যাতে ওই মন্ত্রলেখা কাগজটা আর কোনোদিন কারও হাতে না-আসে। আলমারি থেকে একটা টি-শার্ট বের করে, সেটা পরে নিয়ে, আলমারি বন্ধ করতেই, ওর নজরে পড়ল আয়নার কাচের ওপর লেখাটা। চমকে উঠল উর্বাক্ষু। আলমারির গায়ে সেট করা আয়নাটার মধ্যে কে যেন লাল কালি দিয়ে বাংলা হরফে লিখে রেখে গেছে একটা সংস্কৃত শ্লোক। কাঁপা হাতের লেখা। লাল কালিটা যেন লেখাটা থেকে

চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে, অনেকটা রক্তের মতো। তাহলে কি এটা রক্ত দিয়ে লেখা? কিন্তু লেখাটা তো আগে ছিল না। আর তাছাড়া এই বাড়িতে উর্বাক্ষু একাই থাকে। ঘর বন্ধ ছিল, বাইরের দরজা লক করা। তাই কারও মাঝরাতে ঘরে ঢুকে লিখে রেখে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। উর্বাক্ষু রুমাল বের করে মোছার চেষ্টা করল লেখাটা। কিন্তু কিছুতেই সেটা আয়না থেকে মোছা যাচ্ছে না। ভেতর ভেতর একটা ঠান্ডা চোরাস্রোত উর্বাক্ষুর শিরদাঁড়া বেয়ে বয়ে চলেছে যেন। একটা ভয় ওকে ক্রমশ আঁকড়ে ধরতে শুরু করছে। একটা অশুভ কিছুর আশঙ্কা করছে উর্বাক্ষু। আলমারির গায়ের আয়নাটায় যেন কেউ খোদাই করে লাল কালিতে বড়ো বড়ো হরফে লিখে রেখে গেছে—

"সর্বাসু বাহ্যপূজাসু অন্তঃপূজা বিধীয়তে, অন্তঃপূজা মহেশানি বাহ্যকোটিফলং লভেৎ..."

(যে অপরূপ, তার রূপ দেখতে চাইলে, বাহ্যিক চাকচিক্য আড়ম্বরের কোনও প্রয়োজন নাই। বরং নিজের মনে মনেই তুমি মানস পূজা করো, নিজের মনের মধ্যেই জপ করো। তাহলেই তুমি মনের মধ্যে প্রতিচ্ছবির মতো অপরূপের সেই রূপ দেখতে পাবে।)

শুধু তাই না; এখন যেন মনে হচ্ছে ওর, আয়নার কাচটা ঠিক কাচ না। বরং একটা জলের পাতলা স্বচ্ছ স্তর। তার ওপর মনে হচ্ছে সংস্কৃতে লেখা শ্লোকগুলো ভাসছে। লেখাটা একমনে বার বার পড়তে পড়তে কোথায় যেন হারিয়ে গেল উর্বাক্ষু। একটা ঘোর কাজ করছে ওর মধ্যে। কেউ যেন ওর শরীরের দখল পেতে চায়। আশপাশটা কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ দেখতে লাগছে। লক্ষ-লক্ষ মানুষ কী একটা অজানা ভাষায় উর্বাক্ষুর কানের খুব কাছে ফিসফিস করে কী যেন একটা লাইন বার বার উচ্চারণ করে চলেছে। অথচ আশেপাশে কেউ নেই। উর্বাক্ষুর চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আশপাশটা মনে হচ্ছে অন্য কোনও পৃথিবীর এক অজানা জায়গা; এই জায়গা উর্বাক্ষু আগে কখনও দেখেনি, চেনে না। চারপাশ থেকে ভেসে আসছে একটা ভ্যাপসা সোদামতো গন্ধ; আর একটা উগ্র ধোঁয়ায় উর্বাক্ষুর দু-চোখ জ্বালা করছে, আর তখনই ওর আয়নার দিকে নজর পড়ল আবার। স্পষ্ট দেখতে পেল উর্বাক্ষু, আয়নার মধ্যে এখন আর ওর প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে না; বরং ওর সামনে আয়নায় ফুটে উঠেছে একটা বীভৎস প্রতিচ্ছবি।

এই প্রতিচ্ছবি উর্বাক্ষুর চেনা— ইক্ষুবিষা! ক্রূর দৃষ্টি, চোখের মণি দুটো চকচক করছে; রক্তাভ চোখ, লকলকে জিভ, মুখ দিয়ে রক্ত চুইয়ে পড়ছে, মাথার ওপর পাঁচটা নরমুণ্ড, দীর্ঘদেহী বিশালাকার শরীর। দু-বছর আগের সেই রাতে দেখা সেই মুখের আদলটা আবারও একবার চোখে ভেসে উঠল উর্বাক্ষুর। ঘোলাটে চোখে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো, মাথা নত করে, হাঁটু মুড়ে উর্বাক্ষু বসে পড়ল আয়নায় ভেসে ওঠা প্রতিচ্ছবিটার সামনে। প্রতিচ্ছবিটার উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে জড়ানো গলায় উর্বাক্ষু বলে উঠল, "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ, উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা..."

(পূজক চায়, তার নিজের উৎসর্গ করা আত্মা যেন, তার ইষ্ট দেবতার পরমাত্মার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়।)

একটু থেমে বিড়বিড় করে আরো কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করল ও, "ওঁ কেঐ্ং ঘেঝাঁ্ জেদ্রাঁ্ সঃ।"—

কথাটা বলামাত্রই ঘরের আলো হঠাৎ করে নিভে গেল। ঘর জুড়ে এখন নিকষ অন্ধকার। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারেই উর্বাক্ষুর মনে হল ঘরের ভেতর থেকে অনেকগুলো অচেনা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে... কারা যেন একসঙ্গে ঘরের ভেতর বার বার উচ্চারণ করছে কয়েকটা শব্দ; ঘরের ভেতর গমগম করছে সেই আওয়াজ, "ওঁ কেঐ্ং ঘেঝাঁ্ জেদ্রাঁ্ সঃ... ওঁ কেঐ্ং ঘেঝাঁ্ জেদ্রাঁ্ সঃ।"

তথ্যসূত্র :

১) বাংলার তন্ত্র— পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, খোয়াবনামা

২) তন্ত্রের কথা— সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বইচই পাবলিকেশন

৩) BUDDHIST DEITIES AND MASTERS AN INTRODUCTION— CHANDRA B SAKYA, Adarsh books

৪) 99 THOUGHTS ON GANESHA— DEVDUTT PATTANAIK, Jaico publishing house

৫) TANTRAYANA ART AN ALBUM WITH INTRODUCTION AND NOTES— S.K. SWARASWATI, The Asiatic Society

৬) A BRIEF INTRODUCTION TO BUDDHIST DEITIES IN THANGKA, Adarsh book

৭) কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি— ডঃ দিলীপ কুমার দে, অনীমা প্রকাশনী

৮) ল্যাটিন আমেরিকার তিন সভ্যতা— ডঃ সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

৯) সেকালের কলিকাতার যৌনাচার— মানস ভাণ্ডারী, খড়ি প্রকাশনী

১০) যৌনপূজা— মানস ভাণ্ডারী, খড়ি প্রকাশনী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং ধন্যবাদান্তে

১) অভীক সরকার

২) জয়শ্রী চৌধুরী

৩) শ্রেয়সী পাত্র

৪) ডাক্তার অর্ণব সরকার

৫) মৌ দাশগুপ্ত আদক

৬) ডাক্তার রক্তিম মুখোপাধ্যায়

৭) অনুষ্টুপ শেঠ



মৃগাঙ্ক চক্রবর্তী

জন্ম ১৯৯২ সালের অগাস্ট মাসে, কোচবিহার জেলায়। "কিশোর ভারতী", "এই সময়", "আজকাল" "উত্তরবঙ্গ সংবাদ", "শারদাঞ্জলী", "তথ্যকেন্দ্র" প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

"যে থাকে আড়ালে" গল্পের জন্য কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল মাইক্রো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২০-তে "বেস্ট বায়োস্কোপ স্টোরি" অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : "বাংলার দেবতা অপদেবতা ও লোকদেবতা", "বাংলার বিচিত্র দেবদেবী", "আমি হিমুকে চিনি"।




9 788196 755911

